

অগ্নিসম্ভব

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চার টাকা

এই লেখকের

গল্প, উপন্যাস : ইস্পাতের স্বাক্ষর

স্বপ্নবাসর

রথচক্র

এ্যাল্‌বার্ট হল

প্রিয়তমের চিঠি

মহালগ্ন

রাত্রির বয়স (যন্ত্রস্থ)

অনুবাদ : ওঅর এ্যাণ্ড পীস (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

গ্র্যাণ্ড হোটেল

আনাকারেনিনা

কসাক্‌স্‌

এ্যানিম্যাল ফার্ম

ছোটদের : সব সত্যি

...ত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে স্বরূপা ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত
...মুদ্রণালয়, ২৮।৩ ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীফণিহার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মু...

উপন্যাসের পরিচয় তার ভূমিকা নয়। তবু অগ্নিসম্ভব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে মনে হচ্ছে, লেখকের নিজের কিছু বলা দরকার। দরকার তার কারণ অগ্নিসম্ভব আমার প্রথম উপন্যাস। যেহেতু কাঁচা হাতের ছাপ বইখানির নানাস্থানে বিদ্যমান সেহেতু এ বই আর ছাপতে দেবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু অল্ডাস হাক্সলের একটি উক্তি আমার সে সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, প্রথম জীবনের রচনায় বিস্তর তারল্য থাকা সম্ভব এবং পরিণত মন নিয়ে বিচার করতে বসলে রচয়িতার বিরক্তিও আসতে পারে। কিন্তু তরুণ, সুকুমার মনের যে মাধুর্য প্রথম জীবনে থাকে পরিণত বয়সে তা হারিয়ে যায়। সেই হারানো সৌকুমার্য কিন্তু প্রথম জীবনের রচনায় থেকে যায়। তার মূল্য আলাদা। তাকে এক কথায় নাকচ করলে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। অতএব পরিণত কালের রচনার মূল্য যাই হোক, প্রথম জীবনের কাঁচা লেখাকে তা হঠিয়ে দিতে পারে না। —এই হল পণ্ডিতের কথা। অবশ্য তার সঙ্গে নিজের রচনার প্রতি মমতাও খানিকটা আছে। তাই কয়েকবছর ফেলে রাখার পর কিছু ঘষামাজা করে অগ্নিসম্ভব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে সম্মত হয়েছি।

বইখানির প্রচ্ছদপট এঁকেছেন স্নেহভাজন শিল্পী শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায়, তাঁকে ধন্যবাদ।

রমিতার চোখের সামনে সব কিছুই ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। ডাক্তার সরকারের স্যুটপরা লম্বা চেহারাটা আরও লম্বা দেখায়। কতকগুলি ছায়ামূর্তির মত ধোঁয়াটে কুয়াশায় সামনের দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

টেলিফোন করতে করতে ডাক্তার সরকার একটা আর্ত চীৎকারের শব্দে চম্‌কে ফিরে চেয়ে দেখল রমিতা কৌচের ওপর কাৎ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

ক্ষিপ্রপদে ডাক্তার এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে রমিতার দেহটা কৌচের ওপর লম্বাভাবে শুইয়ে দিল। আপনার অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে—হুঁ! Brain Congestion.

পরিবর্তন মজুমদার এসে দাঁড়াল ডাক্তারের পাশে। ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে বলল—চলুন, বাইরে যাই।

পরিবর্তন অবাক হয়ে বললে—সান্ত্বকে এই অবস্থায় রেখে?

—হ্যাঁ। ওষুধ দিয়ে জাগালে এখন ভালো হবে না।

বাইরে এসে পরিবর্তন অধীর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল—ডাক্তারবাবু, ওকে কি বাঁচানো সম্ভব? এ রকম উন্মাদ পাগল আর দেখেছেন কখনও ভালো হতে?

ডাক্তার সরকার বলল—পাগল আপনি কাকে বলছেন, পাগল মোটেই নয়। একটা বড় রকমের shock থেকে এরকম হওয়া খুব স্বাভাবিক।

—পাগল নয় ত কি? অমন মেয়ের আমার এ অবস্থা হবে তা কে জানত। সান্ত্বনাকে যদি আগে দেখতেন তাহলে আপনি বুঝতেন। —কি বলব সবই আমার কৃতকর্মের পরিণাম। যদি শক্ত হয়ে বাধা দিতাম তবে এ শাস্তি হত না আজ।

প্রভঞ্জন বলল—nerve-এর ওপর দিনরাত অত্যাচার হয়ে এই দাঁড়িয়েছে। এখন দরকার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আর চাই হাল্কা আনন্দের খোরাক। যাতে ভুলে থাকতে পারেন এমন healthy আনন্দ! আচ্ছা, মিহিরের খবর কিছু জানেন?

হঠাৎ যেন পরিবর্তনের সামনে বজ্রপাত হল—আতঙ্কে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

প্রভঞ্জন আবার বলল—জানি না, How far it is possible, তবে যদি এঁকে নিশ্চিন্ত সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে হয়তো complex কেটে যাবে।

পরিবর্তন প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়—না, না, সে অসম্ভব। That brute! জানেন, সে আমার মেয়েকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সান্ত্বনাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে শেষ কালে। নিজের বাড়িকে যে উর্বশীর উল্লাসক্ষেত্র বানাতে চায়, তাকে নিয়ে ঘর করা? আপনি জানেন না, আর বলাও উচিত নয়—তবে আপনি ডাক্তার তাই বলছি—সান্ত্বনাকে মিহির টাকা রোজগারের নজর হিসেবে ব্যবহার করতেও ছাড়ে নি।···অবিশ্যি এসব কথা সান্ত্বনা আমায় এমনিতে বলে নি। রাত্রে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে, বলে—দূর করে দাও। এই সব খাকী পোশাকপরা বাঁদরদের চলে যেতে বলো।···কিন্তু কি জানেন ডাক্তারবাবু, মানুষের মন তো!

কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে পরিবর্তন উৎকর্ণ হয়ে কি শুনতে শুনতে বলল—এবারে আসুন ঘরে, সান্ত্বনা কথা বলছে, শুনতে পাচ্ছেন!

রমিতা চোখ বুজে রয়েছে। ওর কপালে ছোট ছোট মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। শুভ্র ললাটপ্রান্তে সবুজ শিরার রেখা সুপরিস্ফুট। রমিতা স্তিমিত কণ্ঠে বলছে—তুমি, তুমি শেষে আমায় এত নীচে নামিয়ে দিলে! এই নোংরামীর দাম টাকা দিয়ে শোধ করে নেবো আমি! টাকার এত মর্যাদা! এ বিশ্বাস কোথা থেকে হ'ল মিহির। সব কিছু খুইয়ে যদি টাকাই আদায় করতে হয় তবে সান্ত্বনার মৃত্যু হোক। আজ থেকে চরম দাম আদায় করব। তবে তাতে তোমার দালালীর দরকার হবে না। পৃথিবীর মানুষ আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ করো। আজ থেকে মানুষ আর নই আমরা —না তুমি, না আমি। সান্ত্বনার মৃত্যু হল—কিন্তু তার বিদেশীলাঞ্ছিত দেহ দিয়ে সে দুনিয়ার পুরুষজাতের সর্বনাশ করবে, তবেই শান্তি হবে এই প্রেতাত্মার। যাও, যাও মিহির, তোমাকে আর কিছু বলব না, তুমি তার যোগ্য নও। খেলনা—ছোট খেলনা, ঠুনকো মাটির সেপাই মিহিরলাল এই সর্বনাশী আগুনের কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। বিদায় আমার স্বপ্নের রঙীন নেশা!

ক্রমশঃ ওর কণ্ঠস্বর ঝিমিয়ে শান্ত হয়ে পড়ল। পরিবর্তন ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল মেয়ের মুখখানা।

ডাক্তার সরকার গম্ভীরভাবে বলল—একটু কাগজ দিন—এই ওষুধটা কাছাকাছি ডাক্তারখানা থেকে আনিয়ে নিন। একটু পরে যখন জ্ঞান হবে তখন খাইয়ে দেবেন। আর এখন থেকে ওঁর বাইরের কাজকর্ম সব বন্ধ।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে ললিতার মায়ের মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি, ভোরের দিকে তন্দ্রা এসেছিল। ঘুম ভেঙে দেখল মেঝেতে বালিশ বিছানা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে—রাত্রের এঁটো শান্‌কি আর নোংরা থৈ থৈ করছে। গলা সপ্তমে চড়িয়ে বকতে শুরু করল—বলি, আজ কত্তের আবার সাত সকালে কোন নাগর এয়েছে! দিন নি, রাত নি, যৈবন এলিয়ে হেলে-দুলে বেড়াও যে, পেট ভরবে কিসে শুনি? রূপের ধুচনী—বলি, বেলা হয়েছে, মায়ের শরীলগতিক খারাপ, বাবুদের বাড়ি কাজ ত করতে যাবি নি, নিজের বাসের ঘরেরই ছিরি কি করে রেখেছে? বলি; ও লক্ষীছাড়ী!

এতগুলি কথা একেবারে নিষ্ফল হওয়ায় তার রাগ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। বাইরে দাওয়াতে ললিতার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে অথচ সে মায়ের কথা কানেই তুলছে না। অতএব তার মা ক্ষেপে গেল—বলি ও পোড়ারমুখী, চুলোখাগী কার সঙ্গে কি এত অসের কথা হচ্ছে! শোন্ সে।

এবারে ললিতা সাড়া দিল—যাচ্ছি, অত চেঁচাচ্ছ কেন? তার কণ্ঠস্বরে ভীতির কোনো চিহ্ন নেই, বরং অবজ্ঞার আভাস রয়েছে।

—তুমিই বা কি এত বড় পাটরাণী হয়েছ যে ছোটলোকের ছোট কথা কানে তুলছ নি।

বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এসে সটান মেয়ের ঘাড় ধরে হাঁকল—হারামজাদী ফের তুই ওর সঙ্গে কথা বলিস? সব্বনেশে ছোঁড়াকে দেখলে তোমার আশ মেটে না—!

মেয়ে জবাব দিল—বিয়ে দিয়েছিলি কেন তখন? আমি ত আর পীরিত করে ওকে ম্যাঙা করতে যাই নি! সোয়ামী বুঝি আমার নয়!

ললিতার মা মেয়েকে হিড়হিড় করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এসে জামাই-এর সামনে দাঁড়াল।

নফরচন্দ্র শাশুড়ীর কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়েছিল।

ললিতার মা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—বলি তোমাকে ত বলে দিয়েছি বাপু এ বাড়ির ত্রিসীম্‌নায় এসো নি। বড্ড যে সাহস দেখছি। ভালো চাও তো মানে মানে বিদেয় হও—এই বলে দিলাম।

নফরচন্দ্র শাশুড়ীকে যমের মত ভয় করে। তার উপর এভাবে ললিতার সঙ্গে গল্পরত অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে সে আরও বিপন্ন বোধ করছিল। এ ক্ষেত্রে পালানোর সাহসটুকুও হারিয়েছে সে। চোরের মতই দাঁড়িয়ে রইল।

মাটিতে পা ঠুকে ললিতার মা বলল—ফের যদি দেখেছি এ বস্তীর ধারে-কাছে তবে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবো। ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারবার গোঁসাই। জোচ্চোর, বদমাস কোথাকার।

ললিতার মায়ের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে বস্তীর কেউ কেউ এসে জমতে শুরু করেছে। সকালবেলায় মুখরোচক বাগ্‌বিতণ্ডার গন্ধ সকলকেই প্রলুব্ধ করে।

ক্যালার পিসী বললে—হাঁ তাও বলি বাছা, মাগকে খেতে দেবার মুরোদ নি ত বিয়ে করা কেন!

ললিতার মা গলা নামিয়ে অনুযোগের সুরে বলে—গরীবের ঘরে দেহ খাটিয়ে খাওয়া, কি বলো দিদি। একটা পয়সা, না, একটি মোহর। মেয়েকে দেখে ত বললি দেড়'শ টাকা পণ দিবি। ভালো মানুষ, বিশ্বেস করেই বিয়ে দিয়ে মরেছি—আশীটি টাকা ঠেকিয়েছ, আজ এই একটি বছর পেরিয়ে গেল আর কানাকড়িটি দিলি নে। উলটে নিয়ে যাবার তাল। যৌ নিবি, তোর মুরোদ কি রে!

ক্যালার পিসী বললে—না, না ছেড়ো নি তুমি। আর মেয়ের অবস্থা—রোজই ত দেখি যা খায় উগ্‌ড়ে দিয়ে আসে। আধখানা হয়ে গেল। সেখানে

নে গেলে ত আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে না! এ অবস্থায় তোয়াজ তরিবত চাই ত!

ললিতার মা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল—ওমা সে কী কথা! তুমি কি সব যা তা বলছ দিদি! বমি করে কি আর সাধে? রোগের তরাসে শুকিয়ে যাচ্ছে। যা ভাবছ, মাইরি সে সব কিছু নয়—ডাক্তারে দেখে বলেছে, চোখ খারাপ হয়েছে। সেইজন্যি ত মাথা ধরে। আর এ বংশের ধারাই ওই, মাথাটি ধরেছে, কি রাগারাগি হয়েছে,—একটা অনিয়ম হলি সাতদিন ধ'রে যা খেয়েছে হড় হড় করে সব ঢেলে দিল। এই ছিপতির বাপেরও চেড়ডা কাল দেখিছি সেই এতটুকু মেয়ে শ্বশুরবাড়ি এসে অবধি! ওই ভয়ে তাই শত অন্যায় দেখলেও কিছু বলতে ভরসা হ'ত না, কি জানি যদি গায়ের ওপরেই উগ্‌রে দেয়।

ফ্যালার পিসী অঙ্গভঙ্গী করে চোখ ঘুরিয়ে বলল—আমার কাছে আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে আসিস্ নি। বড় বড় পাশ করা ধাত্তিরীরা এই শর্মার কাছে বিদ্যেবুদ্ধি শিখ্‌তে আসে। এইবেলা ওষুধবিষুধ করতে চাস, কর। দেরি করলি অঘটন!

ললিতার মা ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদের চেষ্টা করে। অবশেষে ওর ষোলআনা রাগ গিয়ে পড়ে নফরচন্দ্রের ওপর—যদি মরদের ব্যাটা মরদ হস তবে সুদে আসলে দেনা শোধ করে, এই একবছর তোর ইস্ত্রীকে যে বসিয়ে খাওয়ালাম তার খরচ সাকুল্যে দিয়ে এখুনি নিয়ে যা তোর পরিবারকে। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। পরের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিয়ে বুড়ো বয়সে আমার এক খোয়ার হয়েছে।

এবারে নফরচন্দ্র যেন কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায়। সে অতি কুণ্ঠিত ভাবে বলে—খোরাকী কোথা থেকে দেবো? তবে, যদি মেয়ে পাঠাও ত বিয়ের খরচের বাকী টাকাটা দিতে পারি। পাঠাও ত বলো।

বলে সে পকেট থেকে একশ' টাকার একখানি নোট বার করে দেখিয়ে পুনরায় সেটা পকেটেই রেখে দিল।

ললিতার মায়ের চোখ জ্বলে ওঠে, হাত নেড়ে বলল—সে বয়েসে ওরকম

গোছা গোছা একশ' টাকার নোট পায়ের তলায় গড়াগড়ি গিয়েছে, বুঝলি। ঘেন্নায় ছুঁই নি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে—ও বেলায় এসো। বামুন ঠাকুরকে দিয়ে দিন-খ্যান দেখিয়ে রাখি। আর টাকাটা এখন না দিতে চাও, না হয় তখনই দিয়ো।

নফর বিনীত ভাবে জবাব দেয়—শাস্তরে বলেছে, সোয়ামীর সঙ্গে যেতে গেলে পাঁজীর দরকার হয় না—তা আমিই ত নিতে এলাম। এখন গেলে হ'ত নি!

—হা-ঘরের বংশ ত নয় আমাদের। মেয়েকে শ্বশুর ঘর করতে পাঠাবো, তার গোছগাছ আছে, নেমকন্ন করতে হবে—ওঠ বললেই ত যাওয়া হয় না। মেয়েটার এতবড় অসুখ যাচ্ছে তা দেখতে পাও নি, কেবল খাঁচায় ফেলে খোঁচায় মারবার ফিকিরে আছ, কেমন নয়! পারবে আমার মত বড় ডাক্তার দেখাতে! জানো সরকার ডাক্তারকে দিয়ে ললিতার চিকিচ্ছে করানো হচ্ছে—তার ভিজিট লাগে ফি বারে এককুড়ি টাকা! তোমরা ত অমানুষ। যোবতী পেলে গিলে খেতে সাধ যায়—কেমন নয়!

নফর মৃদু স্বরে বলে—অসুখ বিসুখ ত কিছু নেই, এ সময়ে অমন কার না হয়!

—দূর হয়ে যা! আমার একরত্তি মেয়ের নামে যত বাজে কথা! যা, যা, বেরো। বদমায়েস ইতর কোথাকার।

এবং এর সঙ্গে আরও কতকগুলি সময়োচিত কথা বলতে বলতে ললিতার মা জামাইকে প্রায় মারতে তাড়া করে।

বেগতিক দেখে নফরচন্দ্র রণে ভঙ্গ দিল। বস্তীর সকলেই এ ব্যাপার নিয়ে গোপনে দু'চার কথা বলাবলি করল কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলে না কেউ। বিপদ আপদ সকলেরই হয়, আজ বললে কাল শুনতে হবে! তবে ফ্যালার পিসী বললে—আ মরণ, বুড়ো বয়েসে তোর ভীমরতি ধরল নাকি! মেয়েকে বড়লোকের বাড়ীর চাকরীতে লাগিয়ে দে। সেখানে খাবে থাকবে—কায়দা-সহবৎ শিখবে। আর কেমন ভদ্রলোকের ছোঁয়া পেয়ে মন-মেজাজও ভালো

হবে। পচা বস্তীতে এই সোমত্ত মেয়ে কি বসে থাকবে শুনি। আর বলতে নেই আমাদের ললিতের চটক আছে ত। এখানে রাখলে ও ছোঁড়া আবার আসবে। কোন্‌দিন দু'জনে সলাপরামর্শ ক'রে পালাবে হয়ত। তার আগে দে সরিয়ে। কোনো রকমে মেয়েটাকে ভদ্দরলোকের ছোঁয়াচ লাগিয়ে ভদ্দর করে ফ্যাল্—তারপর নিশ্চিন্দি!

ললিতার মা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি কতক-গুলো কথা বলে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে মেয়েকে উচ্চকণ্ঠে বলল—বেলা ত হল। বাবুদের বাড়ি বকুনী নিকা আছে। সব এই ধিঙ্গী মেয়ের জন্যে। তবু যদি মায়ের দুঃখু বুঝত। বলি, চল তোকে কাজে লাগিয়ে দিই—মাস গেলে পাঁচ দশ যা আসে তাই ভালো। একটা মানুষের যেমন তেমন করে পেটটা ভরাতে গেলেও কম খরচা নয়। বুড়ো বয়েসে আর টানতে পারি নি—এই আকাল!

ললিতা মৃদুস্বরে বললে—ওমা, ও কি, আকাল বললে!

মেয়ের গৃহিণীপনায় ললিতার মা রোষকষায়িত দৃষ্টি হেনে বলল—আর কি ভালো কথা মুখে আসে? নিত্যি নেই, নিত্যি চাই—আকাল ছাড়া আবার কি?

পরক্ষণে মনে মনে বিড় বিড় ক'রে তিনবার 'আকাল' বলে নিল গোপনেই। এই ভয়ঙ্কর শব্দটি মুখে উচ্চারণ করলেই নাকি যত সর্বনাশ এসে জুটবে। তবে যদি তিনবার উচ্চারণ করে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় তাহলে দুর্ভাগ্যমোচন সুনিশ্চিত।

মেয়েকে বললে—চ আজই রায়েদের বাড়ি তোকে দিয়ে—তবে সরকারদের ওখানে কাজে যাবো।

ললিতা রোদনবিধুর চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল। সে বুঝেছে যে প্রতিবাদ করলেও কোনো ফল হবে না।

মায়ের কাছে পার্বতী অভিযোগ করে—তোমার ওই আদুরী ঝিকে নিয়ে আর চলে না মা! আটটা বেজে গেল, তার আসার সময়ই হ'ল না। তাড়াও

জন্যে। দিন নেই—রাত নেই কেবল খাই খাই, এটা খাও, সেটা খাও—কাজের বেলায় ত খুঁজে পাওয়া যায় না!

সকাল থেকে অনেকবার ঝি-এর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছে পার্বতী। ঝি আসতে দেরী হলে তাকেই নিজে হাতে কাজ সারতে হয়, নইলে আবার মা কাজে লেগে যাবেন। ললিতার মা বুড়ো হয়েছে তাকে দিয়ে আর কাজ চলে না, সে-কথা বলবার উপায় নেই। ললিতার মায়ের সম্বন্ধে কোনো অভিযোগই এ সংসারে আমল পায় না, বিশেষ করে পার্বতীর মায়ের কাছে। তিনি হেসে জবাব দিলেন—আমিও ত বুড়ি হয়েছি মা। ভয় হচ্ছে ললিতার মা-র সঙ্গে কোন দিন তোর মায়েরও জবাব হয়ে যাবে।

একথায় পার্বতীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়, সে বলে—তেমন ভাগ্য কি আমাদের হবে? তোমার যা শরীরের হাল তাতে ত তোমায় একবারে নাকচ করে বসিয়ে রাখাই উচিত। মহাপণ্ডিত দাদা ত ভীষ্ম হয়েই বসে রইলেন। একটা বিয়ে করতেই যত আপত্তি! কি যে এক বুঝলেন বিলিতী মেয়ের দরদ—জানি না বাপু!

পার্বতী বোধকরি হিসাবে একটু ভুল করেছিল। মেয়ের কথায় খুশি হওয়া ত দূরের কথা, তিনি শান্ত ভঙ্গীতে কয়েকটি ছোট ছোট শব্দ দিয়ে প্রলয়ের সূত্রপাত করলেন—সবাই ত পণ্ডিত হয় না। দুনিয়ার সব লোকের মত একটা বিয়ে করে কতকগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে প্রভঞ্জন জড়িয়ে পড়লে কীই বা লাভ হত মা, শুনি! আজ যে তার নামযশ হয়েছে সেটুকুর দামও কম নয়। সে বিয়ে না করাতে আমার একটু কষ্ট হয়—তা হোক, কিন্তু গৌরবটা যে অনেক বড় মা!

পার্বতী ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে মায়ের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। আহত কণ্ঠে বলল—আমরা মুখ্যু তা কে না জানে! তাই বলে তুমি মা হয়ে কি করে অত বড় কথাটা বলতে পারলে!

চমৎকারিণী অবাক হয়ে গেলেন—কী আবার বড় কথা বলিছি রে!

—ওই যে পঙ্গপালের মত এণ্ডিগেণ্ডী! নিজের নাতীনাতনীদের জন্যে বলি। তোমার এত অশান্তি ত বললেই পারো, চলে যাই। তোমার জামাই ত

বাবার জন্যে বার বার লিখছেনই। ঠেস দিয়ে কথা বললে তুমি! তবু ত বসে খাই না, ঝি-চাকরের সঙ্গে সমানে খেটে যাই।

চমৎকারিণী বিস্ময়ের পাথারে পড়লেন। অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি কি এমন বলেছেন যার জন্যে পার্বতী এতখানি আঘাত পেতে পারে। তবু মেয়েকে শান্ত করবার জন্য বললেন—মিথ্যে রাগ করছিস পারী মা!

পার্বতী ছলছল চোখে মুখ তুলে বললে—আর কী করে বলে! বিয়ে করে একপাল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে—এসবের মানে কী আমি বুঝি না?

তিনি বলেন—সব কথারই তুই আজকাল মানে খুঁজিস, তোর হয়েছে কী। আমি বলিছি প্রভঞ্জন বিয়ে করল না তাতে দুঃখু করবার কিছু নেই। সত্যি কথাই ত—চারদিকের যা হাওয়া তাতে ছেলেপুলেকে মানুষ করা কি রকম শক্ত তা নিজেও ত বুঝছ মা। প্রভঞ্জনের ছেলে যদি আজ বাদে কাল অপোগণ্ড হয়ে দাঁড়াত তাহলে প্রভঞ্জনের বিয়ে না-হওয়ার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট পেতাম। সংসারে ষোলআনা সুখ ক'জনের কপালে থাকে!

—কপালে যা আছে তা কি কেউ খণ্ডাতে পারে মা! তা ছাড়া কোন্ মেমের মেয়েকে ভালোবেসেছিল ব'লে, চিরজীবন আইবুড়ো হয়েই কাটাবে দাদা এ-ই বা কেমন কথা! কেন এদেশে কি ভালোবাসবার মত মেয়েই নেই!

একটা আন্তরিক আলোড়নের অভিব্যক্তিতে মায়ের মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে উঠল। সেটা দমন করবার ব্যর্থ প্রয়াসে তিনি বলেন—প্রভঞ্জন আমার তেমন ছেলে নয়। নইলে আজ তাকে খুঁজে পেতে না তোমরা। যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে যাওয়া ভুল।

কলহের যে তুমুল তুফানের আয়োজন পার্বতীর মনে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, বোধ করি মায়ের দুর্বোধ্য গম্ভীর চেহারা দেখে সেটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। মায়ের রহস্যগভীর মুখের দিকে মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল পার্বতী।

মা বললেন—শুধু এইটুকু আজ শুনে রাখ, প্রভঞ্জন সাধারণ মানুষ নয়। বড় কথা বললেই মহাপুরুষ হয় না—যে মুখ বুজে আত্মবলি দেয় সেও মহাপুরুষের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয় পারু।

পার্বতী সরল স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে—আচ্ছা, কে যেন বলছিল দাদা নাকি বিলেত্ যাবার চেষ্টায় আছে।

—বিলেত যাবার জন্যে সে কোন চেষ্টাই করে নি, বরং পাছে আমরা আপত্তি করি এই ভেবে প্রথমটা না যাওয়া মনস্থ করেছিল। আমিই তাকে যাবার জন্যে বলেছি। বিলেতী ডিগ্রী পাবে। বিলেতে গিয়ে হাসপাতাল-গুলো একটু ঘুরে ফিরে দেখবে। ওকে সরকার থেকে যা খরচ দিচ্ছে তার সিকি টাকাও খরচ হবে না।

অবিশ্বাসের বাঁকা হাসি পার্বতীর ওষ্ঠপ্রান্তে খেলে যায়। মায়ের মনো-ভাবের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের কল্পনাকুশলতায় খুশি হয়ে পার্বতী বললে—যা-ই বলো মা, এবারে তোমার ছেলে মেমসাহেবকে শাড়ী পরিয়ে বাড়ি তুলবে। তখন ঠাকুর পূজোয় হিমানী পাউডার হবে ধূপচন্দন।

চমৎকারিণী মেয়ের রসিকতায় খুশি হলেন না। অন্তরের কোন সূক্ষ্ম-তন্ত্রীতে তাঁর বেদনার করুণ রস ক্ষরিত হচ্ছে। কতকটা অসহায় কণ্ঠেই তিনি জবাব দিলেন—বেশ ত। সন্তানের শান্তি আর কল্যাণের চেয়ে বড় ধর্ম ত কিছু নেই। নিজের ধর্ম নিজের কাছে—কে কার ধর্ম ঘোচাতে পারে বল মা। কাশী বিশ্বনাথের আশ্রয় ত কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। জীবন ত অনেক-কালের হয়ে গেল।

বলে তিনি অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে, ব্যস্ত হয়ে বললেন—যাই ঠাকুরঘরের কাজ বাকী। তুই একটু কষ্ট করে দেখে শুনে নে মা!

পার্বতী বলল—ছাখো না, নিধুটা বাজার থেকে ফিরছে না। যাই, বসে থাকলে আমারই কি একদণ্ড নিশ্চিন্দি আছে। তোমার ত বোবা ঠাকুর, আমার আবার জ্যান্ত দেবতার আখড়া—উঃ সব ক'টা সমান বায়নাদেড়ে।

বলতে-বলতে পার্বতীর চোখে মুখে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ প্রসন্নতা ছেয়ে যায়। মুহূর্ত-পূর্বের পার্বতীর সঙ্গে এই মাতৃমূর্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই।

ঘাড়-থেকে বাজারের ঝুড়িটা রান্নাঘরের দাওয়াতে নামাবার সময় নিধু অভ্যস্ত কণ্ঠে ডাকল—কই গো দিদিঠাকরুণ!

কলঘরের মধ্য হতে সাড়া এলো—বসো যাই। মাছটা যেন কাকে না নেয় —একটু দাঁড়াও ওখেনে।

নিধিরাম চীৎকার করে বললে—সে কী গো দিদিঠাকরুন! নলতের মা পলতে বুঝি আসেন নি! তা তুমি বাসন মাজতে বসে গেলে। দুমিনিট ত'র সইল না! যা ব্বাবা! বলি, নিধে-হতভাগা তুই মরিছিস!

দিদিঠাকরুণের কাণ্ডকারখানায় নিধিরামের মাথা গরম হয়ে উঠল। সে বলল—থাকল পড়ে বাজার। মাছ কাগে থাক আমি দেখতে পারব না। যত অনথ কাণ্ড!

পার্বতী বেরিয়ে এলো কলঘর থেকে—বলি অত চেঁচামেচি করছ কেন?

—নাঃ চেঁচাবে না। এ বাড়ির রীতেই এই, ঝি-চাকরকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুললে ত হবেই! এখুনি গিয়ে বুড়িকে হিড়হিড় করে টেনে আনছি—দুবেলা গামলা বোঝাই ভাত নিয়ে যাবার বেলায় ঠিক আছে—এই ব্ল্যাক-মার্কেটের অন্ন ধ্বংস করে মায়ে বেটিতে রাজার হালে চালিয়ে দিল! আজ থেকে আর ওসব হবে না। বুড়ির ভাত বাড়ি নিয়ে যাওয়া চলবে না। দু'-বেলা বাড়ি যাওয়া ওর বন্ধ করো। তিন দিনে সিধে বানিয়ে দিচ্ছি ডাইনীকে দাঁড়াও।

তার কথার ছেদ পড়তে পার্বতী বলল—অত গাঁক-গাঁক করে চেঁচাচ্ছিস—মা পুজোয় বসেছেন। নিত্যি বলে দিতে হবে!

জিভ কেটে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে নিধিরাম ঠাকুরঘরের দিকে একবার তাকিয়ে গলার স্বর রুদ্ধ করে বললে—ওঠো দিকিন তুমি, ও ক'খানা ভজে দিচ্ছি।

হয়ত ললিতার মা মিনিট কয়েক আগেই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল। আবহাওয়া প্রতিকূল দেখে আড়ালে অপেক্ষা করছিল। নিধিরামের কণ্ঠস্বর দমিত হওয়ার পর মুহূর্তেই সে আত্মপ্রকাশ করল—বিষণ্ণ গম্ভীর চেহারা। ললিতার মায়ের এ চেহারার সঙ্গে এ বাড়ির সকলেই পরিচিত। আড়ালে যতই লম্ফঝম্ফ করুক না কেন নিধিরাম, ললিতার মায়ের সামনে নিধু অত্যন্ত নম্র; 'মাসী' ছাড়া সম্বোধন করে না।

পার্বতী হাত ধুয়ে কাপড় বদলে ওপরে উঠে গেল।

নিধু প্রশ্ন করল—কী মাসী! কি, শরীর ভালো নেই বুঝি!

—গরিবের আবার শরীলগতিক কি, বাবা! বাঁচতে গেলে বইতে হবে। বহু পাপে মানুষ ভিকিরী না হয়ে পরের দোরে ঝি-বিত্তি করে।

নিধু গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে প্রশ্ন করে—কি হ'ল গো মাসী!

ললিতার মা বলল—কিছু না। এমনিই বলছি। এই আজ কদ্দিন ধরে মেয়েটার চোখের ব্যামো—দিনরাত মাথা ধরেই আছে। আবার কপালগুণে এমন জামাই জুটেছে, খোঁজটুকু নিয়েও উব্‌গার করে না। দেখচি সবই, সইচি সবই। ডাক্তার দাদার দয়া, ওষুধবিষুধ দিয়ে তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেয়েটা যেন হলুদে পোকা হয়েছে শুকিয়ে, পেটে ভাত তলায় না আজ তিন মাস।

নিধু সহানুভূতির স্বরে বলে—আহা বড় কষ্ট ত!

—তা আর বলতে। সেই মেয়েকে আজ চাকরীতে দিয়ে এলাম। বলি কদ্দিন এভাবে চলে। কপাল ছাড়া আর কি বলব—ছেলেটা ডাগর হ'ল, বিড়ি বেঁধে টাকাটা আসটা আনছিল। ভাবলাম গরিবের দেবতা মুখ তুলে চেয়েছেন! হুঁঃ দেবতা কি কখনও গরিবের হয় রে বাবা! ওই এক সব্বনেশে কড়ি খেলার রোগে যা রোজগার করছিল সবটাই ফুঁকে দিচ্ছিল বলে দু'কথা বলতে গিয়েই হলো বিপদ! আজ সাতদিন ছোঁড়া আর বাড়ি ঢোকে নি। কাঁচি নিয়ে সেই যে পালিয়েছে, আর পাত্তা নেই।

নিধিরাম বিস্মিত হয়ে বলল—কড়ি খেলা কি গো মাসী!

—জুয়ো খেলা! ও মা তাও জানিস নে!

—ওইটুকু বিচকে ছোঁড়া জুয়ো খেলতে শিখেছে!

—হাড় জুয়োরী হয়ে উঠেছে। কিছুই জান্‌তাম না বাবা। রোজই এক টাকা পাঁচ সিকে এনে দিত—কিন্তুক ক'দিনই করে কি আট-আনা, ন-আনা দিতে লাগল! আমি বলি—'হ্যাঁ রে এত কম কেন?' বলত—'ওই ত সব দিলাম। কাজ হচ্ছে না। তার আমি কি করবো?' ভাগ্যগুণে সেদিনই দোকানদারের সঙ্গে দেখা, সুখদুঃখের কথা অনেক বলে ফেললাম, তারপর বললাম—'ছোঁড়াকে একটু বেশি করে পাতা দিও বাঁধতে, নইলে উপোস করে

মরব যে সবাই, অপুষ্টি ত কম নয়!' দোকানদার বললে—'কেন, তোমার ছিপতি ত ভালো কারিগর গো, কোনোদিন ত ডেরটাকার কম পায় না।' অবাক কাণ্ড! বাড়িতে যখন ধমক দিয়ে ধরলাম, 'বলি—পয়সা কি করিস?' হাজার হলেও বয়েসে ত কচি, আস্তে আস্তে সব কথা বেরিয়ে এল! আমি বলি কি—এ ত ভালো নয়! কিন্তু আজকালকার ছেলে বাবা, সে কী তোদের মতন? এক কথা বললে দশ কথা শুনিয়ে ছাড়ে। বললে কি 'রোজগার কি তোমাদের পেট ভরাবার জন্যে? আমার পয়সা যা খুশি করব।' রাগের মাথায় আমিও দু' ঘা বসিয়ে দিলাম—তারপরে সেই যে কাঁচি হাতে করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, একেবারে নিখোঁজ!

কথা বলতে বলতে ললিতার মায়ের চোখ বেয়ে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ে—ওর বিবিধ-অভিজ্ঞতা-কুঞ্চিত বলিরেখাকীর্ণ মুখমণ্ডল বেদনায় করুণ হয়ে উঠল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিধু বলল—আজ তোমার শরীরও তেমন জুৎ নেই মাসী, মনটাও খারাপ। তা এ ক'খানা বাসন আমি মেজে দিচ্ছি, তুমি থির হয়ে বসো বরং।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে ললিতার মা ম্লান হেসে বলে—না, না সে কী হয় বাপ্। মুখে বললি, এই ত অনেকখানি করা রে। আহা তোর ভালো করুন তিনি।

বৃদ্ধা একবার আকাশের পানে ব্যথাকরুণ দৃষ্টিতে তাকায়—তখনও তার চোখ সিক্ততায় আর্দ্র-উজ্জ্বল। ললিতার মা বলল—শরীল আমার ঠিক আছে রে। কাজ করতে ভালো লাগে। তবে মনটা কেমন আন্‌চান করে।—ওই হাঘরে ছেলেটা।

ওপর থেকে পার্বতী সংক্ষেপে জানিয়ে দিল—সাড়ে ন'টা বেজে গেল নিধু!

বাসনের গায়ে তেঁতুল বুলিয়ে ঘষতে ঘষতে ললিতার মা নিজের কথাই ভাবছিল। এইসব আত্ম-সচেতন মুহূর্তে ওর নিজের প্রতি করুণা হয়, ঘৃণা, লজ্জাও কম হয় না—আর সব চেয়ে বেশি অনুভব করে একটা তিক্ততা। এই

তিক্ততার জন্য দায়ী করে ও ললিতাকে। ললিতা এই অল্প বয়সেই তার মায়ের প্রথম যৌবনের মত কোমল প্রীতির আধার হয়ে উঠছে। ও যদি এইরকম নরম হয়েই থাকে তবে সবাই ওকে মাড়িয়ে যাবে—ওকে কঠিন আবরণ দিয়ে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে কই! এই বয়সে একবার একটা ছেলেপুলে হয়ে গেলে তখন কেউ ফিরে চাইবে না। ললিতার মায়ের চেয়ে আর কেউ কি সেকথাটা ভালো ভাবে জানে? তখন নফরচন্দ্রের পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিতে হবে আর উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও কোন সুখ-শান্তি মিলবে না। ললিতার মা সারাজীবন জ্বলেছে একটা অকর্মণ্য পুরুষকে নিয়ে। ললিতার বাপ কেবল চোখ রাঙিয়েই কাটিয়ে গেল আর ললিতার মা শুধু খেটেখেটেই মরল। শুধুই পরিশ্রম করবে মানুষ! জীবনকে একটুও উপভোগ করবে না এ-ই বা কেমন কথা! কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে এই দুর্দিনে কোনো মানুষ পারে না কি সৎভাবে সংসার চালাতে? ললিতার যেন দুঃখের দিন না আসে—যেমন করে হোক ললিতার সুখস্বাচ্ছন্দ্য আসুক, তার মা চায়।

এই একই সময়ে পার্বতী ভাবছিল জয়ন্তর কথা। ঝক্‌ঝকে তলোয়ারের মত একুশ বছরের চেহারা নিয়ে জয়ন্ত কিশোরী পার্বতীর বয়ঃসন্ধিতে যে স্বপ্নরঙীন ছবি এঁকেছিল, সে জয়ন্ত বুঝি স্বপ্নের ওপারেই হারিয়ে গেছে কবে। সংসারের অনিবার্য গতি পার্বতীকে টেনে নিয়ে চলেছে—আর জয়ন্ত চলেছে অন্য কোনো পথ ধরে। সে রহস্যময় পথের সঙ্গে পার্বতীর পরিচয় নেই। শুধু পার্বতী যেটুকু জানে তা এই—ক'বছর ওদের সংসারে অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু আজ যে কোথাও কোনো আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না একথাটাও কম সত্য নয়। জয়ন্তর যুদ্ধের পয়সা যুদ্ধের বাজারেই শেষ হয়ে গেছে। অত পয়সা কোথায় গেল!···সেটা বড় কথা নয়, এখন চাকরী নিয়ে টানাটানি। জয়ন্তদের আপিসে হিসাব-নিকাশে গোলমাল হয়েছে খুব, অনেকেই ধরা পড়েছে। দাদার কাছে এখন স্বামীর হয়ে সুপারিশ করতে হবে, সেইজন্যই জয়ন্ত ওকে রেখে গিয়েছিল—কিন্তু আজ পর্যন্ত লজ্জায় সে কথাটা মায়ের কাছেও খুব স্পষ্ট ক'রে বলতে সাহসে কুলোয় নি। অহরহ এই চিন্তাই পার্বতীর মনকে বিষণ্ণ করে রাখে।

পার্বতী রান্নাঘর থেকে বলল—কী গো বাসনপত্র কিছু পাওয়া যাবে?

—এই দিই দিদিমণি, দিই!

বাসনের পাঁজা নিয়ে ললিতার মা উঠে এলো—এই নাও, জল বুলিয়ে দেখে তোলো ভাই, বুড়ো হয়েছি, আজকাল আর তেমন নজরে আসে না।

তারপর একটু মিনতিমাখা কণ্ঠে ধরা গলায় বলল—তোমরা যদি এমন মুখ-ভার করো দিদিমণি তাহলে এ পোড়া জীবনটা রেখে কি লাভ, বলো!

সেকথার জবাবে পার্বতী বলল—কালকের পান্তা আছে তাই খাবে, না মুড়ি-চিঁড়ে নেবে? দাদা কাল কোথা থেকে খেয়ে এসেছিলেন, রাত্রে খেলেন না।

—আহা ভাত ফেলতে পারি! বলে তারই দুঃখে এত খোয়ার—আর সেই নখ্‌খি!

পান্তাভাতের সঙ্গে পেঁয়াজে কামড় দিয়ে খেতে খেতে ললিতার মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল খুশির আতিশয্যে। স্বরগ্রাম একটু চড়িয়ে বলতে লাগল—জানো গো দিদিমণি, এইবারে যদি ডাক্তার দাদার মতিগতি ফেরে ত ফিরতেও বা পারে!

সকালে মায়ের সঙ্গে ভাই-এর প্রসঙ্গে বচসা হয়েছিল সেটা ললিতার মায়ের কথাতে নূতন করে মনে পড়ে পার্বতীকে অপ্রসন্ন করে তুলল। পার্বতী সংক্ষেপে জবাব দেয়—মতিগতি ফিরল আর না ফিরল তাতে আমাদের কি এসে যাচ্ছে! আমরা ত পর!

—না, মানে এই ক'দিন ধরেই দেখছি দাদাবাবুর কাছে এক পরমাসোন্দর মেয়ে আসে। আহা যেন সরস্বতী পিত্তিমে। বলে, নতুন রুগী। কী সেজেই সে আসে—ওই রাঙা টকটকে রঙ, তার ওপর সাদা খড়ি গুঁড়ো আর হিমানী যে মাখে কেন তা বুঝি নে ভাই। আহা অমন মেয়ে এলে ঘর আলো হয়ে যাবে। আমি ত ভাই ওর কোথাও অসুখ দেখি নে।

পার্বতী বলল—দেখেই বুঝে ফেললে রুগী নয়! তুমি ডাক্তারী করো গিয়ে।

—আঃ মরণ আমার, তা কে বলেছে! এমনিতে দেখলে মনে হয় না,

মেয়েটার কোনো রোগ আছে। দিব্যি খট্‌খট্ জুতোর ঠোকর দিয়ে চামড়ার লতাপাতা আঁকা ঝুলি ঝুলিয়ে, ইয়া বড় গাড়ি চড়ে আসে। আর বলতে নেই, দাদাবাবুর মেজাজও আজকাল বেশ নরম-নরম। আমাদের ত তিনকাল গিয়ে এককালে এসে ঠেকেছে—অনেক দেখিছি, কেমন কেমন মনে হচ্ছে ব'লেই বলছি।

—এসব কথা যেন মা'র সামনে ব'লো না।

ললিতার মা মুখের ভাত গিলে নিয়ে বললে—না ভাই, সে ভাবে কিছু বলি নি। হরদম মেয়েটা ডাক্তারখানায় আসে, তা মনে হলো বুঝি খবরটা দিলে তোমরা কায়দা করে ধরে দাদাবাবুকে সংসারী করতে পারো। দেখতে, কিন্তু বেশ, দাদাবাবুর সঙ্গে খাশা মানাবে।

তারপর গলা খাটো করে বলল কতকটা চুপিচুপিই—তা বিয়ে না-ই বা করল। ওসব পুরুষ মানুষের বিয়ের দরকারটাই বা কী। আহা বেঁচে থাক তোমার ছেলেমেয়ে—খুঁটে খেতে তারাই ত থাকবে। মামার সম্পত্তি—!

এ কথায় পার্বতীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত রী-রী করে ওঠে। একটা কঠিন কথার ঘায়ে ও যেন ললিতার মাকে জর্জরিত করতে চায়—কিন্তু ভাষা খুঁজে পায় না।

একটু পরে যখন বাকশক্তি ফিরে পেল তখন দাঁতে দাঁতে চেপে পার্বতী বলল—দুপুর বেলায় মানুষকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে গেরস্তর অমঙ্গল হয়; নইলে তোমায় দূর করে দিতাম। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি এসেছি ভাই-এর পয়সার গন্ধে, একথা বলবার আস্কারা কে দিয়েছে শুনি?

ললিতার মা ঘাড় নীচু করে ভাতের থালায় মনোনিবেশ করেছে—পৃথিবীর আর কোনো কিছুতে কান দেবার যেন অবসর নেই তার।

প্রভঞ্জনের বাড়ি ফিরতে বেলা আড়াইটে তিনটে বেজে যায়। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে সে দু-একখানা বিলেতী ডাক্তারী কাগজ ওল্টায় ইজি চেয়ারে বসে। দিনে শোয়া তার অভ্যাস নেই। একটু বিশ্রামের পর সে যায় ক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরীতে। সকালের অর্ধসমাপ্ত কাজগুলি সেরে নিয়ে

তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। সেখান থেকে ডাক্তারখানা এবং শেষে রোগী দেখা এই নিয়মেই চলছে। অবশ্য কোনো নিয়মই তার দীর্ঘস্থায়ী হয় না, প্রয়োজন মত নিয়ম বদলায়।

ফুরসৎ এত কম যে মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা খুবই কম হয়। যা হয় সে ওই দুপুরে খাবার সময় এবং তেমন দরকারী কিছু কথা থাকলে সেটা রাত্রে শোবার সময় সে যখন মাকে প্রণাম করতে আসে তখন।

কিন্তু আজ দুপুরে দাদা বাড়িতে পা দিতে না দিতেই পার্বতী হাতের কাজ ফেলে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ ধরে যে কৌতূহল এবং অভিমানের অন্তর্বিপ্লবে তার মন বিধ্বস্ত হচ্ছিল অবিলম্বেই সেটা নিরসন করতে হবে।

কালক্ষেপ না করে পার্বতী বলল—একটা কথা বলছিলাম দাদা!

'হ্যাঙ্গারে' কোটটা ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে প্রভঞ্জন বোনের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

পার্বতী বলল—এভাবে আর কতদিন নিজে হাতে জামাকাপড় গুছিয়ে রাখা চলবে, শুনি! আমরা ত ভূত, আমাদের দিয়ে এসব কাজ হয় না, ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবে। তা কাজ জানা একটা—

কথার মাঝ পথেই প্রভঞ্জন বলল—হ্যাঁ, চাকরের কথা ত অনেককেই বলেছি! দু'চার দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। মুশকিল কি জানিস, যুদ্ধের দৌলতে সবাই দু'মুঠো রোজগার করেছে, অল্প মাইনেতে আসতে চায় না। তা বলে তোর দাদা ত আর এত লাটসাহেব হয় নি যে ষাট-সত্তর টাকা দিয়ে লোক রাখতে পারে!

হতাশ ভাবে পার্বতী বললে—আচ্ছা দাদা, দিন দিন তুমি কি হয়ে যাচ্ছ বলো তো?

বোনের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসল প্রভঞ্জন—কেন রে?

—আর কেন! আমি বলছিলাম কি, তুমি এবারে মাকে ছুটি দাও।

—তুই এখানে থাকলেই মা ছুটি পান। সে কথা কবে থেকে বলছি। তা যদি না হয় তবে ঠাকুর চাকরদের হাতে নিজেকে সঁপে দেবো।

—আহা তা কেন, একটা বৌ এলে ত সংসার দেখবার একজন পাবে তুমি।

—কেন তোরা কি আমার আপন ন'স ?

মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা উন্মুখ হয়ে উঠেছে সেটা কিছুতেই বলতে পারছে না পার্বতী।

অবশেষে মরীয়া হয়ে বলে বসল—আচ্ছা তোমার ডাক্তারখানায় রোজ কে মেয়ে আসে, দেখতে খুব সুন্দরী ?

প্রভঞ্জনের প্রাণখোলা হাসিতে ঘরখানা ভরে যায়।

পার্বতী কতকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল—অমন হেসে উড়িয়ে দিও না। বলতে হবে।

হাসি থামিয়ে প্রভঞ্জন বললে—নিশ্চয় নিধুর কাজ। কাকে দেখে মার কাছে লাগিয়েছে তা কি ক'রে বলি বল।

পার্বতী মনে মনে কি যেন চিন্তা করে প্রশ্ন করল—আজও এসেছিল বুঝি ?

—কত মেয়েই ত আসে, কার কথা বলছিস তুই ?

—উঁহু, অত হামেশা আমার মত মেয়ে নয়, খুব চমৎকার সুন্দরী।

—তা আসতে বাধা দেখি না।

—ললিতার মা রূপের ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ। মেয়েটি খুব সুন্দর, গাড়ী ক'রে খুব সেজেগুজে আসে !

—তা রূপসী মেয়ে তাতে কোনো ভুল নেই। লেখাপড়াও জানে। আর পয়সাও করেছে বিস্তর। রমিতা মজুমদার ওর নাম—ফিল্ম স্টার !

—রমিতা মজুমদার ? ওঃ, বুঝলাম। অমন পয়সার মুখে ঝাড়ু। রূপের কপালে আগুন। মুখ বাঁকিয়ে পার্বতী বলল।

প্রভঞ্জন বলে—কেন রে ! ওই রকম একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে, আর কোনো ভাবনা থাকে না। দিব্যি খাও-দাও আরামে ঘুম দাও।

—থামো দেখি ! ও মেয়ের নাম মুখে আনা উচিত নয়। উঃ জাঁহাবাজ মেয়ে একটি ! স্বামীর মুখে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়,—মেয়ে জাতের কলঙ্ক।

প্রভঞ্জন বিস্মিত হয়ে বলে—কিন্তু মেয়েটিকে দেখে ত মনে হয় না।

পার্বতী রীতিমত ঝাঁঝালো গলায় বলে—ওসব মেয়ে ওমনিই হয়।

আমাদেরই স্কুলে পড়ত ও, ওর বিয়ে হয়েছিল একটা বামুনের ছেলের সঙ্গে—সে কী কাণ্ড!

—আচ্ছা, তুই এসব কি করে জানলি?

—আমি কেন? সবাই জানে। স্কুলে পড়তে পড়তে হেডমিসট্রেসের পাতানো এক ভাই-এর সঙ্গে খুব জমালো। তাই নিয়ে কেলেঙ্কারী। কলেজে পড়তে পড়তে ছেলেটাকে নিয়ে কি নাচানাচিই না করল। বিয়ে-থাও করল। কিন্তু ওসব ঘর-জ্বালানী মেয়ে, পারবে কেন বেশীদিন শান্তিতে থাকতে। ওর স্বামীর অপরাধ, সে নাকি মদ খায়। আহা বলি, সবাই কি আর আমার দাদার মত মহাপুরুষ। খুঁজলে ত ঘরে ঘরেই অমন একটু আধটু গলদ বেরোয়। স্বামীর সঙ্গে ঘর করবি না বেশ কথা—তাই বলে হাজারো জনকে রূপ দেখিয়ে খুশি ক'রে পেট ভরানো! ছি-ছি-ছি! আমি কি আর অত জানতুম ছাই! ওঁর সঙ্গে একদিন টকী দেখতে গিয়ে দেখি পর্দার গায়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে আমাদের সেই সান্ত্বনা! সেই তেমনি ঘাড় বাঁকিয়ে, এড়িয়ে এড়িয়ে কথা বলা, তেমনি মনভোলানো ভঙ্গিতে তাকানো। আমি বললাম—এ আমাদের সান্ত্বনা না হয়ে যায় না। উনি বললেন—না, ওর নাম রমিতা মজুমদার। খুব তর্ক হল। তারপর এই সেদিন কোথা থেকে উনি সব শুনে এসে বললেন—তুমি ঠিকই বলেছো। বুঝলে দাদা, তারপর থেকে তোমার ভগ্নিপতি ত আমায় ঝুলোঝুলি, বলেন যে, দাও না আলাপ করিয়ে একবার।

প্রভঞ্জন বলল—তা দিলেই পারিস।

পার্বতী রীতিমত চটে গেল—আহা, তোমার কথার কি ছিরি। ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া অপমান নয়!

—কেন?

—সে সব তুমি বুঝবে না।

প্রভঞ্জন অকস্মাৎ বলল—তুই কি বলতে চাস ওর স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ।

পার্বতী এ কথায় বলল—সে প্রশ্নই ওঠে না। স্বামীর দোষগুণটা একটু বড় ক'রে দেখা কেন!

—বাঃ তা কেন দেখবে না! স্ত্রী ত জড় নয়, মানুষ মাত্রেরই ন্যায়সঙ্গত কতকগুলো অধিকার আছে।

প্রভঞ্জন শান্ত কণ্ঠে বলে।

পার্বতীর মনে হয় তার দাদা রমিতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে। তা কিছুই বিচিত্র নয়। ডরোথীকে যার ভালো লাগে, রমিতাকে সে পছন্দ করতেই পারে। পার্বতী বলল—তুমি কি বলতে চাও যে, এভাবে ঘর ভেঙে দেশের সর্বনাশ যারা করে তারা ভালো।

প্রভঞ্জন আগের মতই অনুত্তেজিত ভাবে জবাব দেয়—না, তা বলি নে। তবে স্বামী যদি অকথ্য অত্যাচার করে তবে তার প্রতিবাদ করবে না? অবশ্য এ দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ অশিক্ষিত, তারা নিরুপায় হয়ে সব কিছু সহ্য করে, তার সুযোগ নিয়ে পুরুষেরা যা খুশি তাই করে বেড়ায়! সত্যি বলছি পার্বতী তুই বিশ্বাস কর, মাঝে মাঝে এক একটা কেস্ আসে যার মূল হচ্ছে অবিবেচক পুরুষের অমানুষের মত ব্যবহার। রমিতার ওপর আমার একটু শ্রদ্ধা হয়েছে, তার কারণ সে সাহস দেখিয়েছে। সাহসটা বড় কথা। জীবিকা হিসেবে সে যা বেছে নিয়েছে, সেটা অবিশ্যি আমাদের সমাজে প্রশংসনীয় নয়।

পার্বতী এবারে জ্বলে উঠল—তোমার মতে এটা অন্যায় নয় বুঝি?

প্রভঞ্জন তেমনি নির্বিকার ভাবে জবাব দেয়—এমন আর কি অপরাধ!

ঠিক এমনি সময়ে মা এসে ঘরে ঢুকলেন। পার্বতী কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, মাকে দেখে চুপ করে গেল।

মা অনুযোগ করলেন—হ্যাঁ রে, ক্ষিদে তেষ্টা নেই? বেলা চারটে পর্যন্ত শুকিয়ে থাকতে খুব মজা লাগে, না!

প্রভঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠল। এবং পার্বতীর দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর ভাবেই বলল—ঞ্জাখো মা, যদি বা এতদিন পরে আমার একটা মেয়ে পছন্দ হল —পারুটা ভাংচী দিয়ে বসল। এরপর ক্ষিদেতেষ্টা থাকে?

মা বুঝতে পারলেন। এরকম পরিহাস প্রভঞ্জন অকপটেই করে। কিন্তু পার্বতী আজ কেন যেন কথাটা হাল্কা ভাবে নিতে পারল না। হয়ত সকাল থেকে একের পর একটা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ওর মনটা তেমন সুস্থির ছিল

না। তা ছাড়া তার বিবাহিত জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছে মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। ললিতার মাও যেন পার্বতীর মনে সংশয়ের কাঁটা জাগিয়ে দিয়েছে, প্রভঞ্জনও সেটার দিকেই ইঙ্গিত করছে কিনা পার্বতী ঠিক বুঝতে পারে না। ও যেন বিরক্ত হয়েই বলে—যাকে খুশি বিয়ে করো না, ভাংচী দিতে যাবো কেন? কী স্বার্থ আমার।

প্রভঞ্জন হেসে বলল—ও রকম বাঁকা কথা বলাই ত ভাংচী।

মা বাধা দিলেন—তোর ছেলেমানুষী আজও গেল না। পারুকে রাগাস কেন? বেচারী নিজের দুঃখেই—

শেষের কথাটা সমাপ্ত করবার আগেই মা নিজের ভুল বুঝতে পেরে থেমে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণে মেয়ের মুখের পানে চেয়ে দেখলেন আঁধার নেমেছে সেখানে। প্রতিনিয়ত যে মনে দুঃখ দমনের যুদ্ধ চলেছে সেখানে বাইরে থেকে কোনো সহানুভূতির ছোঁয়াচ পেলে আর সে দুঃখকে লুকিয়ে চেপে রাখা যায় না। পার্বতী চোখের জল সামলাতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল।

প্রভঞ্জন ডাকল—মা!

চমৎকারিণী তার মুখের পানে তাকালেন। সে চাহনীও খুব শুষ্ক নয়।

প্রভঞ্জন আবার ডাকে—মা। সত্যিই কি চাও যে বিয়ে করি।

চমৎকারিণী বললেন—বেলা যে আর নেই রে।

সন্ধ্যে হয়ে গেলে যে কি হবে প্রভঞ্জনের তা জানতে বাকী নেই। মায়ের প্রতিটি হাঁচি কাশি পর্যন্ত তার সুজ্ঞাত। তাঁর নিয়ম-আচার তার নখদর্পণে। তিনি সন্ধ্যার পর ফলমূল ছাড়া আর কিছুই খান না। এবং ছেলেকে পাশে বসিয়ে খাওয়ানো তাঁর দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। তেমন দেরি হলে সেদিন আর তিনি অন্ন গ্রহণ করেন না।

প্রভঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বলল—এখনও খেতে দাও নি, হ্যাঁ মা। বিয়ের নামেই খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠল!

মায়ের চোখে মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। তিনি বললেন—অনর্থক রঙ্গ করিস নে বাপু। আজও যে ওই কথাটা উঠলেই ডরোথীর কথা মনে পড়ে।

ভগবান বুঝি ভুল করেই ওকে সাহেবের ঘরে পাঠিয়েছিলেন। আহা অমন লক্ষ্মীর মত শ্রী আজকাল আর আমাদের ঘরেও দেখা যায় না।

একটা চাপা নিশ্বাস সহসা চমৎকারিণীর বুক ঠেলে উঠল, শূন্যের বায়ুস্তরে ক্ষীণ তরঙ্গ তুলে মিলিয়ে গেল। এ নিশ্বাসটুকু তিনি গোপন করতে পারলেন না।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে প্রভঞ্জন বলল—ন্যাখো মা, বিলেত যাবার আগেই একটা বিয়ের ঠিকঠাক করে ফ্যালো!

বিস্মিত চমৎকারিণী ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—কেন রে?

—সবাই যখন চায়!

—কিন্তু তুই যে চাস না?

—আমার একার মত জোর ক'রে সবাইকে গিলিয়ে দেবো?

—কিন্তু সবাই মিলে তাদের মতটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তুমি সেটা মেনে নিতে পারবে? দায়িত্ব ত তোমারই!

পরক্ষণে তিনি ছেলের পাতের দিকে চেয়ে বললেন—ও কী রে, কিছুই ছুঁস নি! এর জন্যে আয়োজন করে বসা কেন? দিন দিন পাখীর আহার হয়ে উঠছে যে! আর দুটি দৈ দিয়ে মেখে নে।

প্রভঞ্জন মৃদু হেসে বলল—এখনই বেরুতে হবে। হ্যাঁ, শোনো—ভেবে দেখলাম, বিলেত যাওয়ার আগেই বিয়েটা চুকোনো নিরাপদ।

মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল—কেন, আমি কি কোনোদিন অবিশ্বাস করেছি তোকে?

—না, মা সেজন্যেই ত ভয়। যদি তোমার মর্যাদা রাখতে না পারি?

—তাহলে বুঝব ভগবানের অভিপ্রায় তাই। সত্যি যখন সে মেয়েটার কথা ভাবি তখন কষ্ট হয়, আহা তারও কোনো দোষ নেই। সে সত্যিই দেবী। নইলে আজও সাত সমুদ্রের পারে বসেও নিষ্ঠাকে এতটুকু ছোট করে নি!

প্রভঞ্জন অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

নীলাম্বর দৌড়ে এসে খবর দিল—মামাবাবু, টেলিফোন ঝন্-ঝন্ করছে।

প্রভঞ্জন ত্বরিত পদে চলে গেল।

মধ্যপথে পার্বতী অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল—দাদা, কে একটি মেয়ে ফোন করছে।

বোনের দিকে তাকিয়ে প্রভঞ্জন রিসিভারটা হাতে তুলে নিল,—হ্যালো, হ্যাঁ আমি! আপনি? ও, নমস্কার রমিতা দেবী! আবার কি? কিন্তু আজ ত অবসর হচ্ছে না। না, না, তা নয়। কথা দিতে পারছি না। আচ্ছা চেষ্টা করব। ভাববেন না, একটু সাবধানে থাকতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আজ আর কোনো কাজ নয়—বিশ্রাম নিন। আচ্ছা, নমস্কার।

ল্যাবরেটরীর কর্মব্যস্ততায় ডাক্তার সরকার নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। অসংখ্য মানুষের বিচিত্র পরিচয় এখানে এই নিভৃতে আবিষ্কৃত হয়। প্রত্যেকের শিরা ধমনীর রক্তস্রোতে যে সংবাদ বাহিত হচ্ছে তা ক'জন জানতে পারে! এক একটা বিশ্লেষণে এক-এক রকম ফল দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার গভীর মনোনিবেশে প্রত্যেকটি নিরীক্ষণ করছে। মানুষের রক্তপ্রবাহে জটিলতার অন্ত নেই। তার মধ্যে কত বিচিত্র ব্যাক্‌টেরিয়া প্রতিনিয়ত জীবন লাভ করছে, কত মরছে! এই অনন্ত জীবন-মৃত্যুকে ধারণ করে মানুষ কোন্ পথে চলেছে, অন্ধ শক্তির আকর্ষণে। প্রতিদিন পরীক্ষায় বিষাক্ত রক্তের নমুনার সংখ্যা বাড়ছে। সম্মুখে রয়েছে আরও—আরও জটিল সমস্যায় ঘনীভূত ভবিষ্যত, জাতির ভাগ্যে স্বাস্থ্য-হীন মর্কটের আবির্ভাব সূচিত করে। সমাজের স্তরে স্তরে যে পার্থক্য এতদিন একদল মানুষকে সুখী রেখেছিল, আর একদলকে রেখেছিল অন্ধকারে নীচের তলায়। অত্যাচারে তাদের জীবন আচ্ছন্ন ছিল, আজ কোন এক অলক্ষ্য শক্তির অলঙ্ঘ্য নিয়মে তারা দুইদল মিশে যেতে বসেছে। রোগ উঠে এসেছে সমাজের ওপর তলায়। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ দুইয়ে মিলে এনে দিয়েছে মানুষের মনে শিথিলতা! অথবা আগেও ছিল—হয়তো অন্য কক্ষে বিচরণ করত। মানুষের এই বিকৃতির পরিচয়-বিশ্লেষণই সব কিছু গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। এই কী খ্যাতির মূল্য? প্রতিদিন অসুস্থ মানুষের ভিড় বাড়ছে—আরও খ্যাতির সঙ্গে আরও অনেক এমনতর রোগীরই সংখ্যা বাড়বে! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে প্রভঞ্জনের। সেই রুদ্ধ শ্বাসের নীচে সূক্ষ্ম আত্মপ্রসাদের ধারা ক্ষরিত হয়—ভগ্নস্বাস্থ্যকে সুস্থ করার কল্পনায়ও আনন্দ আছে বই কি!

ডাক্তার সরকার লিখে যাচ্ছে পরীক্ষার রিপোর্ট। তার মনের মধ্যে চলেছে প্রতিক্রিয়া। এই মুহূর্তে সে ভুলে গিয়েছে বাইরের পৃথিবীর কথা, যেখানে সুস্থ মানুষ প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রামে নিয়োজিত করছে শক্তি, যেখানে তাদের আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব চলছে—সেখানকার কথা মুছে গিয়েছে ডাক্তার সরকারের মন থেকে। তার মনে হচ্ছে, মানুষ বর্তমান-ভবিষ্যতকে একটা যন্ত্রণার কাতরতায় ভরে দেবার জন্য প্রস্তুত। পরক্ষণে মনে হয় তার, যারা রক্ত পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসা করাতে চায় তাদের সংখ্যা ত কম, প্রায় নগণ্যই বলা চলে। কিন্তু এ ছাড়া যারা ব্যাধিকে, যন্ত্রণাকে ভাগ্যের দুষ্ট চক্রান্ত বলে অসহায় ভাবে সয়ে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা কত্তো তা কে বলতে পারে! তারা কি করছে?

হাসপাতালের খবর সে জানে। সেখানে এসব রোগের তেমন যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করা হয় কি? হাসপাতালে সাধারণত ছাত্ররা অথবা যদি কোনো ডাক্তার দেখেন, তাঁরা সব সময়েই রোগীদের অবজ্ঞাই করেন। তাঁরা নৈতিক উপদেশ দিতে গিয়ে তিরস্কার করেন। অনেকেই সেখানে যেতে ভয় পায়। গোপনভাবে রোগকে লালন ক'রে চলেছে কত্তো মানুষ!

একতাড়া কাগজপত্র দেখেশুনে সই করে ডাক্তার সরকার যখন ঘাড় তুলল তখন অনেক রাত। সামনে স্তূপীকৃত কাচের টিউব। রাসায়নিক দ্রবগুলি আর সরঞ্জামের মিলিত তীব্র গন্ধে নাসারন্ধ্র জ্বালা করছে। একখানা ওষুধের বিজ্ঞাপন-ওয়ালা আমেরিকান জার্ণাল পড়ে ছিল মাটিতে, সেখানা তুলে রাখতে রাখতে প্রভঞ্জন ভাবে—মানুষ যে এইভাবে অস্বাস্থ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা ঠেকাবার কি উপায় নেই! নিজের মনে সে হাতড়ে বেড়ায়! অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কথাই আজ মনে পড়ছে! তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে কোনো পথ খুঁজে গিয়েছেন। তাঁরা শুধু এইটুকুই জেনেছেন যে রোগ হলে কি উপায়ে চিকিৎসা করা চলে—কিন্তু তাঁরা কেউ দেখতে পান নি কি করে এই মারাত্মক রোগটিকে প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু সে পথ আবিষ্কার করতেই হবে। এই নিয়েই ডাক্তার সরকারের গবেষণা। এই একটি বিষয়ই সকল চিন্তাকে ছাপিয়ে ভেসে থাকে। মানুষ বাঁচুক, সুস্থভাবে বাঁচুক মানুষ।

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে প্রভঞ্জনের মাথা খানিকটা হাল্কা লাগে। [illegible]

যেন নিজের কাছ থেকে তার মুক্তিলাভ ঘটেছে। চিন্তার গুরুভার একপাশে সরিয়ে রেখে প্রভঞ্জন চুরুট ধরাল।

এবার রোগী দেখার পালা।

আজ বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে। ঘুমে চোখ দুটো বুজে আসতে চায়। তবু পাঁচটা রোগীর বাড়ী যেতেই হবে। না, এতগুলো কেস নেওয়া ঠিক হয় নি! হয়তো এই ভাবে রোগীদের ওপর অবিচার হয়। চিকিৎসা ভালো ভাবে না করলে নিজেরই বিবেকে খোঁচা লাগে। অথচ উপায় নেই। কেউ এলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না।

আজ তার সবচেয়ে কষ্ট হল রায় বাড়ির তিন মাসের একটি শিশুকে দেখে। সারা গায়ে ঘা, প্রবল জ্বর—আজকেই একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁচবার নাকি আশা নেই।

বাচ্চার মা কেঁদে প্রভঞ্জনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল—ডাক্তার বাবু, বাঁচিয়ে দিন আমার খোকাকে, পায়ে পড়ি আপনার। হোক না আমার কানা-খোঁড়া, ওকে আপনি বাঁচান, দোহাই ডাক্তার বাবু! বাঁচাবে ত? খোকা বাঁচবে না?

বিষণ্ণ হেসে প্রভঞ্জন বলল—উঠুন। ছেলেকে বাঁচাতে চাইলে শক্ত হতে হবে।

মেয়েটি বলল—এই ত শক্ত হয়ে আছি। চোখের সামনে ছেলের চোখ ফেটে বেরিয়ে গেল চেয়ে দেখলাম। আর কি করে শক্ত হয়! দোহাই ডাক্তার বাবু আমার খোকনকে মেরে ফেলবেন না।

প্রভঞ্জন সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু মেয়েটি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল—আপনি জানেন না, ওরা খোকাকে ঘেন্না করে। খোকার গায়ে বিশ্রী ঘা। ওর গায়ের দুর্গন্ধে কেউ কাছে আসে না। আমাকেও ওরা ঘেন্না করে সবাই। ডাক্তার বাবু, আপনি অমন পাথরের মত চুপ করে আছেন কেন? আপনাকে ওরা টাকা দিয়ে এনেছে বলে যেন ওদের কথা শুনে খোকাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবেন না। আমি, আমি আমার গয়না পত্র সব খুলে দেবো। খোকাকে বাঁচিয়ে দিন.

আপনি। মায়ের মুখ চেয়ে ছেলেকে বাঁচালে ভগবান আপনার ভালো করবেন। পায়ে পড়ি আপনার।

প্রভঞ্জন ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি টেনে আনে—ডাক্তার-সুলভ স্বল্প হাসি। সে বলে—ব্যস্ত হবেন না। ছেলে আপনার সেরে উঠবে।

হাসি-কান্নায় মায়ের চোখ ছলছলিয়ে আসে। ভালো হবে! ভালো হবে! সত্যি আপনি ভালো করে দেবেন?

মনে মনে প্রভঞ্জন হতাশ হয়ে পড়ে—এই বিকলাঙ্গ শিশু যদি বেঁচে থাকে তবে পৃথিবীর বিড়ম্বনার ভারই বাড়াবে!

বৈঠকখানা ঘরে এসে ডাক্তারকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে গৃহস্বামী চিন্তান্বিত ভাবে বললেন—কেমন দেখলেন?

প্রভঞ্জন বললে—এটিই প্রথম সন্তান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সবে দেড় বছর ছেলের বিয়ে হয়েছে। বৌমা আমার বড় লক্ষ্মী ডাক্তারবাবু। কিন্তু—!

—এ আগে সাবধান হওয়া উচিত ছিল আপনাদের। ছেলে যদিও বাঁচে কোনো কাজে আসবে না। ওর চোখ দুটো ত নষ্ট হয়েছেই—আরও কি যে হবে বলা যায় না।

—তাহলে অনর্থক বাঁচিয়ে ওকে কষ্ট দিয়ে কি হবে?

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে 'হুঁ' বলেই থেমে গেল। নিজে হাতে এই একটি মানুষের জীবনকে সমাপ্ত করে দেওয়া কি সম্ভব? যদি বাঁচে তবে এই শিশুই একদিন সমাজের শিরায় সঞ্চারিত করবে বিষ। না, ঠিকমত চিকিৎসায় রাখলে ফল ভালও হতে পারে! তবে প্রভঞ্জন ভালো ভাবেই চিকিৎসা করবে।

গাড়িতে বসে প্রভঞ্জনের মনে হল—মানুষ বড় স্বার্থপর। নিজেরটুকু ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আসক্ত নয়। সমস্তটাই এদের আত্মসর্বস্বতা। এরা চায় না সবাইকে নিয়ে বাঁচতে। এরা পাশের মানুষের কথাটুকু পর্যন্ত ভাবতে ভুলে গেছে। স্বামী ক্ষমা করতে পারে না স্ত্রীকে—স্ত্রী পারে না স্বামীকে বিশ্বাস করতে। এরা দেখতে পায় কেবলমাত্র বর্তমানটুকু—

ভবিষ্যৎ এদের কাছে অনেক দূরের অন্ধকার। ভবিষ্যৎকে এরা ঠকায় বর্তমানের মোহে।···এই শিশুটি, এর মা—এদের ওপর কি সুবিচার করল পৃথিবী! এরা জানে না কেন অপরের অর্জিত ব্যাধির পরিণাম এলো এদের ভাগ্যে। কেন একটি অজ্ঞান শিশুকে মানুষের চক্রান্ত বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্য কোন্ আদালতে আর্জি জানাতে হবে, শিশুটি কি জানে! তার মাও ত জানে না তা। অন্ধকার গাড়িতে একলা ষ্টিয়ারিং ধরে সামনে শূন্য দৃষ্টিতে প্রভঞ্জন তাকিয়ে থাকে। তার সামনে পথের অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু দুটি চোখ—করুণ আকুতির আবেদনে সজল দৃষ্টি ভরা সরল মুখচ্ছবি

ল্যাবরেটরীতে ফিরে এলো প্রভঞ্জন। ডাক্তারখানায় আজ আর এ বেলায় সে যায় নি। ফোন করে জানিয়েছে—শরীর খারাপ। অন্য যে সব রোগী দেখ্‌তে যাবার কথা ছিল সেসব জায়গায় যাওয়া চলবে না—কারফিউ। স্বদেশী সরকারের আইন অমান্য ক'রে ছাত্ররা শোভাযাত্রা বার করেছিল। অতএব কর্তৃপক্ষ আত্মরক্ষার জন্য গুলী চালাতে বাধ্য হয়েছিল!

ডায়েরী লিখতে বসল ডাক্তার সরকার।

···কিছুদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান যুগে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ জন্ম-হার কমাবার জন্যে মনে মনে সচেষ্ট। তারা সহজ পথটা দেখতে পায় না। যথেচ্ছভাবে দৈনন্দিন জীবন কাটিয়ে দিয়ে অবশেষে বিপদের সামনে পড়ে তারা অবশ্যম্ভাবী সন্তানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপসারণ করতে চায়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার চাপে অনেক কিছুই অগ্রাহ্য করছে সবাই। তারা ভাবে—একটি ছেলে অথবা মেয়েকে মানুষ করার দায়িত্ব গুরুভার। কথাটা সত্যি। খুব কম করে ভারতের চার থেকে সাড়ে চার কোটি লোকের একবেলার বেশি আহার জোটে না। কিন্তু একটা কথা অনেকেই জানে না যে, কেবলমাত্র জন্মশাসন দিয়ে মানুষের স্বাস্থ্যহার বাড়ানো যাবে না। জন্মহার কমছে এবং দারিদ্র্যও বাড়ছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, মুষ্টিমেয় কয়টি অবস্থাপন্ন এবং মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্যক্ষেত্রে চিকিৎসার চেয়ে বেশি দরকার খাদ্যের।

আমি জানি, এদেশে আমার এই বিশেষ ধরনের চিকিৎসার দরকারই হত

না। এলো দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধ। এই দুর্ভিক্ষ টেনে এনেছিল একশ্রেণীর মানুষকে অভাবের চরম সীমায়। আর একদিক থেকে যুদ্ধ এনে দিয়েছিল অর্থের প্রাচুর্য অন্য শ্রেণীর হাতে। যারা অর্থ পেল তারা সেই হঠাৎ-পাওয়া টাকা দিয়ে নগদ আনন্দের সন্ধান করল—অপরপক্ষ খাদ্যের আশায় কখনও গোপনে, কোথাও বা প্রকাশ্যেই ইজ্জতের খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারা বাঁচতে চায়, খেয়ে প'রে।

ডায়েরী লিখতে লিখতে ডাক্তার সরকার কলম থামিয়ে পাতা ওল্টালো। আবার তার লেখনী চলতে লাগল শুভ্র কাগজের ওপর সারি সারি কালো সৈনিকের মত অক্ষর সাজিয়ে।

···আজ কষ্ট পেলাম ওই বিষজর্জর কচি শিশুটিকে দেখে। একে বাঁচিয়ে লাভ নেই—কিন্তু মেরে ফেলতেও ইচ্ছে করে না। ছেলেটি যদি অন্ধ না হ'ত তবে তাকে বাঁচাতাম। কিন্তু এখন আর ওর চোখ ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ···রমিতা মজুমদার একটা সমস্যা। ওর মানসিক চিকিৎসা দরকার। ওর ধারণা হয়েছে সমাজকে ভেঙেচুরে দিয়ে নূতন করে গড়তে হবে—এটাও মানসিক বিকার। খুব সাবধানে ওর এই মনের গতি একটু একটু করে ফিরিয়ে আনতে হবে।···

ড্রয়ারে রেখে দিল।

মন্দাকিনীর চিকিৎসা শেষে খুব সমারোহ সহকারেই শুরু হল। এখন অনুকূলের পয়সার অভাব নেই। স্ত্রীর চিকিৎসা এবং নিজের পান-ভোজনের ব্যবস্থা দুইই বেশ ভালো ভাবে বজায় রেখে চলছে সে। বর্তমানে ভারবাণী চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সে একজন উপদেষ্টা এবং কর্তাব্যক্তি। বাড়িতে থাকার সময় নেই। একসঙ্গে দু'খানা ছবির কাজ চলছে। এ সময়ে স্ত্রীর শিয়রে বসে থাকার সময় কোথায়! সেজন্যে ত দু'জন নার্স রাখা হয়েছে। বড় ডাক্তারদের উপর চিকিৎসার ভার দিয়েছে। এর চেয়ে আর বেশি কি করতে পারতো সে। রাত্রে বাড়ি ফিরে নার্সের কাছে সারাদিনের খবর নেয় অনুকূল।

অনুকূল কাছে গিয়ে বসলে মন্দাকিনী তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি দিয়ে যেন ওঁকে

লেহন করে। শান্ত স্তিমিত কণ্ঠে এক সময়ে প্রশ্ন করে—হাঁ গো ক'টা বাজল ?

বাসাডেরা পাহাড়ের নীলাভপুষ্পগুচ্ছের মত সেই কণ্ঠে মায়া ঝরে পড়ে। কলকাতার এই ইলেক্‌ট্রিক লাইটের সঙ্গে এর যেন কোন সামঞ্জস্য হয় না।

নির্লিপ্ত অনুকূল বলে—সাড়ে এগারোটা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন্দাকিনী অনুকূলের ডান হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে রাখে। ধুকধুক শ্বাসতরঙ্গ। এককালে যে সেখানে বর্ষার প্রচুর প্রাণ-বন্যা উত্তাল হয়ে উঠেছিল তার কোনো রেশ রণিত হয় না।

মন্দাকিনী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আস্তে আস্তে বলে—আমার জন্যে কতই কষ্ট তুমি পাচ্ছ। এই দুপুর রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী! তোমাকে দেখলে কষ্ট হয়। সত্যি তোমার জীবনে আমি মস্ত বোঝা হয়েই রয়েছি। যাও শুয়ে পড়ো। আবার ত ভোর না হতেই ছুটবে!

অনুকূল বলে—সব সময় তোমার কাছে থাকাই আমার ইচ্ছে কিন্তু কাজের ধকলে সবই বদ্‌লে গেছে।

—না, না আমার কাছে থাকতে হবে না। শেষে তুমিও যদি অসুখে পড়ো ত কে দেখবে? যাও ঘুমোও গে। আমার কাজ ত নার্সরাই করে।

অনুকূল চলে যায়। এই এক ভাবেই ওদের দিন কাটছিল।

সেদিন একটু আগেই বাড়ি ফিরেছিল অনুকূল। হাতমুখ ধুয়ে সে যখন মন্দাকিনীর কাছে এসে বসল তখন মাত্র সাড়ে নটা।

মন্দাকিনী বলল—আজ একটু গান শুন্‌বে ?

অনুকূল হেসে জবাব দিল—ওই গানই ত আমাকে একদিন পাগল করে-ছিল। সেই যে গেয়েছিলে তুমি! যেন তোমার সমস্ত দেহ মন, গেয়েছিল। আমি পাগল হয়ে গেলাম তাতেই!

শীর্ণ মুখের ওপর কালো ডাগর চোখের গভীর চাহনি যেন কিসের দ্যুতি দিয়ে যায়। মন্দাকিনী বলল—শোনো তবে—

অনুকূল বলল—কিন্তু ডাক্তার যে বেশী কথা বলতে বারণ করেছে।

অনুযোগের সুরে ক্ষীণ কণ্ঠে মন্দাকিনী বলল—ডাক্তার কিছু জানে না। আজ যে গান গাইতে ইচ্ছে করছে বড্ড!

অনুকূলকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ও গাইতে শুরু করল—

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল।

বার কয়েক এই চারটি কলি গেয়ে মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

অনুকূল তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল—ঘুমোও মন্দা।

মন্দাকিনী অধীর ভাবে বলে—আর মনে পড়ছে না কেন? কই আর সব কলিগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়েছে! কই—

শীর্ণ মুখের ওপর আয়ত দুটি চোখের কোলে কোলে অশ্রু ছলছল করছে। হঠাৎ মন্দাকিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

অসহায় ভাবে অনুকূল ঘরের চারদিকে তাকাতে থাকে।

কাঁদতে কাঁদতে মন্দাকিনী বলল—আর না, আর আমি বাঁচব না গো, গান ভুলে গেলাম। এই গান গেয়েই রোজ রাত্রে আমি ঘুমোতাম। এ গানের সুরে আমার মন শান্ত হয়ে যেত। এলিয়াসের মুখখানা যেন কাছে দেখতে পেতাম এই গানের মধ্যে দিয়ে। সে গান হারিয়ে গেল! হারিয়ে গেল!

তারপর কখন মন্দাকিনী ঘুমিয়ে পড়েছিল, কখন যে অনুকূল শিয়র থেকে চলে গেছে মন্দাকিনী টেরও পায় নি। ওর ঘুম ভেঙে গেল নিশুতি রাতে। কেউ নেই—কেউ ত নেই তার বিছানায়। ঘাড় তুলে চেয়ে দেখল ঘরেও কেউ নেই। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আস্তে আস্তে ডাকল নার্সকে—কুন্দদিদি! কুন্দদিদি!

সাড়া নেই। বোধ হয় নার্সও ঘুমিয়ে পড়েছে।

অসুখের আগে থেকে প্রতিনিয়ত একটা প্রশ্ন মন্দাকিনীর মনকে আলোড়িত করত—এবং আজ পর্যন্ত তা অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে।

এই নিশুতি রাতে নিজেকে আবার সেই প্রশ্নই করে—আচ্ছা, এটা কেমন ক'রে হয়? এলিয়াস কেমন ক'রে অনুকূল হয়ে গেল! অনুকূল আর এলিয়াস আজ কি ক'রে আমার চোখে এক হ'ল!...পরক্ষণে ওর মনটা নিজের কাছেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল। এবার যেন তৃষ্ণা আরও তীব্র হয়ে উঠে অস্থির করে তুলল ওকে।

একটু জোরে ডাকল মন্দাকিনী। পাশের বাড়ী থেকে কর্কশ কণ্ঠে ভেসে এল—আ মরণ! রাতদুপুরে এই এক জ্বালা! ছেলেটা যদি বা ঘুমোলো, শুরু হল পেত্নীর কান্না।

ভারী গলায় কে বলল—আঃ, কেন এ সব বলো! বেচারী মরছে নিজের জ্বালায়।

কর্কশ নারীকণ্ঠে তার প্রতিবাদ শোনা যায়—তোমার যে দেখি দরদ উপ্‌ছে পড়ছে।

আবার সব চুপচাপ।

মন্দাকিনীর কথা কইতে সাহস হয় না। নিজের উপর ধিক্কার দিতে দিতে ও পাশ ফিরল। দুনিয়ার সবার কাছেই ওর অন্তহীন অপরাধ কোনোদিনই কাউকে আদেশ করতে জানে না। নার্সকে শাসন করা ত দূরের কথা, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নার্সকে কিছু বলেও না মন্দাকিনী।...খুব কষ্ট হচ্ছে, গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে। এমন সময়ে ওর মনে পড়ে গেল—

মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ।
সে যে লঙ্ঘিবে বনপর্বত
মোর বীর্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়।

আবেগের আতিশয্যে মন্দাকিনীর শীর্ণ কণ্ঠে এক আশ্চর্য লহর উঠল। ওর মনে হল এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে অনুকূলকে শুনিয়ে আসে গানের এই কয়টি কলি। তৃষ্ণার কথাটা একেবারে ভুলে গেল ও।

কতদিন বিছানায় পড়ে আছে মন্দাকিনীর ঠিক মনে পড়ে না, উঠে দাঁড়াতে পারবে কি না একবারও সেকথা মনে হ'ল না। অন্তরের উদগ্র আকুলতায় ও যেন অমিতশক্তি পেল, নিমেষের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কোলে চকিত বিদ্যুতের মতই মন্দাকিনীর শক্তিটুকু নিমেষে নিঃশেষ হ'ল। ওর অবশ দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কয়েক মুহূর্ত ওর আর কোনো জ্ঞান ছিল না। যখন চোখ মেলে তাকাল তখন ও বুঝতে পারল ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়ে আছে। মাথার উপর কে যেন হাতুড়ির ঘা মারছে—অসহ্য যন্ত্রণা।। ও পড়ে যাওয়ার শব্দে নার্স ছুটে এসেছে। অনুকূল মন্দাকিনীর পাশে বসে রয়েছে।

মন্দাকিনীকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে অনুকূল স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। ওর কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলল—হঠাৎ ওভাবে উঠে কি দেখতে গিয়েছিলে? ডাকো নি কেন কাউকে?

বিভ্রান্ত অর্থহীন দৃষ্টিতে মন্দাকিনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর কাছে এসব প্রশ্ন নিরর্থক।

অনুকূলের ঠোঁটের ডগায় একটা প্রশ্ন উন্মুখ হয়েছিল, কিন্তু মন্দাকিনীর চাহনী দেখে সে চুপ করে রইলো। মন্দাকিনী হাঁ করে কি যেন বলবার চেষ্টা করল। অনুকূল বললে—জল খাবে?

তারপর নার্সকে ইসারায় জল দিতে বলল। নার্স ব্যস্ত হয়ে ফিডিং কাপটা মন্দাখিনীর মুখের কাছে ধরল, মন্দাকিনী মুখ বুজে তাকিয়ে রইল অনুকূলের পানে। অনুকূল প্রশ্ন করলে—কি হল, জল খাবে না?

মন্দাকিনীর চোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা নেমেছে। ওর রোগপাণ্ডুর কপোলপ্রান্ত আবেগে থরথর করে কাঁপছে—অশ্রুবিন্দুও যেন সেই সঙ্গে কাঁপছে।

অনুকূল নার্সের হাত থেকে ফিডিং কাপ টেনে নিয়ে নিজেই মন্দাকিনীর মুখে ধরল।

কান্নার বেগ বিন্দুমাত্র প্রশমিত হল না। বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত অশ্রুপ্রবাহে মন্দাকিনীর শীর্ণ দেহ [illegible]

চেষ্টা করে ততবারই কি এক অবাধ্য আবেগের ধাক্কায় ঠোঁট দাঁত জিভ আড়ষ্ট-রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

অনুকূল ডাকল—মন্দাকিনী!

মন্দাকিনী অশ্রুরুদ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

অনুকূল বলল—জল খাবে না! খাও!

মন্দাকিনী একভাবে চেয়ে থাকে। ওই যে অশ্রু—ও যেন দু'জনের মধ্যে সাগরের ব্যবধান এনে দিয়েছে। তবু ওই অশ্রুর ওপারে যে চাহনী ভাস্বর সে যেন অনুকূলের অন্তরের গোপনতম প্রদেশের সকল খবর পেয়েছে। মন্দাকিনীর এই অশ্রুতে যে বিচিত্র ভাব-বৈষম্য পরিস্ফুট হয়েছে তার অর্থ বুঝতে অনুকূলের কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না—তবু যেন সে নিজেকে প্রতারিত ক'রে বলল—কিছু বলছ?

তার কণ্ঠস্বরে একটা শূন্য অসহায় ভাব। এ ভাবে সে ত কোনদিন ধরা দেয় নি। সে কাতরকণ্ঠে বলে—আমায় ক্ষমা করো মেরী।

মন্দাকিনীর অশ্রু যেন স্ফটিক পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। সহসা ওর রূপান্তর ঘটল যেন। আর সে ওষ্ঠপ্রান্তে কম্পন নেই, কোনো শিহরণের লেশ-মাত্র নেই। শুধু অনুকূলের অসাবধানতায় জলপাত্র হতে কয়েক বিন্দু জল মন্দাকিনীর কণ্ঠদেশে পড়েছিল। সেটুকু ওর কালো মসৃণ ত্বকের ওপর মুক্তোর মত টলটল্ করছে।

অনুকূল গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে—ওর বুক বেয়ে একটা বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। সেই সঙ্গে এনে দিল অসীম অবসাদ।

মন্দাকিনীর শেষ অভিমান অনুকূলের জীবননাট্যে একটা বড় অঙ্কের যবনিকা টেনে দিল।

অনুকূল আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে তারা ঝক্-ঝক্ করছে। চাঁদ এখনও ঝলমল করছে। সকাল হতে অনেক দেরি। মন্দাকিনী মরে গেল!

ভোরের প্রথম আলো তখনও কলকাতার পথের সুপ্তির শান্ত পরিবেশকে

স্পর্শ করে নি। পরিবর্তন মজুমদার স্নানের পর ছাদের ওপর গিয়ে বসল। আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে পরিবর্তন উপাসনা করে। শুধু আজ কেন, জীবনের অনেকখানিই তার কেটেছে সেই নির্ভীক দার্শনিক শঙ্করের কথা ভেবে। পরিবর্তনের কণ্ঠ থেকে গম্ভীর নাদে ধ্বনিত হয়—জয় শঙ্কর।··· তারপর শুরু হয় স্তোত্রপাঠ।

···প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং
পূর্ণংসনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্।
যস্মিনিদং জগদশেষমশেষমূর্তৌ
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ॥

ঠিক এমনি সময়ে কলিং বেল বেজে উঠল। একবার, দু'বার, তিনবার। এই অসময়ে কে? স্তব পাঠ করতে করতেই নীচে নেমে গেল। কে এল?

দরজা খুলে দেখল রুক্ষমূর্তি অনুকূল নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। অনুকূলের দিকে তাকিয়ে পরিবর্তন হতবাক হয়েছিল প্রথমে, তারপর সে বললে—এস অনুকূল! এত ভোরে?

অনুকূল কি যেন বলল। পরিবর্তন শুনতে না পেয়ে প্রশ্ন করে—কি বললে? রাত্রে বিশ্রাম পাও নি দেখছি। চলো আমার ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

অনুকূল বলল—না, বিশ্রামের সময় নেই। দিদির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

পরিবর্তনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সে মাথা নেড়ে বলে—এখন? এই ত ঘণ্টা খানেক হবে সে ঘুমিয়েছে। তোমার শরীর ত তেমন ভালো মনে হচ্ছে না বাবা, তোমারও বিশ্রামের প্রয়োজন। এখন আর ওকে ডেকে কাজ নেই। তুমিও জিরিয়ে নাও, কথা পরে কয়ো। ও উঠুক!

অনুকূল হাসল। বিস্ময় নেই, আনন্দের লেশমাত্র নেই সে হাসিতে, একটা অতি পরিচিত উপেক্ষার হাসি। পরিবর্তনের মনে হয় এ যেন রমিতারই হাসি—গভীর রাত্রে হঠাৎ এই ধরনের হাসিই রমিতা হাসে। এ হাসিকে পরিবর্তন বড় ভয় করে। চরম তিক্ততার অভিব্যক্তি এ হাসি। পরিবর্তন

অনুকূলের হাত চেপে ধরে—অমন করে উড়িয়ে দিও না অনুকূল। পৃথিবীতে যতক্ষণ আছো ততক্ষণ তুমি পার্থিব সুখদুঃখের অতীত নও।

অনুকূল হাসি থামাতে পারে না—জ্যাঠামশাই, ভাবছেন বুঝি আমি নেশা করেছি! না, না, ঘাবড়াবেন না অত।

পরিবর্তন সে কথার জবাব দিল না। শুধু তার মনে হয়, এই অনুকূল, রমিতার মত একদল মানুষ দুনিয়ার সবকিছু বুঝি হেসেই উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু ওরা ত জানে না যে এ প্রবাহে তারাই ভেসে চলেছে, পৃথিবীর গতি-পথ কিছুমাত্র পাল্টায় নি!···কিন্তু ইদানীং পরিবর্তনের মনেও একটা সংশয়ের ছায়া পড়েছে, সত্যিই কি পৃথিবীর আপন কক্ষপথে অবিচ্যুত অবস্থায় রয়েছে? তাই যদি থাকবে তবে এরা কোন নিয়মে চলে? এই যাদের নিত্য নিজের চোখের সামনে দেখছে, আর সেই মিহিরলাল যে চলে গেছে দূরে, সে-ও ত এই একই পথের যাত্রী—এরা নিজেদের ভাগ্যকে কোন অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলেছে!

অনুকূল বলল—দিদির সাহায্য না পেলে আমার চলবে না জ্যাঠামশাই।

পরিবর্তন বলে—হুঁ, কি বলছিলে?

অনুকূল আবার হেসে উঠল,—আজ রাত্রে আমার বৌ মারা গেছে, তাই দিদির কাছে একটু দরকার ছিল।

—ও, তোমার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে? তা সান্ত্ব কি করবে! তুমি কি তার কাছে সান্ত্বনা চাও? তার চেয়ে আমাকেই তো শবযাত্রার জন্তে দরকার বেশি—চলো আমি যাবো।—জয় শঙ্কর!

—আজ্ঞে, আমি আপনার এ স্নেহের যোগ্য নই।। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, সৎকার সমিতির গাড়ি আসবে একটু পরেই। তার চেয়ে দয়া করে একবার দিদির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন।

পরিবর্তনের স্নিগ্ধ চেহারাটা সহসা কঠিন হয়ে উঠল। সে বলল—অধিকার থাকে তুমি তাকে ডাকতে পারো, আমি অনুমতি দেবো না। সেও মানুষ—আর, সে অসুস্থ।

পরক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসবার সময় পরিবর্তন শুনতে পেল, অনুকূল হাসছে। তারপর ছাদে কম্বলের আসনে এসে বসলেও সে হাসি যেন ভেসে আসতে লাগল। মন্ত্রের গম্ভীর নাদে সেই অসহ্য অবজ্ঞার উপহাসকে ঢেকে দেবার জন্য পরিবর্তন উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল।

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গং নাহংকারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।

দারঃপত্যক্ষেত্রবিত্তাদিদূরঃ সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মাশিবোঽহম।

আজ আর উপাসনায় মন বসছে না। সে বার বার বর্তমানের দিকে তাকাতে বাধ্য হচ্ছে। সারাদিনের উদাসীনতার প্রেরণা সে সংগ্রহ করে এই প্রভাতকালীন একাগ্রতায়—আজ তা ব্যাহত। অথচ এই সময়ের এই মানসিক স্থিরতাই সারাদিনের অসংখ্য বিসদৃশ ঘটনাকে উপেক্ষা করবার শক্তি দেয়। অনুকূল, রমিতা, মিহির সকলেই যেন তাকে উপহাস করছে। তার মনে হল অনুকূল বুঝি এখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে। পরিবর্তন বসে থাকতে পারল না, আবার নীচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে চারিদিকে দেখলো—একখানা ঘোড়ার গাড়ি, পথে আর কিছু নেই। গাড়িখানার মাথায় মালপত্র বোঝাই। লোহা বাঁধানো চাকার ঘরঘর শব্দ পাক খেয়ে এগিয়ে চলেছে। আর শোনা যাচ্ছে অশ্বত্থপাতায় বাধাপাওয়া হাওয়ার শব্দ। আর কিছু নেই। পরিবর্তনের মনে পড়ে গেল অনুকূলের স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। অনুকূল সাহায্য চেয়েছিল। তাকে বিমুখ করেছে পরিবর্তন।

পরিবর্তন দোতলার ঘরে গিয়ে ডাকল—সান্ত্ব, সান্ত্ব!

রমিতা উঠে বসল। ঘুমের ঘোরে ওর মনে হল যেন, কুমারীবেলার একটি দিন। এখনই শুরু হবে দিনের আবাহনস্তোত্র। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে রমিতার ভুল ভাঙল। না, এটা পার্কিনসন প্রেসের সাজানো ঘর। তবে বাবা কেন তাকে ডাকলেন? এরকম ভাবে তিনি ত ঘুম ভাঙান না। কতদিন পরে কত দূর থেকে একটা পুরাতন আহ্বান যেন ভেসে এল। এক কালে এই ব্রাহ্মমুহূর্তেই সান্ত্বনাকে শয্যা ত্যাগ করতে হ'ত। সত্যি কতদিন পরে আজ এই ভোরের ডাক এসে পৌছলো।

পরিবর্তন বলল—শোন, তোমাকে একবার অনুকূলের বাড়ি যেতে হবে মা।

অনুকূলের নামে রমিতার আরক্ত-ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে যায়। ও প্রশ্ন করে—হঠাৎ এ জরুরী-তলব কেন বাবা?

—তার স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে, তোমার সাহায্য চায়।

—অনুকূলের স্ত্রীবিয়োগ? ও বিয়ে করেছিল? কবে?

রমিতার এ প্রশ্নের জবাব পরিবর্তনের জানা নেই। সে চুপ করে থাকে। এ কথার পরও রমিতাকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখে সে আবার বলল—মা, আমার অন্যায় হয়েছে। অনুকূলকে ফিরিয়ে দিয়েছি—তুই ঘুমোচ্ছিস বলে। এখন কিন্তু মনটা ভালো লাগছে না, তাই মনে করলাম যে, যাই সান্ত্বকে ডেকে বলি। সত্যি বেচারীর বড় বিপদ।

অনুকূলের উপর রমিতার ইদানীং ধারণা ভালো নেই। সেই ছবি বিক্রীর ব্যাপারটা রমিতার কানে এসেছে এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক উড়ো কথায় অনুকূলের প্রতি তার মন বিরূপ। আর সবচেয়ে বড় কারণ অনুকূল যে কিছুদিন থেকে তাকে এড়িয়ে চলছে এটা রমিতা লক্ষ্য করেছে। হঠাৎ বিপদে পড়ে অনুকূল এসেছিল এজন্য একদিক দিয়ে সে খুশি হল, তবে সে খুশিটুকু নিজের কাছে ধরা পড়ে না।

রমিতা বলল,—কিন্তু আমি যে তার ঠিকানা জানি না বাবা। মাস কয়েক আগে বাড়ি বদল করে সে অন্য পাড়ায় চলে গেছে শুনেছিলাম। আর, তার সঙ্গে আমাদের এমন কি ঘনিষ্ঠতা আছে যে—! যাক গে, সে না হয় বুঝলাম যে, মানুষ বিপদে সাহায্য চাইলে সব কিছুই ভুলে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে হয়। কিন্তু এখন তার ঠিকানা পাই কোথা থেকে?

হাল ছেড়ে দিয়ে পরিবর্তন বললে—তবে আর কি হবে? ভাখ দেখি মা, বেচারাকে মিথ্যে ফিরিয়ে দিলাম!

নিশ্চিন্ত মনে পরিবর্তন চলে গেল ছাদের ছোট্ট কুঠরিতে, রমিতার কিন্তু আর ঘুম হল না। রমিতা ভাবতে লাগল নীড়-রচনা-প্রয়াসী মানুষের কথা। একবার নিজের মনের দিকেও জিজ্ঞাসু হয়ে ডুব দিল—বাসা বাঁধার সাধ এখনও মেটে নি?

জবাব এল—না, আর নয়। এখন শুধু ভাঙার পালা।

প্রশ্ন হল—আর কত ভাঙবে? ক্লান্তি আসে নি?

উত্তর পেল—ক্লান্তি ত আসবেই, কিন্তু থামলে চলবে না। মুখ থুবড়ে যখন পড়ে যাবে তখনই বিশ্রাম। ব্রত ভুললে, কি নিয়ে বাঁচবে?

আবার জিজ্ঞাসা—কিন্তু এ সর্বনাশা ব্রতের ফল কি?

এবার সমগ্র অন্তর প্রশ্নকে যেন রক্ত-দৃষ্টিতে উড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়—মৃত্যু! মৃত্যুর চেয়ে বড় কিছু নেই। আমার জীবনের সর্বনাশ দিয়ে বর্তমানকে ধ্বংস করব। যারা সে সর্বনাশ থেকে বাঁচবে, তারা নতুন করে আবার পৃথিবীকে গড়বে।

—তার মানে ঐ নয় যে ভুলের বোঝা বাড়াতে হবে। ভুলটা বোঝবার চেষ্টা করা চাই। ভুলচুক চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো এক জিনিস আর ভুলের ফাঁদে নিজেকে টেনে আনা আলাদা কথা। এসব বাদ দিয়েও মানুষের পরিচয় আছে, আরো অনেক বড় পরিচয়।

—সে পরিচয় যদি থাকে তবে তাই নিয়েই মানুষ বাঁচবে। যারা মানুষের মুখোশ এঁটে ঘুরে বেড়ায় তাদের নিয়ে আমার কারবার—মুখোশ খুলে আসল রূপটা দেখিয়ে দিই।

রমিতা আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তার মনের এ প্রশ্ন যেন ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকারেরও প্রশ্ন। চোখের সামনে প্রভঞ্জনের গম্ভীর বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারাটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রমিতার মনে হয় তার মনের গভীরে যে সত্য লুকানো রয়েছে প্রভঞ্জন সেটা ধরে ফেলবে।

ছাদের উপর পরিবর্তনের উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রপাঠের প্রতিধ্বনি সমগ্র পরিবেশকে ব্যাপ্ত করেছে। কতকাল আগে রমিতা শুনত ওর বাবার কাছে প্রত্যেকটি স্তোত্র আর সমস্ত সত্তা দিয়ে তার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করত। তার বাবা ত এখনও সেই সব নিয়েই দিন কাটান, অথচ কত দিন পরে আজ রমিতা শুনছে সে স্তোত্র। রমিতা বেশ বুঝতে পারে তার বাবা এখন ত্রিপুষ্কর স্তোত্র পাঠ করছেন। রমিতা সেই ধ্বনিতে আবিষ্ট হয়ে পড়ল। প্রাক্তনের একটি মুহূর্ত ওর মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়, বাবার মুখে শোনা একটি গল্পের ছবি এই স্তোত্রমন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। সত্যাচার্য চলেছেন কাশীধামে মোক্ষলাভের আশায়।

তাঁর মন সেই ভাবের বিভোর। পথের মাঝখানে এক চণ্ডাল আর চণ্ডালকাকে দেখে ওঁর মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থী, এ সময়ে মধ্যপথে এই ছুটি অপবিত্র মানুষকে দেখে বিরক্ত ভাবে বললেন—"পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও না বাপু!" চণ্ডাল স্মিতহাস্যে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—"কেন গো মশাই! আমাদের সরতেই বা হবে কেন? তুমি কে?" সত্যাচার্য যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি ছদ্মবেশী দেবাদিদেব মহাদেব, চণ্ডালের ছদ্মবেশে এসেছেন ভক্তের পরীক্ষা নিতে, আর সঙ্গের ওই চণ্ডালিকা হচ্ছেন স্বয়ং মহাদেবী পার্বতী! মহাদেব সত্যাচার্যকে বললেন—"তুমি কি রকম জ্ঞানী মহাযোগী! চৈতন্য থেকে চৈতন্যকে আলাদা করে স্থাখো কি করে? যে চাঁদের প্রতিবিম্ব গঙ্গাজলে পড়ে, সেই চাঁদেরই প্রতিবিম্ব ত চণ্ডালের বাড়ির পাশের পুকুরেও পড়ে—এই দুই প্রতিবিম্বের মূল ত একই চাঁদ, তফাৎ কিছু আছে কি? সোনার কলস, আর মাটির কলসে প্রয়োজন-সাধক হিসাবে তফাৎ আছে কি? তুমি যাচ্ছ ভগবানকে দেখ্‌তে, অথচ এই বিভেদটুকু তোমার মন থেকে দূর হয় নি! এখনও ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে চৈতন্যের পৃথক রূপ দেখছ, এ কেমন কথা?"

অনেক দিন আগে এইরকম কত গল্প কত কথাই পরিবর্তনের কাছে রমিতা শুনেছে। কিন্তু আজ পিতা আর কন্যা দু'জনে পৃথক রাজ্যের মানুষ! তবুও সেই পুরাতনের প্রভাব রমিতার মনে বোধ হয় কিছুটা থেকেই গেছে। ত্রিপুরসুন্দরস্তোত্র শুনতে শুনতে রমিতা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরে অপর কেন্দ্রে ওর মন ফিরে আসে। বিগত রাত্রির ক্লান্তি এবং দ্বন্দ্ব ওর দুর্বল চোখে ঘুমের আমেজ আনে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অনুকূলের কথা মনে পড়ে। অনুকূল ত সেই পুরুষ-সমাজেরই একজন—তাকে পূজার ছলনা করেছে। রমিতা শতবার চেষ্টা করেও অনুকূলকে ষোল আনা অবিশ্বাস করতে পারে নি, সুযোগই দিয়েছে নানাভাবে। অনুকূল রমিতাকে ঠকিয়েছে। কিন্তু কেন যে এই বিশ্বাসঘাতক অনুকূলকে রমিতা একেবারে নির্মমভাবে তাড়িয়ে দিতে পারে নি তা রমিতা বুঝতে পারে না। তবে কি আজ নিয়তিরই নির্দেশে অনুকূলকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হল রমিতার দরজা হতে? একবার রমিতা খুশি হয়—ভালোই হয়েছে। আবার মনে হয় বড় অসহায় অবস্থায়

অনুকূল এসেছিল। এ রকম বিপদে মানুষ যার কাছে আসে তার উপর অনেকখানি ভরসা রাখে বলেই ত আসতে পারে। বিবাহের কথা অনুকূল গোপন রেখেছিল কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু ত গোপন করতে চায় নি। ···ভাবতে ভাবতে রমিতা ঘুমিয়ে পড়ল—ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে যে মাদকতা আছে সে মাদকতা যেন জাগ্রত রাত্রির সমস্ত অবসাদ দিয়ে গড়া।

অতঃপরে প্রচণ্ড বর্ষা নামল—তিন দিন ধরে আকাশ অন্ধকার, বৃষ্টি আর বাদলা। কলকাতার পথেঘাটে জল থৈ থৈ।

যার মুখর চঞ্চলতায় সরকারবাড়ির নিঝুম আবহাওয়াতে প্রাণসঞ্চার হয়েছিল সেই নীলিমার জ্বর হল। প্রভঞ্জনেরও গা-হাত-পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা আর জ্বর। জ্বর নিয়েই প্রথম দিন সে ডাক্তারখানায় গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে সে বাড়িতে আবদ্ধ। একটানা জ্বর চলছে।

নীলিমা বিছানায় শুয়ে থাকতে চায় না। তার টান রান্নাঘরের দিকে। সে কেবলই মায়ের কাছে এসে দরবার করে, 'মামার ত খুব অসুখ করেছে মা, তা মামা কেন অত খায়।' এই প্রসঙ্গের পর অবশ্য ওর নিজের প্রতি যে অত্যাচার করা হচ্ছে সেটা নিঃসঙ্কোচে জানায়—'আর আমার বেলায় এতটুকু, এইটুকু—এঁ্যা!'

নীলিমা কখনও বা শাসন করে খোদ অপরাধীকে—মামাবাবু তুমি এ রকম বসে আছো কেন, বিছানায় শুয়ে থাকো গিয়ে। আর আমার সঙ্গে নূন্ বাল্লি খাবে।

প্রভঞ্জন হাসতে হাসতে বলে—অমন করে বকছো কেন লিলিমা, আমার বুঝি ভয় করে না!

নীলিমা খিল খিল করে হাসে—ইস তুমি ত কত বড়, ভয় করবে কেন? আচ্ছা মামাবাবু, অসুখ করে কেন! অসুখটা ভারী দুষ্টু না!

প্রভঞ্জন চোখ দুটো নীলিমার মত অনুকরণ করে বলে—অসুখ আর কোথায় যাবে বলো! ওর যে কেউ নেই!

—মা,—বাবা,—দিদিভাই—কেউ নেই ওর?

—না।

—ও তাই সবার বাড়ি ঘুরে বেড়ায় বুঝি, নয় মামাবাবু?

—হ্যাঁ। বেচারীকে কেউ দেখতে পারে না, পেট ভরে খেতে দেয় না। শুধুই কষ্ট দেয়!

নীলিমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না, দুঃখও হয় বেচারী অসুখের কষ্ট দেখে। কিন্তু অসুখ যদি একটু ভালো ছেলে হত তাহলে ত সবাই ভালোবাসত তাকে। তা-নয় অসুখ এলেই জ্বর হবে, শরীর কেমন কেমন করবে! লোকেই বা তাকে আদর করবে কেন! নীলিমা আর একবার নীলাম্বরের দিকে রওনা হবার চেষ্টা করতেই প্রভঞ্জন বলল—এখন যেও না লিলি! খাটের ওপর উঠে বসো। সন্ধ্যে বেলা বার্লি খাবে আমার সঙ্গে।

নীলিমা বলে—আবার সন্ধ্যে কখন হবে—এই ত সূর্যি আসে নি আজকে। পরক্ষণে প্রশ্ন করে বসল—সূর্যি কেন এলো না, বলো তো মামা?

—বিষ্টিতে ভিজে গেলে কি হবে? সেইজন্যে সূর্যি আসে নি।

এই ধরনের নানা গুরুতর সমস্যা নিয়ে প্রভঞ্জন এবং নীলিমা রীতিমত গম্ভীর ভাবে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। আস্তে আস্তে কখন যে অন্ধকার দিনটুকু পেরিয়ে চুপি চুপি সন্ধ্যা হয়েছে জানতে পারে নি। নীচে একখানা মোটর থামার শব্দও শুনতে পাওয়া গেল। কে এই বর্ষায় বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে? কোনো রোগীর বাড়ির লোক হওয়াই সম্ভব। শেষ পর্যন্ত গাড়ি যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি না করে। এই জ্বর নিয়ে তুমুল বৃষ্টি মাথায় করে বেরুনো মানেই অসুখটা বাড়ানো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এইভাবে বেকার বোকা সেজে বাড়িতে আবদ্ধ থেকে এই দুদিনেই প্রভঞ্জন হাঁপিয়ে উঠেছে। যদি তেমন কেউ এসে পড়ে ত গল্প করা যাবে এই আশা। কথা কইবার মত একটি প্রাণী নেই বাড়িতে। বই পড়তে কষ্ট হয়—অসহ্য মাথার যন্ত্রণা এবং তার ওপর মায়ের নীরব শাসন!

নীলাম্বরের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ঘরে ঢুকল রমিতা।

ঘরের দরজায় রমিতাকে পৌঁছে দিয়ে নীলাম্বর সরে পড়ল। পালাতে পেয়ে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। এত সুন্দর আর উঁচু উঁচু ধরনের কোনো

মেয়ে নীলাম্বর দেখে নি কখনও। দরজা খুলেই সামনে রমিতাকে দেখে নীলাম্বর অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর রমিতা যখন তার হাত ধরে নাম জিজ্ঞাসা করল তখন নীলাম্বর মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠেছিল—শচীনের কাছে সে জোর গলায় গল্প করতে পারবে। রমিতা বলেছিল,—ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করব, একটু খবর দেবে খোকা!

নীলাম্বর মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছে—আমায় খোকা বলছেন কেন, আমি নীলাম্বর। মামাবাবুর কাছে নিয়ে যাচ্ছি চলুন না।

তারপর রমিতার সঙ্গে যেতে যেতে নীলাম্বরের মনে হয় একবার দিদি-ভাইকে খবর দেওয়া দরকার, মা-মণিকে না ডাকলেও নয়! অতএব রমিতাকে মামার ঘর পর্যন্ত হাজির করে দিয়েই নীলাম্বরের অদৃশ্য হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

প্রভঞ্জন খুব আশ্চর্য হয় নি রমিতাকে দেখে। পৃথিবীর কোনো ঘটনাতেই আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু খুঁজে পায় না সে।

রমিতাকে দেখে সে বলল—আসুন মিস্ মজুমদার। এই বৃষ্টি মাথায় করে কি খবর? শরীর ভাল ত?

রমিতা হেসে জবাব দেয়—আজ আমি রোগী দেখতে এসেছি। আপনার খবর আগে বলুন। আমাকে দর্শক মনে করুন—গ্রাহক নই।

—অর্থাৎ আপনার নিজের সম্বন্ধে কোনো রকম কিছু বলবার নেই?

—সত্যিই তাই। আপনার খবর তিন দিন ধ'রে পাচ্ছি না। অনেক বার ফোন করেছি। আপনার কম্পাউণ্ডার আজ সবে জানালেন যে, আপনার অসুখ, ভাবলাম সোজাসুজি চলেই যাই।

—তা ভালোই করেছেন। বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি।

—তার চেয়ে বলুন, রোগীদের ধমক না দিতে পেরে আরও বেশি অস্বস্তি হচ্ছে। মাস্টার আর ডাক্তারদের এই বকুনী দেওয়া রোগটি সারাবার কোনো ব্যবস্থা নেই কেন তাই ভাবি!

বলে রমিতা উচ্ছল হাসিতে ঘরখানা ভরিয়ে দিল।

নীলিমা মামার অমনোযোগের সুযোগে নিঃশব্দে রান্নাঘরের উদ্দেশে রওনা হল।

প্রভঞ্জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রমিতা ব্যস্ত হয়ে বলল—অসুস্থ মানুষ এভাবে ঠাণ্ডা মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকলে যে অসুখ বাড়বে, বসুন আপনি!

প্রভঞ্জন এতক্ষণে সজাগ হয়ে অপ্রতিভভাবে বলে উঠল—দেখুন ত, আপনাকে বসতে বল্‌ব, তা ভুলে গেছি। বসুন! মাকে খবর দিয়ে আসি।

রমিতা নিশ্চিন্তভাবে বলে—আপনার ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তিনি খবর পাবেন ঠিক, আমিও তো খবরটা দিতে পারি।

—আচ্ছা!

রমিতা একখানা চেয়ার থেকে বইপত্র তুলে টেবলের ওপর রাখলে এবং সেই চেয়ারেই বসল।

রমিতা বলল—তারপর, রোজার ঘাড়ে ভূত চাপল কি করে?

—ও কিছু নয়, mild ইনফ্লুয়েঞ্জা।

—তবু ভালো। জ্বর এখন কত?

—আছে—একটু!

—তার মানে? কত?

—অল্পই হবে!

—থার্মোমিটার দেন নি বুঝি!

—না।

—খুব অন্যায়। এইসব ভুল কেন যে করেন আপনারা, বুঝি না!

—বাড়িতে ত থার্মোমিটার নেই। চেম্বারেরটাই আনাতে হবে দেখছি! তারপর, পরমেশের খবর কিছু জানেন?

—ইদানীং সে নাকি পড়াশুনো করছে। তাকে বলে দিয়েছি পাশ না করলে ভদ্রসমাজে যেন মুখ না দেখায়। সেই থেকে আর বেরোয় না।

প্রভঞ্জন হেসে উঠল—ওর পাশ করার দরকার নেই। পুঁথিগত খুঁটিনাটি ছাড়া আর সব দিক দিয়ে ও চিকিৎসক।

সে কথা বলতে পারি নে, তবে ওর মত খাঁটি মানুষ দেখা যায় না। ও অনেকদিনের বন্ধু। কখনো কখনো বাবাও আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু পরমেশ বরাবর ঠিক এক রকম। মানুষকে ও মানুষ ব'লে মেনে নিয়েছে ব'লেই হয়ত অনায়াসে আমার দোষ-গুণ বিচার করবার জন্যে অঙ্কের খাতা খুলতে চায় না।

—তাই নাকি? আমি কিন্তু অন্যরকম ভাবতাম।

—আমি যতটুকু জানি, তাতে অন্য কিছু ধারণা করা যায় না।

দু'জনেই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে পড়ে। প্রভঞ্জন মনে মনে অন্য কথা ভাবে। ওর মনে হয় রমিতার মানসিক বিকার এবং তৎসম্পর্কিত চিকিৎসার কথা। সত্যি যদি রমিতাকে বর্তমান ভুল ধারনার হাত থেকে মুক্ত করতে পারা যায় তবে ও একটি অসাধারণ মহিলায় রূপান্তরিত হবে তার এ বিশ্বাস হয়েছে।

রমিতা আবার আলাপ শুরু করল—আপনি যেন কেমন হয়ে গেলেন আমাকে দেখে।

—খুশি হয়েছি। সত্যি, কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে দিন যায় টের পাই না; কিন্তু এই জ্বর হয়ে যেন অবকাশ কিছুতেই ফুরোতে চায় না। তার ওপর বর্ষা—কলকাতায় বর্ষার আনন্দ নেই। হ্যাঁ হতো যদি এমন জায়গা যেখানে অসীম মুক্তিতে দৃষ্টি ছাড়া পেতো।···আপনি এসেছেন এ খুব ভালো হয়েছে। আমারও অবসর, কিছু আলোচনা করা যাবে।

রমিতার মুখে-চোখে চিন্তা নামল হঠাৎ। এতক্ষণ যে সাবলীল অকুণ্ঠতা তাকে ঘিরে ছিল সেটা কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে এক নিমেষে। ও বলল—আপনি যে অসুস্থ!

—তার জন্যে অসুবিধে কি! তবে হ্যাঁ আপনাকে একটু খাতির-যত্ন করা যাক আগে।

—কিন্তু রোগী দেখতে এসে যে খাওয়ার রীতি নেই! আচ্ছা ডাক্তার বাবু, সব সময় মানুষকে অত দূরে দূরে রাখতে চান কেন?

—কথাটা একেবারে ভুল। আপনার কথা ত প্রায়ই ভাবতে হয়। এই যে আজও পর্যন্ত আমার কথামত চলছেন না, এ খবর রাখি।

—কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছি ত! আমি বিশ্বাস করি জীবনটা যা ঘটছে তা-ই নিয়ে, যা ঘটা উচিত ছিল সেটা নয়। Life does not deserve to be worried over.

—না হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, জীবন-সমস্যাকে।

—এককালে আমারও ধারণা ছিল। কিন্তু এখন অন্য পথ ধরেও বেশ চলতে পারছি। এ পথে পরের দাসত্ব নেই।

—আপনার এ পথ বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না। একদিন দেখবেন পথ ফুরিয়ে গেছে। তখন পিছনে ফেরবার সময়ও থাকবে না। বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

—শান্তি বা সান্ত্বনা চাই নে, তার আগে নিজেকে মুছে দেবার মত মনের জোর আছে।

—এটা ত মুখের কথা। জানি অপরিসীম পীড়ন আপনাকে মনে মনে একলা সহ্য করতে হয়, তারই প্রতিক্রিয়া আপনার সব কাজের মূলে।

—সে যদি বলেন, তবে আমারও একটা প্রশ্ন করবার আছে।

—হ্যাঁ করুন না। অসঙ্কোচেই করুন।

—আচ্ছা, আপনি অপরকে বাসা বাঁধবার জন্য বার বার নির্দেশ দিচ্ছেন কিন্তু নিজের জীবনে সেটা নেই কেন আপনার?

—আমার কথা আলাদা। আমি ক্ষুধার্ত নই।

—বিশ্বাস করতে পারছি না।

প্রভঞ্জন একটা চুরুট ধরিয়ে বার কয়েক টান দিযে বলে—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, জবাবে কিছু ভুল আছে। আমার মত মানুষের পারিবারিক জীবন মেনে নেওয়া অসম্ভব।

—তাই বলে আপনি একেবারে স্বাভাবিক নিয়মকে অস্বীকার করবেন? আপনি কি বলতে চান যে—

—না আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমার জীবনে যে রঙীন স্বপ্ন এসেছিল সেটা স্বপ্ন-রাজ্যেই ফিরে গেছে।

—কিন্তু স্বপ্ন ষোলো আনা সত্য নয়। আমার মনে হয় আপনি আকাশ-কুসুমের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন।

—আপনার কথায় মনে হচ্ছে, কিছু কিছু খবর আপনার জানা হয়ে গেছে।

—তা বলতে পারি না, তবে এটুকু বুঝেছি যে, আপনিও একটা সমস্যা।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ অন্যের জীবনে যেটা জুড়ে দিতে চান সেটা নিজের ক্ষেত্রে এড়িয়ে যেতে চান।

—আমার পেশার দিক দিয়ে বর্তমান জীবনধারাই উন্নতির পথে সহায়তা করে।

—আমি যদি বলি, এটা আপনার ভুল।

—মোটেই তা নয়। এক দিকের অতৃপ্ত শক্তি অন্য কাজে বলিষ্ঠ প্রেরণা দেয়।

—তবে আমাকেই বা আপনি রূপান্তরিত করতে চান কেন ?

—আপনার কল্যাণী শক্তির অপব্যবহার করছেন যে! আপনি ধরেছেন ভাঙনের কাজ। আর তাতে সহায়তা করছে আপনার অতৃপ্ত বাসনা। এমন যদি হতো যে আপনি কোনোদিনই সাংসারিক জীবন চান নি, ত কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু আপনি একজনকে আশ্রয় করে বাসা বাঁধবার আয়োজন করেছিলেন, তাতে ব্যর্থ আপনি। এ তো আপনার বৈরাগ্য নয়। একে বিতৃষ্ণাও কেউ বলবে না! সেই ব্যর্থ মনোরথে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে জনতার দিকে রথ হাঁকিয়ে দিয়েছেন আপনি। আপনার বাসনার বিকৃত প্রকাশ। আমার ক্ষেত্রে সে কথাটা খাটে না। তাই বলছি, আমি ত আমার সাধ্যমত চিকিৎসা করছি এবং করব। আপনি খেলা-খেলার পালা চুকিয়ে দিয়ে ঘরের জীবনে ফিরুন। আমার সমস্যাকে আপনার সমধর্মী মনে করলে ভুল হবে মিস্ মজুমদার।

একথার জবাব দিল না রমিতা। আস্তে আস্তে খোলা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো বাইরের দিকে মুখ করে।

প্রভঞ্জনের মনে হল, রমিতা তার কথায় রীতিমত আঘাত পেয়েছে। কিন্তু রমিতাকে আঘাত দেওয়া উদ্দেশ্যে ছিল না তাই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সে।

এ অবস্থায় কি বলবে বা কি করা সঙ্গত বুঝে উঠ্‌তে পারল না প্রভঞ্জন। সে ব্যস্ত, কুণ্ঠিত ভাবে বলল—কথাটা অত Seriously নেবেন না রমিতা দেবী! খোলাখুলি আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। যদি আপত্তিকর কিছু থাকে তাহলে বলুন।

রমিতা প্রভঞ্জনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। তারপর কতকটা সহজ ভাবেই বলল—না, আপনার কথায় বিচলিত হবার কি আছে ডাক্তার বাবু। ফেরবার কোনো রাস্তাই খোলা নেই। জানেন ত আপনি। যে সমাজকে ছেঁড়া কাঁথার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, আজ আবার তার দ্বারস্থ হওয়া, অসম্ভব। তা ছাড়া, মিহির ত ফিরে আসে নি! আমার লুকোনো মনের চেহারাটা আপনি দেখে ফেলেছেন। আমি নিজের কাছেও আত্ম-গোপন করে থাকি। ভয় করে নিজের কথা ভাবতে, জানেন ডাক্তার বাবু!···

বলতে বলতে মাঝ পথেই রমিতা থেমে গেল। খোলা দরজায় কার ছায়া পড়ল। পরক্ষণে পার্বতী ঘরে ঢুকল। রমিতাকে দেখে কতকটা অপ্রতিভ ভাবে পার্বতী ফিরে যাচ্ছিল।

প্রভঞ্জন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বলল—কে, পারু! আয় আলাপ করিয়ে দিই রমিতা দেবীর সঙ্গে।

পার্বতী ন-যযৌ ন-তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেমন, তেমনই রইল।

প্রভঞ্জন বললে—ইনি হচ্ছেন রমিতা মজুমদার, নামকরা অভিনেত্রী, বুঝেছিস্। আর এ আমার বোন পার্বতী!

সসম্ভ্রমে রমিতা নমস্কার করে বলল—ও আপনিই নীলাম্বরের মা! ওইটুকু ছেলে আপনার খুব চটপটে। নীলাম্বর কোথায় গেল!

পার্বতী বলল—সে রান্না ঘরে গিয়ে বসে আছে। দাদা, বালিশ দিই!

প্রভঞ্জন বলল—আরে লিলি গেল কোথায়? এইত এক মিনিট আগেও ছিল যে! আপনি বুঝি নীলিমাকে দেখেন নি! পারু তুই একবার লিলিকে ডেকে দিস ত।

পার্বতী বলল—হ্যাঁ এই দিই! তার আগে এঁকে একটু—।

রমিতা তাড়াতাড়ি বলল—চলুন না যাই, মাকে প্রণাম করে আসি।

পার্বতী বিরস কণ্ঠে জবাব দিল—মা ঠাকুর ঘরে। আপনি বরং দাদার সঙ্গেই গল্প করুন। মা এখানে আসবেন।

পার্বতী আর দাঁড়াল না।

পরক্ষণেই প্রভঞ্জনের মনে হল কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটে গেছে।

রমিতা পূর্বকথার জের টেনে আনে,—যত সহজে আমাকে ফেরবার কথা বলছেন, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আর সত্যি কথা, কার জন্যে আমি এই অকরুণ সমাজের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করব? কি আশায়! বলতে পারেন?

প্রভঞ্জন কোনো জবাব দিল না। অস্বস্তিকর মৌনতায় রমিতা হাঁপিয়ে ওঠে। তাই জিজ্ঞাসা করে—শুনলাম আমেরিকা যাচ্ছেন।

—না, প্রথমে লণ্ডন তারপর—কি হয় বলা যায় না। দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, মন তত পিছিয়ে যাচ্ছে।

—কেন? এ সুযোগ, এ সৌভাগ্য ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! আর আপনি ত যাচ্ছেন ভারতের প্রতিনিধি হয়ে!

—সবই বুঝি, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে, যাওয়া আসার ফল ত আমার দেশবাসীকে দিতে পারব না। তবে হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে লাভ আছে। ফিজ্ বেড়ে যাবে—হয়ত এমন ফি হবে আমার যে, খুব কম লোকেই ডাকতে পারবে। পয়সাওয়ালা লোকের কিছু সুবিধে হবে—নতুন কিছু শিখে এলে ত তারাই ভাগ পাবে।

—বরং ফি কমিয়ে দেবেন! যাতে সবাই আসতে পারে। ডাক্তারের ফি আমাদের দেশে যেমন, তেমন আর কোথাও নেই।

—দেখুন, যদি বিনামূল্যেও চিকিৎসা শুরু করি তবু খুব উপকার হবে না দেশের লোকের। আমাদের সাধারণ মানুষ পেট ভরে ক'জন খেতে পায়! আদ্ধেক রোগ আসে পুষ্টির অভাব থেকে। আমার মত দু'পাঁচ জন লোক একগাদা টাকা খরচ করে বাইরে ঘুরে এলেই কি, আর না এলেই কি! তবে আমার নিজের শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক সুবিধে হবে তা সত্যি।

রমিতা এসব শুনতে উৎসুক নয়, ও প্রশ্ন করে—তা আপনি ইংলণ্ডে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন ত?

প্রভঞ্জন উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসতে লাগল।

তার হাসির প্রবাহে রমিতা কেমন যেন হয়ে গেল—বা রে, অমন হাসছেন যে!

—অনন্ত কৌতূহল দিয়ে ভগবান গড়েছেন আপনাদের মন।

চমৎকারিণী দরজার বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—কে এসেছে রে প্রভু!

রমিতা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে হাত তুলে নমস্কার করে বলে—আপনার কাছে যাচ্ছিলাম, তা শুনলাম ঠাকুর ঘরে রয়েছেন।

চমৎকারিণী বললেন—আর বলো না মা, ঠাকুর দেবতা মাথায় উঠেছে, নাতি-নাত্‌নীরা ত আমায় খেয়ে ফেলল—ও দিদিভাই একবার দেখে যাও কেমন সরস্বতী ঠাকুরুন এসেছেন। তা ঠিকই বলেছে দেখছি, সত্যিই সরস্বতী ঠাকুরুনই বটে মা! তা মা তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে, রমিতা মজুমদার।

—আজকাল সব কতরকমের নামই হয়েছে। তা তোমার চচ্ছে রমিতা, তা বেশ।

আরও একটি প্রশ্ন তাঁর মনে স্বভাবতই উদয় হয়েছিল, পাছে মেয়েটি সেকথার অন্য অর্থ করে, অথবা প্রভঞ্জন ক্ষুণ্ণ হয় এইজন্য সেটা আর মুখে উচ্চারণ করলেন না, শুধু বললেন—তা হ্যাঁ মা, কার সঙ্গে এলে?

এ প্রশ্নের তাৎপর্য গ্রহণ করতে না পেরে রমিতা সরল ভাবেই জবাব দিল—কারুর সঙ্গে আসি নি। ক'দিন ডাক্তার বাবু যান নি, খোঁজ নিয়ে শুনলাম অসুখ করেছে, তাই দেখতে এসেছি।

—তা বেশ। কিন্তু আজকালকার দিনে সন্ধ্যে বেলা এমন একলা চলাফেরা করা খুব নিরাপদ ত নয় মা, তাই বলছিলাম। আর বলতে কি তোমার মত মেয়ের এরকম ভাবে না বেরুনোই ভালো। ছোট ভাইটাই কাউকে সঙ্গে নিলেই পারো।

পার্বতী জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে এল, এক থালা ফল এবং মিষ্টান্ন।

চমৎকারিণী বললেন—আমি বাপু সেকেলে মানুষ, এ সব কথা বলছি, কিছু মনে ক'র না। নাও একটু মিষ্টিমুখ করো, ভালো হয়ে বেঁচে থাকো মা। রাজরাণী হও। আচ্ছা আমি এখন চলি মা রমিতা! আবার এসো একদিন দুপুরের দিক করে।

রমিতা আর কোনো কথা বলবার আগেই তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে গেলেন।

পার্বতী টেবিলের ওপর থালা রেখে বলল—আসুন ভাই, বসুন। দাদা তুমি ওঁকে খাওয়াও, আমি বার্লিটা নিয়ে আসি।

পার্বতী চলে গেল। প্রভঞ্জনের দিকে চেয়ে রমিতা বলল—লৌকিকতার মধ্যে পড়ে গেলাম। এলাম রোগী দেখতে, আপনার সঙ্গে দু'চার মিনিট গল্প করে যাবো—তা নয় সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাধ-বাধ ঠেকে।

প্রভঞ্জন গম্ভীরভাবেই উত্তর দেয়—কি করবেন বলুন! প্রথম এবাড়িতে এলেন। আমার কোন হাত নেই। আপনিও লৌকিক সৌজন্য দেখাতে কসুর করেন না। তার তুলনায় এ কিছুই না।

রমিতা বলল—মাঝখান থেকে আমার বাড়ির খাবার নষ্ট হল। তা হোক আমার লোকসান দিয়ে আপনার মান বাঁচানো উচিত।

পার্বতী বার্লির গ্লাস নিয়ে দাদার হাতের কাছে ধরল, প্রভঞ্জন বললে—রাখ, একটু পরে খাবো। জুড়োতে সময় লাগে ত!

—না, না, উনি থাকতে থাকতে খেয়ে নিতে হবে। বেশ ঠাণ্ডা করেই আনা হয়েছে। আজও বার্লি খেতে তোমার জ্বর আসে দাদা, আর রোগীদের ত রোজ ও ছাড়া বেশি কিছু বরাদ্দ কর না!

রমিতা হাসতে হাসতে বলল—ভাই, ডাক্তারদের বেলায় রোগীর নিয়ম খাটানো ভারী কঠিন। আমার এক কাকা ছিলেন এমনি বড় ডাক্তার, তিনি বার্লি খেতেন বরফে ঠাণ্ডা করে সিরাপ আর সেণ্ট দিয়ে।

সবাই সকলরবে হেসে উঠল।

রমিতা সেই হাসির জের টেনেই বলল—তা দাদাকে এমন ভীষ্ম করে রেখে দিয়েছেন কেন, ভাই ?

পার্বতী গম্ভীর হয়ে গেল—আমরা ভাই নিজের নিজের নিয়েই বিভোর, কিন্তু দাদার হিতৈষীও ত কম নেই, তাঁরা ত ইচ্ছে করলে দাদাকে সংসারী করে দিতে পারেন !

রমিতা একটু হতচকিত হয়ে যায়। সামলে নিয়ে জবাব দিল—মনে করুন সবাই মিলে ঘটকালী করে দাদাকে আপনার জব্দ করা যায় যদি।

পার্বতী একটু নরম হয়ে বলল—আপনার দলে আছি। আসুন—

প্রভঞ্জন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে বলল—কুমারটুলি গিয়ে ফরমাস দিয়ে দিন মিস্ মজুমদার।

রমিতা বলল—না, না কুমারটুলির দিন গিয়েছে এখন কুমারীটোলায় যেতে হবে। আপনার ওসব চালকী চলবে না। অবস্থাপন্ন বয়স্ক মানুষের অবিবাহিত থাকা অপরাধ।

প্রভঞ্জন জবাব দিল—বেশ ত আপনি সেই সব লোকদের বিচারের ব্যবস্থা আগে করুন !

—কাদের কথা বলছেন ?

—যারা নিজের পেটের ভাত জোটাতে পারে না অথচ বিয়ে করে। এবং খাদ্যসমস্যাকে জটিলতর করে তুলছে সংসারে জীববৃদ্ধি ক'রে।

—স্বভাবধর্মকে মানুষ অস্বীকার করতে পারে না।

—কিন্তু সেই স্বভাবধর্মের নিয়মে যে অবাঞ্ছিত মানুষকে পৃথিবীর বুকে এনে ফেলছে ?

—সেও ত অনস্বীকার্য ! তবে হ্যাঁ, জন্মশাসন হওয়া ব্যাপকভাবে দরকার।

—তবে আমিই বা কি এত অপরাধ করেছি ? আমি যদি এইসব শাসন অনুশাসনের বাইরে থাকি তবে দোষ কি ?

পার্বতী ওদের দু'জনের আলোচনায় যোগ দিতে পারে না। ওরা সব কথাই গুছিয়ে আর কায়দা ক'রে বলছে। পার্বতীর ওরকম গুছোনো কথা বলবার শক্তি নেই। কাজেই ও চুপ ক'রে রইল।

রমিতা বলল—আপনি স্বার্থপর।

প্রভঞ্জন বলে—খাতির করে স্বার্থপর বলছেন কেন?—আমি আরও সহজ, স্বার্থসর্বস্ব! কিন্তু অন্ধ নই, আমি আত্মসচেতনও বটে।

একটু অপ্রতিভ হয়ে রমিতা কথা হাতড়ায়। তারপর হাসি টেনে এনে বলে—রাগ করলেন ত! আচ্ছা আজ আর চটাবো না, এবারে চলি। নমস্কার।

প্রভঞ্জন উঠে বলল—আমার ত রাগ করবার কথা নয়। আপনিই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন। আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। রাত হচ্ছে, ওদিকে মা খুব ব্যস্ত হচ্ছেন। সকলের জন্যে।

পার্বতী বলল—তুমি আর বাদলা লাগিয়ো না দাদা, ওঁকে আমি এগিয়ে দিচ্ছি।

প্রভঞ্জন অধিকতর কর্তৃত্ব সহকারে বলল—তোর আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! ওপর থেকে নীচে নামলে ঠাণ্ডা লাগবে!

কোনো কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিল পার্বতী, রমিতা তার হাত ধরে বলল—আজ তবে আসি ভাই। দাদার সঙ্গে আসুন না আমার ওখানে।

পার্বতী আর দাঁড়াল না, বলল—নমস্কার।

রমিতা যন্ত্রচালিতের মত প্রতিনমস্কার ক'রে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে রমিতা বলল—একটু সুস্থ হলে বাড়ি থেকে বেরুবেন।

প্রভঞ্জন বললে—আমাদের দেশে ভালো নার্সের বড় অভাব। আপনার মত ঠাণ্ডা ধরনের মেয়ে যদি নার্স হয় তবে রোগীরাও খুশি মনে থাকে। তারা শুধু ওষুধ আর পথ্যি খেয়েই খুশি থাকতে পারে না, মনের খোরাকও চায় মানুষ।

রাস্তার কোণে একটা আলো জ্বলছে অনেক উঁচুতে। তার পরিমিত আলোয় বৃষ্টির অগণিত সরু ধারা অসংখ্য সুতো দিয়ে যেন জাল বুনছে অন্ধকারের বুকে। জনহীন পথ। রমিতার গাড়িখানা নিঝুম হয়ে এক পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে মনে হয়।

প্রভঞ্জনের কথায় রমিতা একটু হাসল।

সচেতন হয়ে প্রভঞ্জন শুধরে নিতে চেষ্টা করে, বলে—অবিশ্যি আমার এটা অসুখই বলা চলে না। হ'ল কি, হঠাৎ মনের মধ্যে আমাদের হাসপাতালের ছবি ভেসে উঠল কিনা, তাই। কত শক্ত শক্ত অসুখে ত কত রোগী পড়ে থাকে, আমাদের চোখের সামনে নার্সরা খুব কাজ দেখায় বটে, আড়ালে ব'সে আড্ডা দেয় তাও জানি! তা ছাড়া তাদের ব্যবহারের মধ্যে কেমন একটা যান্ত্রিক ভাব দেখি—

রমিতা বলল—আমার মনে হয় অনবরত অসুস্থ মানুষের সঙ্গে থাকলে খুব বেশীদিন স্বভাবের মাধুর্য বাঁচিয়ে রাখা যায় না। বিশেষ ক'রে যাদের জীবনে ব্যর্থতা বেশী তাদেরই ত এইসব সেবার কাজে বা স্কুলে পড়ানোর কাজে লাগানো হয়, এটাও বোধ হয় তাদের রুক্ষতার আর একটা কারণ। আমাদের দেশে এমন খুবই কম দেখা যায়, যাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, যাদের মানসিক এবং আর্থিক দৈন্য নেই—তারা এই ধরনের সেবার কাজ করছে।

—কিন্তু মেয়েদের স্বভাবমাধুর্য ত নষ্ট হবার নয়।

—এ নিয়ে এখন তর্ক করতে বসলে আপনার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এখন বিদায় হই।

গাড়িখানা যখন খানিক দূরে বাঁকের মুখে হারিয়ে গেল তখন প্রভঞ্জনের মনে পড়ল, রমিতাকে পুনরায় আসার কথা বলা হ'ল না ত!

সিঁড়ির মুখ থেকেই রমিতা বুঝতে পারল তার জন্য একাধিক আগন্তুক প্রতীক্ষা করছে। বাইরের ঘরে বেশ আলাপ গুঞ্জনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকেই। একজনের কণ্ঠস্বর বুঝতে কোনো অসুবিধা হ'ল না—সে পরমেশ। ওকে বেশ কড়া ধমক দিতে হবে। আর কে কে আছে তা অনুমান করা শক্ত। রমিতা মোটেই খুশি হতে পারল না। নিরিবিলি হাত-পা মেলে চোখ বুজে একলা থাকতে পারলে বেশ হত।

দোতলার দালানে পা দিয়ে রমিতা অভ্যস্ত হাসিতে মুখমণ্ডল জাগিয়ে ঘরে

ঢুকল। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। রমিতা একবার সকলের দিকে তাকিয়ে হাসল—আপনারা বসুন।

পরমেশ, ব্রজেন, অনুকূল, ভারবাণী, দীপ্তেন এবং আরও একজন যাকে রমিতা চিনতে পারল না।

রমিতা ভারবাণীর দিকে চেয়ে বললে—তারপর শেঠজী আপনার খবর কি?

ভারবাণী কুণ্ঠিত ভাবেই জবাব দেয়—কিছু জরুরি বাৎ ছিল। অনেক সময় অপেক্ষা করে রয়েছি।

—আচ্ছা জরুরী কথাটাই হোক। আমার ত এ ঘরে ঢুকেই মনে হচ্ছে বিষ্টিবাদল কলকাতায় হয় নি। এ যেন একটা চৈত্র মাসের হাল্কা সন্ধ্যা।

ব্রজেন বলল—সত্যি কথা বলতে কী, যা বাদলা পড়েছে তাতে আর কিছু ভালো লাগে না।

নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্য সরবে কুমার দীপ্তেন বলল—বড় পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে।

তার দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমিতা বলে—বাইরের বর্ষায় ভেতরের মনটা ঝিমিয়ে পড়েছে! তারপর, আপনি ভালো আছেন?

—এতক্ষণ ছিলাম না, তবে এই মুহূর্তে ভালো আছি।

দীপ্তেন হেসে উঠল এবং সেই হাসির জের টেনে বলল—কিছু বলব বলে এসেছিলাম। কাজ চুকিয়ে নিন। আমি আছি সবার শেষে।

নবাগত লোকটিকে সুদর্শন বলা চলে। যে ব্যক্তি ধাওয়া করে এসেছে এই বর্ষা মাথায় নিয়ে, সে নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করবে এটুকু জানা হয়েছে রমিতার এতদিনের অভিজ্ঞতায়।

ভারবাণী উঠে দাঁড়িয়ে বলল—প্রাইভেট ছিল কথাটা।

—আসুন এ ঘরে।

ভারবাণীর সঙ্গে ব্রজেনও পাশের ঘরে গেল।

ব্রজেনই প্রথম বললে—মিস্ মজুমদার, ওই লোফারটাকে আপনি কেন এত আমল দেন?

ভারবাণীও ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে সমর্থন করল—ওই অনুকূল ত চারশবিশিয়া। জানেন বর্‌জেন বাবু, ও হারামী আমার কাছে সাড়ে সত্তরো হাজার টাকা স্রেফ ধোঁকা দিয়ে আদায় করল এক তসবির গছিয়ে। আজ আমি ইজ্জত —রমিতা দেবীকে সেদিন আমার সেই বারাকপুরের বাড়িতে হাওয়া খেতে নিয়ে গেলাম, উনি বল্লেন—'এ আমার ছবি। আপনি কোত্থেকে পেলেন? আমি ত তাজ্জব!

ব্রজেন বলল—সে আবার কী—?

ভারবাণী বললে—সেই একঠো আওরাৎ কী তসবির মশাই। অবিশ্য ইটা ঠিক যে, ছবিটা খুবসুরৎ।

—তার মানে?···ব্রজেন অবাক হয়ে যায়।

—আমার একটা ফোটোগ্রাফকে—রমিতার কথা শেষ হবার আগেই ব্রজেন বিচলিত ভাবে বলে উঠল—That means আপনি ওকে মাথায় তুলেছেন, নইলে এ সব হয় কি করে! দেখুন রমিতা দেবী, আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভেবেছিলাম বুঝি আপনি এ লাইনের আর পাঁচজনের চেয়ে কিছু পৃথক, কিন্তু এখন—

তার কথাটুকু রমিতা সমাপ্ত করে দেয়—দেখ্‌ছেন তা নই।

ভারবাণী গোলমালের আঁচ পেয়ে ব্যাপারটা মীমাংসা করে দিতে চায়—দেখুন বর্‌জেন বাবু, এ আপনার অন্যায়—জেনানা, না, খেলানা!

ব্রজেন সেকথায় কর্ণপাত করে না—বুঝেছি। রমিতা দেবী আপনিও শেষে ওই সব ছবি তুলিয়ে বিক্রী করাচ্ছেন—ছিঃ!

রাগে, ক্ষোভে রমিতার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে, কানের পাশটা কেমন যেন উত্তপ্ত বোধ হয়। পরক্ষণে ও বললে—আপনারা কি এই কথাই বলতে এসেছিলেন? তা হলে অনুকূলকেও এখানে ডাকা হোক, তার কাছে আমিও জেনে নিই সে আমায় কত টাকা দিয়েছে ছবির জন্যে।

ভারবাণী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—যাইতে দিন, যাইতে দিন, ওসব তকরার বেফজুল! ছবি আপনার ত ফিরেই পেয়েছেন, ব্যাস্ গোল মিটেছে। হাঁ যে কথাটা আজ বলতে এসেছি রমিতা দেবী।

রমিতা ধূমায়িত বহ্নির মত বিষণ্ণভাবেই বলে—না, না শেঠ্‌জী এইসব নোংরামী ভালো লাগে না। যদি কেউ আমাকে ঠকায় তবে সে শুধু বিশ্বাসঘাতক হয়েই খালাস, আর দুর্নাম ষোলো আনা আমারই।

ব্রজেন চুপ করে থাকে।

ভারবাণী বলল—ও লোকটাকে তাড়িয়ে দিলেই ত গোল চুকে যায়।

—সে কথা পরে। ব্যবসার কথা বলতে চান?

—আমরা নতুন ছবি তুলছি একটা।

—আগের ছবিটা শেষ হল না, এর মধ্যে আবার নতুন ছবি কেন?

—সামনে দেখছেন না দেশ-প্রেমের গল্পগুলো কেমন জোরালো মার্কেট পাচ্ছে! যে কাজ চল্‌ছে চলুক।

—কিন্তু ও ধরনের ছবি ত আরও পাঁচটা শুরু হয়েছে। রমিতা বললে।

—তাতে কি হয়! হিড়িক লাগলে কম ক'রে এক বছর ত মরসুম! কেন আপনার মনে নেই, নেতাজীর হিড়িকে জয়হিন্দ বিড়ি, পাঁপর পর্যন্ত বিলকুল চলে গেল। শুনুন, আর যারা তুলছে তারা কেবল স্বদেশী অন্দোলন আর ইংরেজের অত্যাচার দেখাচ্ছে। আমরা শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাক-মার্কেট, বাস্তুহারা সমস্যা আর চাই কি গ্রো মোর ফুড পর্যন্ত দেখিয়ে ছেড়ে দেবো। ছবির মার্কেট নিয়ে আপনার কিছু ভাবতে হবে না, শুধু চুক্তিটা পাকা করে নেওয়া দরকার। আপনি এ ধরনের অন্য ছবিতে আর যাবেন না এটাই চাই।

প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে ব্রজেন একবার রমিতার দিকে আর একবার ভারবাণীর দিকে তাকায়। ভারবাণী সহাস্য মুখে সেটা সমর্থন ক'রে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সহসা রমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা। সাতদিন পরে বলব। একটু ভেবে দেখি।

ব্রজেন বিস্মিতভাবে বল্‌লে—ভাববার কি আছে? আপনি কথা না দিলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয় যে!

রমিতা অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করে—সে কী, আপনাদের ছবির মার্কেট্ ত তৈরী। এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তার আর কী আছে!

ভারবাণী ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল,—না, না সে কী কথা। আপনি বরজেন

বাবুর কথা ধরবেন না। অবিশ্যি বাজারে হিরোইন অনেক আছে, তবে আমাদের তেমন ছবি নয়—ছবির সবটাই আপনার হাতে। আপনি রাজি হইয়ে যান রমিতা দেবী। আমরা কথা চাই, আজই বলুন! টাকা অ্যাডভান্স ক'রে দিচ্ছি।

রমিতা হেসে জবাব দিল—ভেবে দেখব। তবে আজই কিছু বলতে পারছি না।

এ হাসি ওর স্বভাবসুলভ হাসি নয়।

যাবার সময় ব্রজেন আবার রমিতাকে অনুরোধ করল—ওই লোফারটাকে আমল দেবেন না। ওটা পাকা জোচ্চোর আর সে—যাক, আমি আর কিছু বলব না। ও আপনার অনেক ক্ষতি করে বেড়াচ্ছে! ভারবাণী কোম্পানীরও সর্বনাশ করেছে। পরে সব বলব।

—আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু নই ব্রজেন বাবু! তবে আপনার সদুপদেশের জন্য ধন্যবাদ।

রমিতার মধুর কণ্ঠস্বর গাম্ভীর্যে রুদ্ধাচ্ছন্ন। এক নিমেষের মধ্যে চৈত্রের হাল্কা আকাশ যেন আষাঢ়ের মেঘাবৃত অন্ধকারে পর্যবসিত হল। রমিতার ঠিক এমনই চেহারা আর একবার ব্রজেন দেখেছিল বাসাডেরা পাহাড়ে স্যুটিং-এ গিয়ে একান্তে বসেছিল যখন ওরা, সেই সময়ে। কিন্তু সেদিন কিছু আশা অবশিষ্ট ছিল, আজ সেটুকুও নির্মূল হল।

ব্রজেনের কণ্ঠস্বর করুণ শোনায়—আমারই ভুল, এ লাইনে যারা আসে তারা মানুষ হবার অবকাশ বিসর্জন দিয়েই আসে।

—আপনিও ত সেই লাইনেরই। আমারও অভিভাবক দরকার নেই।

রমিতার মধুর কণ্ঠে কে যেন শানিত তরবারির তীক্ষ্ণতা সংযোজন করেছে। ব্রজেন আর দাঁড়াল না।

যাবার আগে আর একবার বাজিয়ে দেখল ভারবাণী—আমি কিন্তু আপনার কথা পেয়েছি ধরে রাখলাম।

রমিতা বললে—অত সহজে কি ধরা যায় শেঠজী! আচ্ছা আজকের মত নমস্কার।

ব্রজেন এবং ভারবাণী চলে যেতে না যেতেই পরমেশ ঘরে ঢুকে পড়ল। তার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে রমিতা বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করে—তারপর তোমার কি ব্যাপার—!

পরমেশ রমিতার মুখের ওপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে বসল—ত্থাখো, আমি আজ অত্যন্ত সিরিয়াস! তুমি কি মনস্থ করেছ?

—কি বিষয়ে মনস্থির করতে হবে জানাও!

—আমার বিয়ে সম্পর্কে। আজ আমার শেষ কথা চাই।

—যার শুরু নেই তার শেষ ত যেকোন মুহূর্তেই হতে পারে।

—ওসব হেঁয়ালী রাখো। তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

—পারো করো।

পরমেশ রমিতার ডানহাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে সজোরে পীড়ন ক'রে বলে—ত্থাখো সান্ত্বনা, আর জ্বালিয়ো না। তোমার জন্যে জীবনে অনেক হাস্যাস্পদ হয়েছি। আজও ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করা হয় নি।

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে রমিতা শান্ত দৃষ্টিতে পরমেশের দিকে তাকিয়ে বলে—শেষে তোমারও মাথার দোষ হল! আমি যে অনেক ভরসা করেছিলাম পরমেশ!

—ভরসার বোঝা কতকাল বইব? আজ দশ বছর ধরে তোমার আনন্দের আসরে ঠেকা দিয়ে-দিয়ে কেটেছে, এক পয়সাও প্যালা পাই নি। পারছি না আর, এবারে মজুরী চাই। মুজরো ত মজুরীর আশাতেই—!

রমিতা বিচলিত ভাবে বলল—বাংলায় বলো, ওসব আড়িচাল বুঝতে পারি না।

—এর বাংলা হয় না। প্রথমে যখন তুমি বিয়ে করলে, সে বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন, সবই আমি করেছি—শুধু বিয়েটা আর একজন এসে করল। এখন ভেবে দেখছি সেই সময়ে ওই কাজটুকু পরের হাতে ছেড়ে দিয়েই ভুল হয়েছিল। ওটাও আমারই কর্তব্য ছিল।

—এতদিন পরে তামাদি হয়ে যাওয়া মূলধনের সুদ চাচ্ছ, তাও আবার

চক্রবৃদ্ধি হারে?' কিন্তু আমি যে কতখানি দেউলে সে ত জানো। তোমায় বন্ধ করে ফেলেছি সারাজীবনের। আর বদলানো সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের মেলামেশায় ঘনিষ্ঠতা হয়, তবে প্রেম নাও হতে পারে। কিছু জানা আর অনেকখানি কল্পনাই ত প্রেমের পথ—সে ত তোমাতে আমাতে নেই।

পরমেশ অসহিষ্ণুভাবে ঘরময় পায়চারী করতে করতে বলল—তবে তুমি আমায় ছুটি দাও সান্ত্বনা। আমি বিয়ে করব।

—বেশ ত পাত্রী দেখি।

—তার প্রয়োজন নেই।

—তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

—হায় এই বোঝাটুকু যদি যথাসময়ে বুঝতে!

—কিন্তু তুমি যে এরকম ভাবে আমার ছায়াকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলবে সেটা ত তখন টের পাই নি পরমেশ।

—ভেবেছিলাম টের পেতে দেবো না কোনোদিন। কিন্তু তা হল কই। মানুষের আত্মপ্রেম এতই অন্ধ যে, সে কিছুতেই ভুলতে পারে না নিজেকে। নইলে, আমি ত বলতে চাই নি, তবু আমাকে দিয়ে কে যেন বলাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার আর বিয়ে না করে উপায় নেই।

শঙ্কিতভাবে রমিতা জবাব দেয়—কিন্তু আমি ত তোমার বিয়েতে অমত করি নি, আমার নিজের বিয়েতেই আপত্তি আছে। তোমার ত এই প্রথম বিয়ে। একবার বিয়ে হ'লে, পুনরায় ওটা করতে তুমিও চাইবে না।

—ইস্, যদি তুমি বলতে একটা মিথ্যে কথা—যদি বলতে 'পরমেশ তোমায় আমি ছাড়তে পারব না' তাহলে আর বিয়েটা করতে হত না মিছেমিছি। একটু মিছে কথা বলতে পারবে না, মুখের কথাটুকু শুধু?

এতক্ষণে রমিতা পরমেশের কথার মধ্যে একটা যেন রহস্যের সন্ধান পায়। ও কতকটা তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললে—মস্করা করবার সময় আমার নেই। ব্যাপারটা চটপট সেরে নাও—!

—বাপ রে! তোমার যেন অনেকগুলো রোগী দেখতে বাকী রয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তারের মত তেড়ে উঠছ কেন?

—দেখছ না রাত বাড়ছে। এখনও একগাদা লোক বসে আছে।

রমিতার চোখে বিরক্তির তির্যক ছায়া পড়েছে।

পরিমল মুখখানা করুণ করে বলে—কি করি বলো। সাতটি মেয়ে একসঙ্গে আমার প্রেমে পড়েছে। সাতজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বেধে যায়। মুশকিল এই যে কার্য-গতিকে তাদের কাছাকাছি আমাকেও মাঝে মাঝে থাকতে হয়। সাত সতীন নিয়ে ঘর-করা আমার মত আনাড়ির পক্ষে অসম্ভব। পারো তো পাড়াগাঁয়ের একটি বেশ বলশালিনী মেয়ে দেখে, আমার বিয়ে দিয়ে দাও। নইলে বেঘোরে প্রাণটা হারাতে হবে।

—তাদের বয়স কত!

—বাইশ থেকে শুরু ক'রে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত। প্রত্যেকেই উপার্জনশীল।

—তবে বাদ দেবে কাকে বলো!

—কিন্তু কাকে গ্রহণ করব? ওদের দেখলেই দেশত্যাগের উৎসাহ পেয়ে বসে যে!

—কারণ কি? রূপ ।

—কোনটা নয়? গুণেই কি কেউ কম যায়? বাইরের রূপটা ধর্তব্যের বাইরে অনেক দিনই ছাড়তে শিখেছি। অন্তরের মাধুর্যে ওরা একেবারে—!

রমিতা হাসি দমন করে কপট গাম্ভীর্যে মুখখানা রাঙা করে বললে—এই বুঝি তোমার লেখাপড়া? যাও, বাড়ি গিয়ে পড়া মুখস্থ করো গিয়ে। আর একটিও কথা নয়।

—কিন্তু আজকের এই বর্ষণমুখর রাতে নিছক মানুষের দেহতথ্য পড়ে কাটাতে হবে? আর্ট পেপারের ওপর লালকালো রেখা দিয়ে কেবল হাড় মাংসের বিরক্তিকর বিবরণ লিখছে। তাতে কিছুই রস নেই। তবে একটা ভালো, ওরা বইএর মধ্যেই থাকে। মলাট বন্ধ করলেই ছুটি। বই-এর গণ্ডি পেরিয়ে পিছু পিছু ধাওয়া করলেই হয়েছিল আর কি!

—আঃ, তুমি যাবে কি না!

—পা বাড়িয়েই বসে আছি। রাত্রের রসদটুকু সংগ্রহ হ'লেই আর এক

মুহূর্তও দেরী হবে না। দেবি! দাও তব প্রসন্ন দৃষ্টির একটি কটাক্ষপাতে বক্ষ মোর আচূর্ণিয়া।

বলতে বলতে পরমেশ অন্তর্হিত হল।

আজকাল এইরকম ভাবেই সে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য হাজির হয় এবং রমিতার কাছে তিরস্কৃত হয়ে চলে যায়।

কুমার দীপ্তেন রায়, অনুকূল এবং নবাগত, প্রত্যেকেই বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল মনে মনে। কিন্তু সেকথা বলবার মত সাহস কারো নেই। বিশেষ করে অনুকূল আজ এসেছে অপরাধ স্বীকার করতে।

অনুকূলের অসহিষ্ণুতা এখান থেকে চলে যাবার জন্য নয়, আত্মপ্রকাশের দুর্নিবার আগ্রহের উৎপীড়িত মনের! সে আর সহ্য করতে পারছে না নিজের বিবেক দংশন।

কুমার দীপ্তেনের মানসিক স্থৈর্য অনুকূলের চেয়ে একটুও বেশী নয়। সে একজন জ্যোতিষীকে নিয়ে এসেছে। খুব অল্প বয়সে যে পাণ্ডিত্য ইনি অর্জন করেছেন তা অবিশ্বাস্য। অতএব কুমার দীপ্তেন এঁকে এখানে আনতে বাধ্য হয়েছে। তার বিশ্বাস, ইনি রমিতাকে প্রভাবান্বিত করে তার প্রেমের উৎসকে দীপ্তেনের দিকে চিরকালের মতো জমা দিতে সক্ষম হবেন।

যখন রমিতা এ ঘরে ফিরে এলো দীপ্তেন কতকটা ছোঁ মেরেই কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে—কুমারী রমিতা, আপনি বোধ করি এঁকে চিনতে পারেন নি?

বিস্মিত ভাবে রমিতা জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর অনুনয় করে বললে—কিছু মনে করবেন না, আমি ঠিক—

দীপ্তেন হেসে বলল—আশ্চর্য, আপনি চিনবেন কি করে? মানে দেখেন নি ত, তবে নাম নিশ্চয় শুনেছেন! ইনি বিখ্যাত জ্যোতিঃশাস্ত্রপারংগত জয়দেব বাচস্পতি।

রমিতা তবুও চিনতে পারল না দেখে দীপ্তেন হতাশ হল।

ওদিক থেকে অনুকূল এগিয়ে এসে নবাগত ভদ্রলোকটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মুগ্ধ ভাবে বলল—আপনিই সেই যুগান্তকারী ভাগ্যদ্রষ্টা! আহা

আজ বড় সুদিন আমার। কিন্তু বড় দুঃখ হচ্ছে, এতক্ষণ আপনার সামনে থেকেও বঞ্চিত রইলাম!

ইতিপূর্বে এই বিষণ্ণ মলিন লোকটির দিকে দীপ্তেন বিরক্তিভরে তাকিয়েছিল। আশাতীত গুণগ্রাহিতায় দীপ্তেন গদগদ হয়ে বললে—দেখলেন রমিতা দেবী গুণ হচ্ছে ফুলের সৌরভ, নইলে ইনিই বা মহর্ষির কথা শুনবেন কি করে!

অনুকূল উৎসাহিত ভাবে হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বলল—যদি কিছু মনে না করেন ত একটি প্রশ্ন আছে!

মহর্ষি জয়দেব স্মিতহাস্যে মুখখানি ঈষৎ উদ্ভাসিত করে বললেন—Please don't mind. I shall be glad to receive you at my chamber. আপনি আমার চেম্বারে দেখা করবেন। এখানে দেখছেন ত আমি Special call-এ এসেছি।

দীপ্তেনও খুশি হয়ে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বললে—চলুন আমরা একটু নিরিবিলি হই!

রমিতা অনুকূলের দিকে না তাকিয়েই বলল—তোমার কি টাকা-পয়সার দরকার আছে?

অনুকূল হতচকিত ভাবে প্রশ্ন করে—কার? আমার? না, না!

—কাল আসতে পারো না? আজ—!

অনুকূল বলল—হ্যাঁ, তা আসতে পারি। তবে কাজটা আজই যদি মিটে যেতো!

রমিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে দীপ্তেন অনুকূলের দিকে প্রকট ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে বললে—কিছু যদি না মনে করেন ত বলি। ওঁর শরীরটাও আজ ভালো নয়। তার ওপর আমাদের কাজই সারা হতে সময় লাগবে। আপনি বরং কালই আসুন মশাই!

অনুকূলের আজকের এই উপস্থিতি রমিতার কাছে কাঁটার মত বিঁধছে। সত্যি, অনুকূলকে ও আর এক মুহূর্তেও সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দীপ্তেনের কর্তৃত্বে রমিতা বিরূপ হয়ে উঠল। দীপ্তেনের কথাগুলো যেন শুনেও শুনতে পায় নি এমনি ভাবেই অনুকূলকে ও বলল।

অনুকূলের অপ্রতিভ শুষ্ক মুখের পানে চেয়ে বলল রমিতা—বেশ ত, এখানে মুখ বুজে বসে না থেকে, ভেতরে গিয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করলেও ত পারো ! মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারছি ক্ষিদে পেয়েছে।

কথাটা বিস্মিত দীপ্তেনের কানে মধু বর্ষণ করল না, অনুকূলও হতচকিত হয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল।

রমিতার বহুধাবিভক্ত প্রেমধারাকে এককেন্দ্রিক করার প্রয়াসপর্ব সমাপ্ত করে কুমার দীপ্তেন এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রপারঙ্গত মহর্ষি জয়দেব নিজের নাম ঠিকানা সম্বলিত একখানি ইংরাজি কার্ড দিয়ে যখন বিদায় গ্রহণ করলেন তখন রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

বিদায়ের সময় মহর্ষি জয়দেব বিনীতভাবে বললেন—দেখবেন, একটু প্রচার করবেন। আজকাল গুণগ্রাহিতার বড় অভাব, বুঝলেন, তাই নিজে থেকেই লৌকিক কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। আপনার মুখে পরিচয় পেলে অনেকে হয়ত ভারতের এই সুপ্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। আমার ব্রতই এই, জ্যোতির্বিদ্যা যাতে পুনরুজ্জীবিত হয় সেটা আমাকে দেখতে হচ্ছে ! আচ্ছা মা, নমস্কার !

অনুকূল যথাসম্ভব খাওয়া-দাওয়া করে একখানা কাঠের চেয়ারেই নিদ্রা জমিয়ে তুলেছে। রমিতা তাকে ডাকল—কি ব্যাপার, তুমি যে এখানেই রাত কাটাবার যোগাড় করেছ !

চোখ রগড়াতে রগড়াতে অনুকূল উঠে দাঁড়িয়ে বলল—টের পাইনি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

এই অল্পক্ষণ নিদ্রার ফলে তার জড়তা অনেকখানি কেটে গিয়েছে। অনুকূল এখন কতকটা সহজভাবেই কথাবার্তা কইতে শুরু করল—ওরা বিদেয় হয়েছে দিদি !

রমিতা বললে—হ্যাঁ ওঁরা ত ভালোয় ভালোয় বিদেয় হলেন এখন তুমি— !

অনুকূল সঙ্কুচিত ভাবে জবাব দিল—এখুনি যাচ্ছি। এতটা রাত হয়েছে বুঝতে পারি নি। থাক, না হয় কালই আসব। তোমারও শরীর খারাপ !

রমিতা এ কথায় যেন ফেটে পড়ল—কথাটা তোমার মুখে বড্ড বেমানান ঠেকছে। অন্যের সুখ স্বার্থের ভাবনায় মাথা ঘামাতে শিখবে কবে!

অনুকূলের চোখে যেটুকু ঘুমের রেশ তখনও ছিল রমিতার কণ্ঠস্বরে সেটুকুও মুছে গেল। সে বললে—দিদি, তুমিও শেষে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের মত পুরোপুরি মামলা না শুনেই রায় দিতে শুরু করলে? সত্যি ওই ভদ্রলোকের কথা ত মিথ্যে নয়, তোমার চেহারা দেখলেই বুঝতে পারা যায় শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

—তার জন্যে তোমরা দায়ী। বিশেষ ক'রে তুমি!

অনুকূল যে অত্যন্ত অস্থির একথাটা বারবার প্রমাণ হয়ে গেছে। এবং এই লোকটা মিহিরলালের পরেই রমিতার বড় ক্ষতি করেছে। সেদিক দিয়ে হিসেব করতে গেলে অনুকূলকে অনেক আগেই দূর করে দেওয়া উচিত ছিল। তবু রমিতা পারে নি। অনুকূলের একটা দীনতার আবেদন সূক্ষ্মভাবে রমিতার সংকল্পকে শিথিল করে দিয়েছে। ওর করুণ চেহারা এই কথাই বলতে চায় —আমি নিরুপায় হয়েই সব দুষ্কৃতির দুঃখভার বহন করব! তোমরা যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেবো, কোন প্রতিবাদ করব না। অবস্থা বিপাকে যা ঘটেছে তা আমার দ্বারা ঘটলেও আমি নিমিত্তমাত্র।···কোথায় যেন একটা অসহায় মানুষের আবেদন ওর মধ্যে রয়েছে। তা ছাড়া, শিল্পীর নির্লিপ্ততা— ওর যত অকার্যের কালো ছায়াকে অগ্রাহ্য ক'রে চলে।

অনুকূলকে বিষণ্ণ মুখে চলে যেতে উদ্যত দেখে রমিতা বলল—না, থাক। কাল অবসর পাবো কিনা ঠিক কি। আসা যাওয়া বন্ধ করে ভালোই করেছো। ভবিষ্যতে এখানে আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার আশা নেই। তোমার স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদে আমি প্রথমটা মুষড়ে পড়েছিলাম—কিন্তু খোঁজ খবর নিতে গিয়ে বুঝলাম যিনি মরেছেন তাঁর বাঁচতে সাধ ছিল না। আর কাউকে জানাও নি তার মৃত্যু সংবাদ?

অনুকূল এতক্ষণ রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, রমিতার কথা শেষ হ'তে সে মাথা নত ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ঘাড়টা সোজা ক'রে নিয়ে বলল—আত্মীয়দের কাছে যেচে সহানুভূতি

পাবার লোভ থাকলে নিশ্চয়ই ব'লে বেড়াতাম। এদেশের নিয়মই হচ্ছে পরের আনন্দের কথা শুনলে লোকের বুক ফেটে যায়—আর দুঃখের কথা শুনলে লোকে বলে, 'লোক দেখানো'। সে যাক গে, আমি তোমার কাছে স্বার্থসিদ্ধির জন্যেও আসি নি, আর অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চাইতেও আসি নি দিদি!

—বুঝলাম এটা তোমার ক্ষমা চাইবার আলট্রা আধুনিক কায়দা।

—যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু আমি আজ কিছু গোপন সত্য স্বীকার করতে এসেছি।

—বর্ষার রাতে আমার কাছে কি গোপন সত্য স্বীকার করবে?

রমিতার চোখেমুখে অবিশ্বাস-মিশ্রিত বিদ্বেষের অভিব্যক্তি।

অনুকূল বললে—তোমার করুণাও ভিক্ষা করতে আসি নি। তবে কি জানো, জীবনে সমস্ত অন্যায়ের সাক্ষী রাখা সম্ভব নয়, তাই মরবার আগে—তাই মরবার আগে, অন্ততঃ একজনের কাছে যতটুকু পারি স্বীকার করে যেতে চাই।

অনুকূলের মুখের পানে সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত করে রমিতা বলে—শুনেছি কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা পুরোহিতকে ডেকে অন্তিমকালে সকল অপরাধ স্বীকার ক'রে মনের বোঝা হাল্কা করে মরে। প্রথাটা ভালো—তবে মানুষ যদি প্রতিদিন নিজের কাছেই স্বীকার করত তাহলে হয়ত খাঁটি মানুষটা মরবার অনেক আগেই অন্যায়ের মৃত্যু ঘটত। এ ত তা নয়, শেষকালে পাপের বোঝাটা পুরোহিতের কাঁধে জিম্মা দিয়ে যাওয়া। কিন্তু সে থাক, তোমার অনুতাপের সাক্ষী হবার জন্যে যোগ্যতর মানুষ খুঁজে বার করো। ভগবান আমার এজাহার নিতে রাজী হবেন না। ধর্মকর্মের একটি গেজেটেড অফিসারের প্রশংসাপত্র আদায়ের চেষ্টা দেখলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অনুকূলের মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে কিন্তু তাতে তার বিষণ্ণ মুখখানা যেন আরও করুণ দেখায়। সে বলল—না দিদি, স্বর্গ চাই না। বড়মানুষের বদান্যতাও নয়। এখন সবচেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছে নিজের স্বরূপটা—কেবলই মনে হচ্ছে, এত ছোট আমি! মনের ভারটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। অনেকদিন

ধরে নির্বিকার ভাবে একটা অন্যায়ের জাল বুনছিলাম। হঠাৎ তার সুতো ফুরিয়ে গেল। আর এখন দেখছি, আমার জালখানা চারিদিক ঘিরে আমাকেই বেঁধেছে।"

রমিতার মুখে গভীর রাত্রির আত্মস্থতা। ওর চোখেমুখে আর শ্লেষের লেশমাত্র নেই।

অনুকূল ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে যেন নিজেকেই বলল—জানো দিদি, মেরী মারা গেছে।

রমিতার ভাবলেশহীন মুখখানার দিকে অনুকূল কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ নিজের কথার খেই ধ'রে আবার সে বলতে শুরু করে—মেরীকে তোমার মনে আছে? সেই যে বাসাডেরা গাঁয়ে জীবন্ত লতার মত একটি মেয়ে গান গেয়েছিল! যার কথা তুমি শুটিং থেকে ফেরবার পথে বার বার বলেছিলে। সেই যে কৃষ্ণচূড়া গাছের সঙ্গে যার তুলনা করলে বুকডি পাসে।

রমিতা স্মৃতির পিঞ্জরে অনেক অনুসন্ধান করেও ঠিক যেন মনে আনতে না পেরে চুপ করে রইল।

অনুকূল বলল—সেই যে মেয়েটি তার প্রিয়তমের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করছিল।

রমিতার মুখে হাসি ফুটে উঠল—আর বলতে হবে না। খুব সুন্দর রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়েছিল। আর হ্যাঁ মনে পড়েছে, আমায় বলেছিল তার Lover-এর খোঁজ করবার জন্যে! দাঁড়াও মনে পড়েছে, সেই ছেলেটার নাম হচ্ছে এলিয়াস! আহা বড় সুন্দর স্বভাব মেরীর! বড় ভালো মেয়ে—কিন্তু মেরীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

অনুকূল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল—আমি তাকে নিয়ে এসেছিলাম। ও আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল!

—সে, পালিয়ে এলো?

—আসবে না কেন? এলিয়াসের দেখা পাওয়ার আশায় মেরী কি না করতে পারে? তুমিও ঘাটশিলা থেকে চলে এলে, দিন তিনেক পরে যতীন

চৌধুরীরাও ফিরলেন। কিন্তু আমি রয়ে গেলাম। ওদের বললাম, একটু কাজ বাকী আছে, শেষ করে যাবো। কাজটা কিছুই নয়। বাসাড়েরায় ফিরে গিয়ে মোরেনের সঙ্গে দেখা করে, তার হাতে কিছু গুঁজে দিলাম। আর মেরীকে বললাম, 'এলিয়াসের খবর পাওয়া গেছে—রমিতা দি তোমায় কলকাতা নিয়ে যেতে লিখেছেন। ইচ্ছে করলে, আমার সঙ্গেও যেতে পারো।' মেরী চলে এলো।—না এসে পারে!

রমিতা বাধা দিয়ে বলল—কিন্তু মোরেন ত খুব খাঁটি মানুষ। টাকায় তাকে কিনতে পারলে?

অনুকূলের চোখ-দুটোয় অবজ্ঞায় তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে—টাকায় কি না হয়! টাকা ছাড়া দুটো বিলেতীর বোতলও দিতে হয়েছিল মোরেনকে, সে যে খাঁটি নেটিভ ক্রিশ্চান! তার ওপর পেটে বিদ্যের আঁচড় পড়েছে। বোকা ত নয়। কেবল পারি নি শুধু তোমাকে জুত করতে, নইলে আমার এদিকে একটা ঈশ্বরদত্ত শক্তি ছিল, একথা বলব! সে ত গেল—তারপর কলকাতায় এসে ওকে কয়েক দিন খুব শহর দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালাম।

রমিতা বলল—কিন্তু ও যে রকম এলিয়াসকে ভালোবাসত তাতে ত—

—অবিশ্যি প্রথম দিকে রীতিমত কষ্ট পেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু তারপর ব্রহ্মাস্ত্র নিয়োগে কার্যসিদ্ধি! এলিয়াসের খোঁজ ক'রে না পেয়ে প্রায়ই আমার মন খারাপ হ'তে লাগল—মেরীর চেয়েও বেশী মুষড়ে পড়তাম সময়ে সময়ে। কখনও বা ওর প্রেমে কতখানি পাগল হয়ে গেছি সেটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে, ওর কাছে গোপন করবার চেষ্টা চালিয়ে নরম করতাম। তুমি যতোই বলো দিদি, মানুষের ভ্যানিটিতে ঠিকমত তা দিতে পারলেই সিদ্ধি। বিশেষ করে তরুণ বয়সের ভাবপ্রবণ মনের কাছে প্রেমের খাতির খুব বেশি। মেরী বুঝেছিল, তাকে আমি পাগলের মত ভালবেসেছি। সত্যি কথা, ওকে আমার ভালো লেগেছিল।

রমিতা কখন বিরূপতা, বিদ্বেষ ভুলে গিয়েছে। অনুকূলের কথায় ও বেশ সহজ ভাবেই নিজেকে নিয়োগ করেছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল যখন ও বললে—তোমার জন্যে অপরের মনে একটা বিশেষ আসন পাতা রয়েছে এই

অনুভূতিই কাঁচা মনকে আত্মহারা করবার পক্ষে যথেষ্ট। পুরুষেরা এই অস্ত্রটির ব্যবহার খুব ভালো করে শেখে। ওই সুদর্শনচক্রে একদিন মিহিরলাল আমায় মারে নি? কিন্তু তারপর?

—তারপর আর কি! একদিন ও বললে, 'আমি কিন্তু এলিয়াসকে ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসতে পারবো না। ওই নাম আমার ইষ্টনাম।' আমি বললাম, 'বেশ ত আমাকে এলিয়াস ব'লো।' আমি ওর নাম দিয়েছিলাম মন্দাকিনী। এতদিনে ও বুঝেছিল, এলিয়াসের দেখা পাবে না। তবু আমার ওপর বিরূপ হয় নি। আমি ওর মনের আকাশে নতুন দিনের আলো এনেছিলাম, তাতে কোনো ভুল ছিল না। ও আমায় সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। মনে মনে ছন্নছাড়া জীবনের বেদেটাকে বিদায় দিয়ে মন্দাকিনীর আশ্রয়ে ঘর বাঁধবার ইচ্ছেয় কিছুদিন বিভোর রইলাম। কিন্তু অল্পদিনেই মনে হল, মন্দাকিনী যেন বড় বেশি মিষ্টি—আত্মবিলোপ করবার শক্তিই ওর সম্বল। ওর বৈচিত্র্য হারিয়ে গেল ক'দিনেই। মন আমার তৃপ্তিতে হাঁপিয়ে উঠল। তার ওপর মন্দাকিনী অসুখে পড়ল। ওর অসুখ বাঁকা চেহারায় মোড় নিল। ওর ওপর একটা ভয়ানক মায়া পড়েছিল দিদি। ওকে বাঁচাবার জন্যে ডাক্তারের পিছনে জলের মত টাকা খরচ করেছি।

—কিন্তু কেবল পয়সা খরচ করে ত মনের খেসারত দেওয়া যায় না।

—তুমি ঠিকই বলেছো। আজ কোনো কিছুই লুকোবো না। আমার মনটা কেমন বাইরে বাইরে কাটাবার জন্যে ছটফট করত—ওর কাছাকাছি গেলেই নিজে যে অবিচার করেছি তার জন্যে মন ভারী হয়ে উঠত। বাসাডেরার তাজা মেয়ের ফুটন্ত যৌবন, টালিগঞ্জের বাসার বিছানায় শুকিয়ে উঠছে দেখলে কি মন খুশী হয়? না তার কোনো চার্ম্ থাকে! তাকে ভালো লাগবে কেন! বরং দূরে থাকাটাই তখন আমার লক্ষ্য হয়ে উঠল। তবে ওর সেই ডাগর চোখের গভীর চাহনি ভুলতে পারি নি। ও আমায় কিছু বলত না কোনোদিন, বাঁধবার চেষ্টা করত না বাধা দিয়ে! আমি তাকে ঠকিয়েছি দিদি।

—তোমার মত মানুষের কাজই করেছো।

—কিন্তু ওর সেই কালো ভিজে ভিজে তাকানো আমায় পাগল করছে যে!

আজও মন থেকে মুছতে পারছি না দিদি। ও যখন মরল তখনও তেমনি করেই তাকিয়েছিল।

কয়েকটি কঠিন কথা রমিতার ঠোঁটের ডগায় এসেছিল। কিন্তু অনুকূলের বিবর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মনতা হয়। রমিতা কথাগুলো সামলে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

অনুকূল বলল—সেই ছবিখানা বিক্রী হয়ে গেছে। অভাবে পড়েছিলাম, ওর চিকিৎসার শেষ চেষ্টা করেছি ছবি বিক্রীর টাকা দিয়ে। এখন বুঝেছি সে টাকায় অভিশাপ ছিল। নইলে যে নার্স রাখলাম ওর তদবির করবার-জন্যে সেই নার্সকে গোপনে আমারই নিজের বিছানায়—!

রমিতার ভুলে যাওয়া বিদ্বেষ দ্বিগুণিত হয়ে জেগে উঠল। রমিতা সামলাতে পারল না। বলল—তার আগে মেয়েটাকে গলা টিপে খুন করলে না কেন? আগে জানলে তোমাকেই গুলী করতাম। বাসাডেরায় হাত কেঁপেছিল, কিন্তু এবারে কাঁপতো না। শিল্পী! অমানুষ! একদিন শিল্পী-মনের মর্যাদা দেওয়াকে উদারতা ব'লে গর্ব করেছি—আজ বুঝেছি সেটা কতখানি বোকামী!

—ওর ভুল আমি শুধরে দিয়েছি। গভীর রাত্রে নার্সকে ডেকেছে, সে ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। সাড়া দিই নি। তারপর বিছানা থেকে নেমেছে মন্দাকিনী, দেখেছে তার ঘরে নার্স নেই! তারপরও কি বুঝতে পারে নি? না-ই যদি বুঝবে তবে ওরকম জ্ঞানশূন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মরবে কেন?

রমিতার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। এতক্ষণের সঞ্চিত সমবেদনায় যেন বারুদ জেলে দিল অনুকূলের শেষের কথাগুলো, ও বললে—বাঃ সুন্দর! সুন্দর তোমার কণ্ঠস্বর, অপূর্ব তোমার বলবার ভঙ্গী, আরও চমৎকার তোমার হৃদয়বৃত্তির নিষ্ঠুর পরিচয়। কিন্তু অনুকূল, স্থান এবং কাল নির্বাচন ঠিকই হয়েছে শুধু ভুল ক'রেছো ব্যক্তি নির্বাচনে! আমি ত আর বলতে পারি না —কখনও কোনো কষ্টিপাথরকে কেউ নরম হ'তে দেখেছে এমন কথা শুনেছো! কি মহৎ তোমার শিল্পী-মনের অনুতাপ। আহা, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে! একটু কাজ তোমার এখন বাকী আছে—একটা তাজমহল

বানিয়ে দাও মন্দাকিনীর স্মরণে।' তাহলে শেষ কর্তব্য সমাধা হয়ে যায়—যথা একটা পাথর এঁটে দিয়ে এসো পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে—পুণ্যবতী মন্দাকিনী দেবীর স্বর্গকামনায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যদি একটা নলকূপ প্রতিষ্ঠা করে দাও তাহলে মারওয়াড়ীদের মত মহৎ হবে তুমি। তারপর যা খুশি তাই করতে পারো, বিবেকের কাছে মুক্তি!

অনুকূল পাথরের মত নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রমিতার দিকে।

রমিতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আশা করি শেষ হয়েছে তোমার কন্‌ফেসন!

জবাব দিল না অনুকূল। তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে মূক বেদনায়। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় রমিতা বলল—তোমার সম্বন্ধে কিছু বলব না। তবে, আমার দেহ বা দেহের প্রতিকৃতি বিক্রয় করার অধিকার একমাত্র আমারই রয়েছে এটা ভুলে গিয়ে তুমি যে ছবিখানা বিক্রী ক'রে আমাকে অপমান করেছ, তার জন্যে আমাকেই কিছু খেসারত দিতে হয়েছে। সেটা ভুলতে পারি নি। তার জন্যে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না। তোমাকে শিল্পী ব'লে যে সম্মান ক'রেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে দিয়েই হবে। মেরী মরে যাওয়ায় তোমার মনে একটু কষ্ট হয়েছে—সে জন্যে ভেবো না, দুদিনেই সেটা ঠিক হয়ে যাবে। একদিন, অতি নির্জনে আমার সকল লজ্জা অপসরণ করে কোনো শিল্পীকে সহায়তা ক'রেছিলাম। সৌন্দর্যের রূপকে সুন্দরতর করার স্পর্ধাই ছিল সেখানে বড়—ব্যক্তিত্বকে ভুলে, প্রকৃতির গানে সুর মিলিয়ে ছিল বিকচযৌবন···তারপর দুর্ভাগ্য আমার, সে ছবি একটি অমানুষ আর একটি লম্পটের কাছে মোটা টাকায় বেচে দিল। শুনেছ এ গল্প? শিল্পীর মৃত্যু হয়েছে। ছবিখানা 'ভারবাণীর কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছি। প্রাণহীন ছবির বদলে সজীব দেহ দান ক'রে। আজ তোমাকে নিজে হাতে সেই ছবি জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে হবে। পুরুষকে নিয়ে খেলা করাটা আমার নেশা—তার হাতের খেলনা হবার মত তুচ্ছ আমি নই।

স্তব্ধ বিমূঢ় অনুকূল সহসা যেন বিভীষিকা দেখে চমকে উঠল—না, না, সে আমি পারব না, আমায় ক্ষমা করো। সে ছবি আর যা-ই করো পুড়িয়ে নষ্ট

করো না দিদি। তুমি জানো না সে ছবি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। দিদি, শোনো—!

কিন্তু ততক্ষণে রমিতা ঘর থেকে ছবি আনতে চলে গেছে।

পরিবর্তন মেয়েকে এ ঘরে আসতে দেখে বললে—আর কত রাত হবে মা। খাওয়া-দাওয়া কর এবারে, এগারোটা যে বেজে গেছে!

পিতার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমিতা বলল—খাবো না, বলেছি ত! কিন্তু তুমি এখনও জেগে আছো বাবা!

একটা দীর্ঘশ্বাসে পরিবর্তনের দেহখানা কেঁপে গেল—শাস্তি ভোগ করতেই হবে যতদিন বেঁচে থাকব। অভিশাপ—তোকে মানুষ করবার শাস্তি নেবো না!

রমিতা যেন ধমক দিয়েই বলল—খুব হয়েছে, এখন ঘুমোও। আবার ত ভোর রাত্রে উঠে পাড়া জাগাবে!

ম্লান হাসি হেসে পিতা বলে—কানে বুঝি মন্ত্রের বিষ গিয়ে তোর মনেও বিষক্রিয়া শুরু করেছে? তা বলিস ত উপাসনা বন্ধ করে দিই। ওইটুকুই ত বিসর্জনের বাকী। তাই হবে—কাল থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করব না আর। জয় শঙ্কর!

ইদানীং রমিতা পিতাকে আঘাত দিয়ে তেমন আর খুশি হতে পারে না। অথচ এককালে প্রতি পদক্ষেপে পরিবর্তনের ঘাড়ে নিজের তাবৎ অন্যায়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েই ও বেশ নিশ্চিন্ত থাকত। আজকাল কিছু বলতে গিয়ে মনে হয় অসহায় একটি প্রাণীকে এভাবে আক্রমণ করায় গৌরবও নেই, নিষ্কৃতিও নেই। তবু আঘাত দেওয়াটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ছবি নিয়ে এ ঘরে রমিতা ফিরে দেখল অনুকূল নেই। শূন্য ঘরখানায় একটা রহস্যময় নীরবতা। নীরবতা ছাড়া আর আছে অনুকূলের বিষণ্ণ বেদনার্ত মুখের প্রতিচ্ছবি। মেরীকেও রমিতার মনে পড়ছে। মেরীর ছবি এত স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ল কেন এতদিন পরে? মেরী যেন আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘের নীচে পাহাড়ের পটভূমিকায় শ্যামল পুষ্পিতা কৃষ্ণচূড়া! ওর শ্যামলী দেহকে লীলাময় করে তুলেছে রঙীন ফুলের মত উজ্জ্বল হাসি। হাত

থেকে ছবিখানা পড়ে গেল।...অনুকূল সেই মেয়েকে তিলে তিলে ক্ষয় ক'রে নিঃশেষিত করল।

নীচু হয়ে ছবিখানা কুড়িয়ে নিল রমিতা। কাচটা ফেটে গেছে কিনা পরখ করবার জন্য ছবিটা ভালো করে দেখতে গিয়ে রমিতা তন্ময় হয়ে গেল। এত ভালো করে ও দেখে নি নিজেকে। বনসৌন্দর্যের সঙ্গে ছন্দ মেলে নি এ ছবির। শ্যামশোভায় প্রকৃতির কোনো কুণ্ঠা নেই, কিন্তু এই মানবীমূর্তির দীর্ঘ পক্ষ্মচ্ছায়ায় ব্রীড়াসঙ্কোচের রহস্য সুব্যক্ত। সত্যিই এ চিত্র রমিতাকে মুগ্ধ করল আজ।...এতদিন কি একটা বিরূপতা ছিল ছবিখানার উপর, সেজন্য ভালো করে তাকিয়ে দেখে নি ছবিটি। রমিতা নিজেই বাধা দেয়—না, না, এ ছবি নষ্ট করতে পারব না। অনুকূল ঠিকই বলেছে।

আবার ওর মনে হ'ল—অনুকূল বড় শিল্পী! শিল্পী না হ'লে এমন সামঞ্জস্যের কল্পনা সম্ভব নয়। ছবিখানা নষ্ট করলে ক্ষতিই হবে।...অনুকূল কি সেই সর্বনাশের কল্পনায় ভীত হয়ে চলে গেল!

সোফায় বসে রমিতা অনুকূলের কথা ভাবছে। উল্কার মত এক একবার এই মানুষটা কোথা থেকে উদয় হয়ে রমিতার মনোজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দিয়ে আবার জনসমুদ্রে মিশে যায়। এত রাতে গেল কোথায়! গাড়ি-ঘোড়া পাবে না। অনেক অঞ্চলে কারফিউ হয়েছে। রমিতার রীতিমত দুর্ভাবনা হয়। এমনিতেই ওর মুখটা কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছিল—এত রাতে কোথায় ঘুরে মরতে গেল অনুকূল।

অনর্থক একটি শোকসন্তপ্ত মানুষকে আরও জর্জর করাটা খুবই ছোট মনের পরিচয়। রমিতা কি শেষে এইভাবে তলিয়ে যাচ্ছে?

হঠাৎ টেলিফোন তুলে নিয়ে ডাকল থানার বড়কর্তাকে।

তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ, কি হয়েছে? মাতাল, না, প্রণয়ী? চোর, না ডাকাত?

রমিতা হেসে বললে—না, না সে সব নয়। একটি বিশেষ লোককে দরকার।

ও তরফ থেকে প্রশ্ন হল—কে সেই ভাগ্যবান?

—অতি-সাধারণ মানুষ। সব ছিল তার।

—আজ্ঞে অতীতের কথা যদি বলেন তবে এ অধমেরও আছিল বিস্তর ঠাট।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে হাসতে হেঁচকী তোলার মত শব্দ করলেন তিনি।

রমিতা রিসিভারটা কান থেকে সরিয়ে নিয়ে একটু অপেক্ষা ক'রে আবার বললে—একটু অনুগ্রহ করে তাকে যদি ধরেন।

—বাঃ এইটুকু পারব না? আরও সাংঘাতিক কিছু বললে তাও অসাধ্য নয়।

—না, তার দরকার নেই। মিনিট দশেক আগে এখান থেকে তিনি বেরিয়েছেন—আধ ময়লা কাপড়, তবে একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় এককালে রূপ ছিল।

—অত ওজন করে দেখার চোখ ত আমার কনেস্টবলদের নেই। তার চেয়ে বলুন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যতগুলো ভ্যাগাবণ্ড এ অঞ্চল দিয়ে যাবে, তাদের হাজতে পুরবে ওরা—তারপর আপনারটি দেখে বেছে নেবেন। এ্যাঁ—

—তাই বলে নিরপরাধ—

ভাববেন না কিছু—নিরপরাধ কেউ ধরা পড়ে না। ধরা পড়লেই সে অপরাধী। এখন নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন। ঘণ্টাখানেক পরে খবর পাবেন।

—আচ্ছা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমিতা টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় বসে রইল রমিতা। কাঁটাটা বড়ো আস্তে আস্তে ঘোরে। একটানা আস্তে আস্তে চলার ছন্দে বৈচিত্র্য কই! না, একে ঠিক ছন্দও বলা চলে না, শুধু নিয়মই বলা উচিত। এ ত তা নয়—যোগফলকে বেঁধে নিয়ে পথ চলা, ভাগ করে করে সময়কে দেখানো, এর মধ্যে ছন্দ নেই, আছে শুধু সূক্ষ্ম খণ্ডতার পরিচয়।

থানায় অনুকূলকে পাওয়া গেল না। খুব কম করে জনত্রিশ লোক

জমা রয়েছে একটা স্বল্পালোকিত ঘরে। বিশ্রী দুর্গন্ধে গা বমি ক'রে ওঠে। সকলেরই চোখে মুখে আতঙ্ক এবং বিষণ্ণতা মাখানো। এরই মধ্যে একটি ছোক্‌রা আর একজনের গা টিপে চাপা গলায় বললে—মাইরী দেখেছিস, রমলি।

—যাঃ, এই এঁদো জায়গায় তার আসতে দায় পড়েছে।

—বাজী ?

—আচ্ছা, সিনমা শো বাজী! ছাড়া পেলেই 'ফুল ডোরে বাঁধা' ছবিখানা দেখাবে, যে হারবে তার গাঁটগচ্ছা!

পরক্ষণেই উৎসাহী ছোক্‌রাটি ধাক্কাধাক্কি করে সবার সামনে এসে একটু গলা বাড়িয়ে গুছিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করে—বড়কর্তার সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করে বললে—শুনছেন স্যার!

তার এ আহ্বানে বড়কর্তা অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন, মেয়েটিও না তাকিয়ে পারল না। ছেলেটি বললে—আপনাকে বলছি স্যার! এই দেখুন হাতে কাঁচি আর চট্ রয়েছে—বিড়ির পাতাও আছে এতে। বুঝলেন, আমরা কারিগর—বিড়ির দোকানে কাজ করে ফিরছিলাম দু'জনে, এঁরা ধরে নিয়ে এলেন।

বলতে বলতে তার চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

বড়কর্তা ধমক দিয়ে বললেন—যাও বস গিয়ে—বেয়াদপ! কমিউনিস্টদের আস্কারায় এই বাঁদরগুলো মাথায় চড়তে চায়।

মেয়েটি একটু বিস্মিতভাবে বললে—কেন, কম্যুনিস্টের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি!

বড়কর্তা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—আর বলবেন না। বাড়াবাড়ি করলেই সব উপোস ক'রে বসবে, মিছিল বেরুবে! দেখতে ত পান খবরের কাগজে—! সত্যাগ্রহ লেগেই আছে। আসামীদের খাতির করে চলতে হয়। আগে হ'লে বেয়াদপীর জবাবে পঞ্চাশ ঘা দিতাম। যাক গে চলুন! তিনি তাহলে এর মধ্যে নেই ? হয় ত আরও ভালো জায়গায় এখন ঠুনঠুন্ পেয়ালা'য় মশগুল! আপনিও যেমন—

বড়কর্তার সঙ্গে মেয়েটি চলে গেল। তারপর সেই বিড়ি-বাঁধা কারিগরটির মুখে খই ফুটতে লাগল—সে আজ স্বয়ং এতবড় চিত্রতারকা রমিতার সঙ্গে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। এই তরুণীই যে বিখ্যাত রমিতা দেবী তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। উক্ত কারিগরটি বন্ধুকে বেশ ধমক দিয়েই বললে—আরে দোস্, দেখলি ত! মাইরি আর একটু সময় পেলে—ওই ইয়েটা অমন ধম্‌কে না উঠলে, ঠিকানাটা আদায় করে ছাড়তুম।

বন্ধুর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে শ্রীপতি বললে—বল্, আমারই জন্যে হল! আমার হারতে হারতে ঝোঁক চেপে গেল,—আরও খেলব, আরও খেলব, সেই করে করে এতটা রাত হয়ে গেল তবেই ত পুলিসে ধরল—যদি পুলিসে না ধরত তবে কি আর দেখতে পেতিস!

এইভাবে সে প্রমাণ করে তার নিজের কৃতিত্ব। আর বাকী যারা ওখানে ছিল তারা কেউ কেউ এই আলোচনায় যোগ দিল, কেউ বা নীরবে শুনতে লাগল।

অফিসার হাঁক দিলেন—দরওয়াজা!

আবার বিষণ্ণ লোকগুলির সামনে দিয়েই রমিতাকে যেতে হয়। তার দিকে তাকিয়ে থাকে এরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে। প্রশংসা ছাড়া আর যেটুকু আছে সেটা বিস্ময়। শ্রীপতি বন্ধুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে—দেখেছিস! দেখেই বোঝা যায় খুব উঁচু ঘরের মেয়ে!

তার বন্ধু বললে—তা বুঝি জানিস না—শালা, খবর রাখিস কেবল জুয়ার কড়ির, ও হচ্ছে কোথাকার জমিদারের মেয়ে।

—রেখে দে তোর বুজরুকী! আমার দিদি ললিতাকেও ত ফিলিমে নিতে চেয়েছিল। দিদি যদি নামতো ওকেও জমিদারের নাতনী ব'লে চালিয়ে দিত।

—ইল্লি—তোর দিদি—!

—চেষ্টা করলেই হয়ে যেতো। আমিই বারণ করলুম—জান থাকতে ওসব সইব না।

—মুখটা না থাকলে আর বাঁচতে হত না তোকে। মাস ঘুরতে চলল

বাড়ীমুখো হসনি, কেন? তোর মা ত কালও খোঁজ করতে এসেছিল। বুড়িকে কষ্ট দিস—এখন হাজতে কদ্দিন পচতে হয় ভাখ। মনে পড়ে আমারও শালা নাজেহাল! এরপরও বলিস ভগবান নেই!—যদি নেই ত আজ এখানে ঠাণ্ডি আরাম খাচ্ছিস কেন।

বন্ধুর সমালোচনায় শ্রীপতি অস্বস্তি বোধ করে। মা-বোনের ওপর সে খুবই অবিচার করছে ত। এবার ছাড়া পেলে সে নিশ্চয় বাড়ি ফিরে যাবে। একটু চুপ করে থেকে শ্রীপতি বললে—সত্যি ভাই নেশা পাজি। যা রোজগার করি কোথা দিয়ে উড়ে চলে যায়। এই ধর না আজকেরই কথা—তোর কত গেল?

—দু টাকা সাড়ে তেরো আনা।

—তবেই বোঝো! পল্টু শালা বড় লোক হয়ে গেল। তা খুব কম করে বারো তেরো টাকা জিতেছে—না রে!

—বেশি হবে। জিততে পারলে কেমন মৌজ হয় তা বল।

শ্রীপতি বয়স্ক সমঝদারের মত বিজ্ঞভাবে ঘাড় হেলিয়ে বলে—তা যা বলেছো। দেখি একটা বিড়ি দে! কিন্তু—

দু'জনে বিড়ি ধরিয়ে মুখ বুজে টানতে লাগল। আশপাশের অনেকেই বসে ঝিমোচ্ছে। ওরই মধ্যে কেউ কেউ নাক ডাকাতে শুরু করেছে।

পরদিন সকালে আশাতীত ভাবে মুক্তি পেয়ে শ্রীপতি বুড়োশিবের নামে সওয়া পাঁচ আনা পূজো বরাদ্দ করে বসল। সংকল্প করল বাড়ি ফিরে মায়ের দুঃখ ঘোচাবে। বাড়ি থেকে ঝোঁকের মাথায় পালিয়ে এসে অবধি একটানা ঝামেলা তার লেগেই আছে—অবিশ্যি হোটেলে হরদম ডিম, মাংস ইত্যাদি খুব খেয়েছে শ্রীপতি। ইদানীং এসবে তার অরুচি হয়ে গিয়েছে। মা যেমন সামনে বসে খাওয়ায়, দিদি যেমন নিজের মুখের খাবারটা তুলে ভাইকে দেয় তেমনটা এরা কেউ করে না। হোটেলের ঠাকুর ঠকাস করে থালাটা ফেলে দিয়েই চলে যায়। এরা চেনে পয়সা—মানুষকে পয়সা দিয়ে ওজন করে এরা। শ্রীপতির বন্ধুদের মধ্যেও সবাই নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এই ত সেদিন সন্ধ্যে বেলায় কড়ি খেলতে

বসে পয়সা ফুরিয়ে গেল—বাঁ দিকের ট্যাঁকে খোরাকী বাবদ আট আনা আলাদা করে রেখেছিল শ্রীপতি। জেদের বশে সেটাও বার করে খেলে দিয়ে ভেবেছিল এবারে জিতবে, কিন্তু হেরে গেল সে। এক একদিন এরকম 'বেপোট' পড়তা সকলেরই হয়। কিন্তু হরিপদর কাছে চেয়ে একটি আধলাও হাওলাত মিলল না। এরা সবাই সমান।

সোজা বাড়িমুখো রওনা হল শ্রীপতি। পথ চলতে চলতে হঠাৎ একটা মনোহারী দোকানে ঢুকে দিদির জন্য একখানা 'টার্কিস বাথ সোপ' কিনলে আর মায়ের জন্যে জর্দা চার আনার। দোকানীকে বার বার বলে দিলে—ভালো জর্দা দিও, কাশীর জর্দা। আরও কিছু কিনতে পারলে ভাল হত কিন্তু ট্যাঁকের অবস্থা সঙ্গীন। কিছু হাতে থাকা ভালো, কি জানি বাড়ি গিয়ে কি অবস্থা দেখতে পাবে তার ঠিক কি!

বস্তির কাছাকাছি এসে শ্রীপতির বুকের মধ্যে একটা কিসের যেন দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। এই পথটুকু ছুটে চলে যেতে চায় তার মন।—তার মা কি রকম ভাবে, কত কথা জিজ্ঞাসা করবে। দিদি হয় ত কথাই বলবে না। না বলুক, প্রণাম করলেই দিদির যত কিছু রাগ ধুয়ে হাল্কা হয়ে যাবে। দিদির জন্য শ্রীপতির দুঃখ হয়—ওদের পরিবারে ললিতা যেন বেমানান। অমন মাজা রঙের ওপর এমন একটা আলগা শ্রী আছে যা নাকি ভদ্র পরিবারেও খুব বেশি দেখা যায় না।

মনে মনে অনেক কিছু ছকে রেখেছিল শ্রীপতি—কিন্তু বস্তির মুখে এসে ওদের ঘরের চালার ওপর লতানো পুঁইগাছটা দেখেই আবেগের প্রবাহে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। শ্রীপতি এক দৌড়ে বাকী পথটা অতিক্রম করল।

ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে—তালাটার বয়স হয়েছে। ওর মা যখন হাজিপুরের মেলায় গিয়েছিল এটা সেই সময়ের কেনা। এখন আর ওটাতে বস্তুত কিছু কাজ হয় না, টানলেই মরচেপড়া স্ক্রুগুলো একবার আর্তনাদ করে, হাঁসুলীটা খুলে আসে। লোক দেখানোর জন্যে ওটা লাগানো হয়। অন্যদিন হলে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে শ্রীপতি তালা খুলতে দ্বিধা করত না—আজ কেন যেন

ইচ্ছে করল না। সে হতাশ হয়ে দাওয়াতে বসে পড়ল এবং মায়ের ওপর চটে গেল—তাবৎ সাধু সংকল্প কোথায় মিলিয়ে গেল।

একথা-সেকথা ভাবতে ভাবতে শ্রীপতি ঘুমিয়ে পড়েছিল। থানার ঠাণ্ডাঘরে কাল রাত্রে মোটে ঘুম হয় নি—আশপাশের দুর্গন্ধের জন্যে নয়, মানসিক উত্তেজনায় তরুণ স্বপ্নাতুর মন অস্থির হয়েছিল, তাই সে চোখ বুজতে পারে নি একটুও। আজ অবসন্ন মন, ক্লান্ত দেহ, ঘুম ঠেকায় কার সাধ্য। যখন ঘুম ভাঙলো তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। ঘরের দরজা তেমনিই বন্ধ আছে।

শ্রীপতি উঠে বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। একবার মনে হল গোপালের দোকানে বসে একটু চা খেয়ে এলে হয়—কিন্তু এখন কিছুতেই উৎসাহ নেই। বিড়ি ধরিয়ে শ্রীপতি অন্যমনস্ক ভাবে টানতে লাগল। হালদারদের জগা ওকে দেখে একটু হেসে বললে—কি রে ছিরিপতি ডানা গজিয়ে খাসা চেহারা বানিয়েছিস যে!

শ্রীপতি জগাকে ভয় করে—যা ষাঁড়ের মত চেহারা, যদি এক ঘা বসিয়ে দেয় তাহলে হাড়-হাড্ডি গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই ভালো। জগাকে সে ভয় করে, অপছন্দও করে।

কিন্তু জগা গেল না, দাওয়ার ওপর চেপে বসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল শ্রীপতিকে। হাসতে হাসতে বললে—আরে ভাই, শালার ছোটলোক কখনও বড়লোক হয়! এই যে তুমি ছিরিপতি—তোমার মা যতই বাহার করে নাম রাখুক না, তুই শালা সেই বিচ্ছিরিই থাকবি। নইলে আমি মান্যে বড়ো বেক্তি, আমার মুখের ওপর ত ধোঁয়া ওড়াচ্ছিস, তা বেশ বাবা নিজে বিড়ির কারিগর, খুব খাবি। তবে ভদ্দরতাই করে দু'চারটে আমাদের দিয়ে খেলেই ত পারিস।

শ্রীপতি সসঙ্কোচে গোটা-দুই বিড়ি বার করে এগিয়ে দিল।

জগা সস্মিত বদনে একটি বিড়ি ধরিয়ে বললে—তোর ভাবনা কি, মা-বোন সবাই রোজগার করছে, তুই ডানা মেলে এনতার উড়তে থাক।

শ্রীপতি জগাকে ভয় করে ঠিকই, কিন্তু অল্পবয়সে উপার্জন করতে শিখেছে

ব'লে স্বভাবতই সে একটু স্বাধীনচেতা। জগাই-এর মুখের ওপর সে বলে দিল—বেশ আমার মা-বোন রোজগার করে তাতে কার কি!

—ওরে বাপরে, ভারি গরম যে। তা হবে, পয়সার গরম যাবে কোথায়!

জগা চলে গেল। শ্রীপতি অগ্নিদৃষ্টিতে জগাকে যতক্ষণ দেখা যায় সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। লোকটার সব কথায় নাক গলানো স্বভাব—বসে বসে খায় আর আখড়ায় কুস্তী লড়ে।

কিছুদিন ধরে ললিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার চেষ্টায় ছিল জগা, সেজন্যে শ্রীপতি ওকে আরও বেশি অপছন্দ করে।

ললিতার মা বাড়ি ফিরল অনেক বেলায়। ছেলেকে দেখেই বলল—তা এতটা বেলা হয়েছে, এখনও ছ্যান করিস নি কেন! যা তেল চাপড়ে মাইতিদের পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আয়।

শ্রীপতি প্রশ্ন করল—দিদি কোথায়?

—সে কাজে গিয়েছে।

—কাজে?

—হ্যাঁ, নইলে ডান হাত মুখে উঠবে কি করে শুনি!

—ওঃ, তা কখন আসবে!

—থাক থাক, খুব যে, দিদির দরদে গলে পড়ছেন! যাও বাবা খুব হয়েছে। তোমরা সব কোকিলের ডিম ছিলে, এখন আমি হচ্ছি কাগ-মা! একে একে নিজের পথ ছাখো-সে!

শ্রীপতির গলা বেয়ে কি যেন একটা শক্ত জিনিস ওপরদিকে ঠেলে উঠছে। ছলছল চোখে ও বললে—ছাথ্ মা, মনটা ভালো নেই।

—আহা, রোজগেরে ব্যাটা আমার! তোমারই মন আছে, বুড়ো মায়ের ত ওসব বালাই নেই। যা ছ্যান করে আয় বেলা হয়েছে ঢের।

—যাচ্ছি। দিদি কখন আসবে মা!

—তার কথা বলিস না বাবা। এই সেদিন পর্যন্ত রোজই ত রাত আটটা ন'টায় আসছিল। এদানে কাজের চাপ খুব, বাবুদের বাড়িতে অনেক লোক।

রোজ আসতেই পারে না। তা খবর পেলে আসবে বই কি! মাইনে ওরা ভালোই দেয়। খাওয়া দাওয়া ভালো, আদর যত্ন খুব।

—দিদিকে ছাড়িয়ে আনো। তোমাকেও চাকরী করতে দেবো না। এই বলে দিলাম।

—আচ্ছা বাবা, দু'দণ্ড থির হয়ে বস, খেয়ে-দেয়ে শলব হবে। তোমাদের দরদ দেখতে দেখতে বুড়িয়ে গেলাম। হুঁঃ।

—না, মা আমি আজই বলে দিচ্ছি!

শ্রীপতি এই মুহূর্তেই নিজের মতামত জাহির করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। এই কদিনে ও বুঝতে পেরেছে যে, বাইরে বাইরে থেকে যতই মাছ-ডিম-মাংস খাওয়া যাক না কেন, মা-দিদি কাছে না থাকলে শান্তি নেই। ওর একটা উচ্চাশা ছিল জুয়া খেলে বড়লোক হবে, সে আশাও সুদূরপরাহত—'পেঁচে-কেনা'রা সব গল্প করে বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একজনও তেমন বড়লোক দেখতে পায় নি শ্রীপতি। উল্টে বাজারে শ্রীপতির কিছু দেনাই হয়েছে।

মায়ের পা-ছুঁয়ে সংকল্প করল শ্রীপতি—জীবনে আর সে কড়ি খেলবে না। তবে হ্যাঁ বছরের একটি দিন সে নিজের এক্তারে রাখতে চায়। সেটা বড়দিনে কাপের ঘোড়দৌড় খেলার দিন। ছেলের এরকম পরিবর্তনে মায়ের হৃৎ-পা কাঁপতে থাকে। সত্যিই কি শ্রীপতির মতি ফিরল?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মা বললে—এই ত বাবা, সবই বুঝিস! একটা কথা বলি শোন, দিদি যেমন কাজ করছে করুক। আর আমারও সরকারদের বাড়িতে এমন কিছু মেহনৎ করতে হচ্ছে না। তিনজনে ঠিকমত রোজগার করলে দেশে একটু জমি নিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসা যাবে। তোর একটুকুন সংসার পেতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি। বলি, আমাদের জীবন ত গেল, তোকে যেন আর এই বস্তিতে কাটাতে না হয়।

শ্রীপতি বললে—মিছে তুমি দিদিকে শ্বশুর ঘর করতে দিচ্ছ না মা। নফর দা নিয়ে যেতে চাচ্ছে, পাঠিয়ে দাও। বিয়ে যখন দিয়েছ, তাকে শ্বশুর ঘর করতেই হবে। আমার বিয়ে-টিয়ের কথা মুখে এনো না।

—বিয়ে করবি না ত কি ধর্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াবি। হালদারদের জগাই হয়ে লোকের দোর দোর ঢুঁ দিয়ে বেড়ানো—ছি-ছি!

সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে দিদির কথাটাই শ্রীপতি তুললে আবার—সরকার বাড়ি যাওয়ার পথে দিদিকে পাঠিয়ে দাও না। বাবুরা এমন কিছু লাটসাহেব নয়, দিদি একদিন একবেলা কামাই করলে তারা মরে যাবে না। ইস্ কতদিন দিদিকে দেখি নি!

ছেলের এ কথায় ললিতার মায়ের বিস্ময়ের অবধি রইল না—তুই বলিস কি! হদ্দমুদ্দো বসে বসে কামাই করলে আর পরের দোরে খেটে খেতে হবে না। কথায় বলে, 'থাকতে বলদ না বয় হাল তার কষ্ট ছেরডা কাল!

শ্রীপতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল—তোমার ধম্ম তুমি জানো। বিয়ে দিয়ে মেয়েকে নিজের কাছে আটকে রাখা কি ধম্ম জানি নে। যাই, তোমার সঙ্গে দিদিকে দেখে আসি চলো!

—ধরে রাখতে ভারি সাধ আমার! তোমার দিদি গেলেই পারেন। আমি কি বেঁধে রেখেছি? সে ত যেচে পরের বাড়ির কাজ নিলে—বলে কি, 'বসে-বসে থাকলে ভাত হজম হয় না মা'। কত করে মানা করলাম, কিসের কি, ওই এক মেয়ের জেদ—বলল, 'শ্বশুর বাড়ি যাবো না। ওরা লোক ভালো নয়'—ব্যাস, জন্মের মত নিশ্চিন্দি। শ্বশুর বাড়ির পিঁপড়েটা পর্যন্ত দেখলে ও জলে যায়। নিলে চাকরী। তবে হ্যাঁ কপালগুণে গোপাজ জোটে। খাওয়াপরা বারো টাকা মাইনে। কাজও এমন কিছু না। ওই যা একটু চোখের সামনে হাজির থাকতে হয়।

—ওসব কিছু বুঝি না। যার যা—তার তা! দিদিকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাতে হবে। আর তোমাকেও কাজ ছাড়তে হবে—একটু চেপে খাটলে দিনে দু'টাকা আমি আনতে পারি। দুটো মানুষের ওতেই চলে যাবে! কাজে যাবার সময় দিদিকে একটা খবর দিয়ে যেয়ো তুমি! সে যেন আসে, আমি আর ওইসব বড়লোকের বাড়ি যেতে চাই নে।

ছেলের কথার কোনো বাদানুবাদ না ক'রে ললিতার মা দোক্তা গালে টিপে দিয়ে বললে—বেশ তাই হবে। এ মাসথান যেতে দে! হাকিমের রৈ

এখানে বসে থাকলে পয়সাটা আনবি কি করে শুনি! রাত্তিরে সকাল সকাল ফিরবি, তখন সব কথা হবে—এখন কি খবর দিলেই তড়িঘড়ি আসতে পারবে ললিতে!

—আচ্ছা বেশ আই—তাই। আমি কাজে বেরুচ্ছি—তুমি যেন দিদিকে খবরটা দিও। খবর পেলেই সে আসবে।

কাঁচি এবং একটুকরো চটে জড়ানো সরঞ্জাম নিয়ে শ্রীপতি বেরিয়ে গেল ললিতার মা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে হাই তুলে নিশ্চিন্ত হয়। শ্রীপতি যেমন হঠাৎ চলে গিয়েছিল তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে এলো দেখে ললিতার মায়ের যতটা খুশি হওয়ার কথা, ঠিক সেই পরিমাণ আনন্দের আস্বাদ ললিতার মা বর্তমানে পায় নি। তার উদ্বেগ ললিতাকে নিয়ে। শ্রীপতিকে এ বেলার মত ঠেকিয়ে রাখা গেল বটে, কিন্তু রাত্রে কি বলবে! এই নিয়ে যদি একটা কথাও বস্তীর কেউ শুনতে পায় তাহলে সব কিছুই রাষ্ট্র হয়ে যাবে। বড়লোকের বাড়ির চাকরী, বারো টাকা মাইনে—এসব কথা তখন আর খাটবে না। এ কটা দিন বেশ কাটছিল, হঠাৎ শ্রীপতি এসে যেন একটা বিরাট ছন্দপতন ঘটিয়ে দিল। যে সন্তানের অদর্শনে মায়ের অন্তর বেদনার্ত হয়ে ফেটে পড়তে চেয়েছিল আজ সেই সন্তানকে দেখেই এত দুর্ভাবনা, এত উদ্বেগ!

আর কোনো উপায় নেই। এখনও সুস্থ অবস্থায় আসতে ললিতার খুব কম করে আট দিন সময় লাগবে। তারপরও আনা চলবে না মাসখানেক। …কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোনো পথ ললিতার মা দেখতে পায় নি। ললিতার মত এই সেদিনের মেয়ের যদি বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতে ছেলে হতে শুরু করে তবে একদিন চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিয়ে বেচারীকে উপোস করে মরতে হবে যে! আর নফরচন্দ্র তখন তার দিকে ফিরেও চাইবে না। পুরুষদের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে ললিতার মায়ের। এই জীবনটা তাকে অনেক কিছু রূঢ়সত্য বুঝতে শিখিয়েছে। যে যাই বলুক, ললিতার মা নিজেকে দিয়েই বুঝেছে যে, পড়ে পড়ে মার খাওয়ায় মাহাত্ম্য কিছু নেই। তার চেয়ে স্বৈরধর্মের ফলাফলকে পথের পাশে রেখে দিয়ে আপনার জীবনটুকু সযত্নে রক্ষা করে চলাই শ্রেয়। অনেক দুঃখদুর্দশার মধ্যে দিয়ে, অনাহার, অত্যাচার,

মন্বন্তর সহ্য করে, ছুটি সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে, এই ভগ্নাংশ দু'টিকে নিয়ে আজও বেঁচে আছে ললিতার মা। এ ভাবে বাঁচার দুঃখ যেন ওর সন্তানেরা না পায়।...

. সত্যিই ত ললিতার আজই এখানে আসা সম্ভব নয়।

অনেক ভেবে, শেষে আপন মনেই খানিকটা হেসে নিল ললিতার মা! আর যাই হোক, কোনো দিন বুদ্ধির অভাব তার হয় নি। শ্রীপতিকে চুপি চুপি বলতে হবে, হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে ওবাড়ির মেজ গিন্নী কাশী চলে গেলেন —তাঁর বুড়ো বাপের শেষ সময়! তা ললিতাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন। সময় ছিল না বলে ওরা আর খবরও দিতে পারে নি—এই সবে কাল রাত্রেই ওরা গেছে। কথাটা যাতে শ্রীপতি আর কাউকে না বলে সেটা দেখতে হবে' কারণ এ বস্তীর অনেককেই এরকম ভাবে বাইরে যাওয়ার অছিলা করতে হয় এবং তার অর্থও বোঝে। ললিতার মা আর সকলের দলে নিজের মেয়েকে ফেলতে নারাজ।...পোড়ারমুখী কিছুতেই রাজি হয় না।...সে কী কান্নাকাটি অশ্রুমুখী কন্যার করুণ মুখচ্ছবি ভেসে উঠল ললিতার মায়ের মনে। বাঁধভাঙা বন্যার বেগের মত ঝর্ ঝর্ অশ্রুধারা, ললিতার মায়ের মনেও সেদিন কম আঘাত হানে নি। যখন নিরুপায় ললিতা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল—'তুই মা ন'স ডাইনী! মা হয়ে তুই এমন কাজ কি করে পারিস্!'... তখন একবার মনে হয়েছিল, থাক, এসবে কাজ নেই। কিন্তু পরক্ষণে ললিতার মা হাসি টেনে এনে বলেছিল—'মা হওয়া খুব সোজা, কিন্তু আমার মত মা হতে গেলে কলজের জোর দরকার।'...

এখন বসে বসে ওসব ভাবলে চলবে না। বেলা পড়ে এলো; কাজে যেতে হবে। তারপর একবার ললিতাকে দেখতে যেতে হবে। উঠে বসে পুনরায় দাঁতে দোক্তা ঠেসে দিল ললিতার মা। কখন নিজেরই অজ্ঞাতে কয়েক বিন্দু অশ্রু ওর লোলকুঞ্চিতকপোলপ্রান্তে এসে জমা হয়েছে ও বুঝতে পারে নি। অবজ্ঞাভরে সেটুকু মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজায় সেই পুরনো মিলারের তালাটায় সযত্নে চাবি লাগিয়ে ললিতার মা বেরিয়ে পড়ল।

পথটা কত ভালো—কত লোকজন চলেছে। গাড়িঘোড়ার সমারোহ।

সবটা জড়িয়ে একটা উৎসবের ঘটা যেন। চারিদিকে তাকিয়ে ললিতার মায়ের অদ্ভুত আনন্দ হল।

কথাটা বলি বলি করে অনেকদিন পর্যন্ত পার্বতী সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু আর না বলে উপায় নেই, জয়ন্ত লিখেছে—'আমাদের এখানকার পুরনো নথীপত্র অডিটের রায় কলকাতায় চলে গিয়েছে। এখনও সময় থাকতে চাপা না দিতে পারলে, হাতকড়া পড়বে। নিজের জন্যে কোনো দিনই ভাবি নি। চিরকাল, তোমাদের ভবিষ্যৎটাই আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা। দাদাকে বলো ওঁর চেনাশুনো কর্তাব্যক্তি দু'তিন জন রয়েছে—তাদের নাম…। এঁরা প্রত্যেকেই তোমার দাদার কাছে দু'চারবার চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন। দাদা একবার বললেই আমি রক্ষা পাই। ব্যবস্থা করে রেখো। এখন আর ধার্মিক দাদার আদর্শ-বোনের মত নীতিকথা শোনাতে চেষ্টা করো না। জানো ম্যাট্রিকে সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলাম! তারপর জয়ন্ত যেসব কথা লিখেছে তার সারার্থ হচ্ছে যে, পুত্রপরিবারের মুখ চেয়ে এবং ভবিষ্যতের সংস্থানের আশায় সে আর পাঁচজনেরই মত গোপন পথে পয়সা আনতে গিয়েছিল। এতে দোষ কি! এও এক-প্রকারের পরোপকার। একে চুরি বলে না, এর নাম উপরি আয়। তবে যে দেশের গবুচন্দ্র কর্তা সে দেশে এরকম উল্টো বিচার হওয়াটাও কিছু আশ্চর্য নয়। সেই বিচার মানতে যারা গলা বাড়িয়ে দেবে তারা মহামূর্খ! জয়ন্ত আরও অনেক নূতন ধরনের কথা লিখেছে।

আজকাল দাদাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। যেটুকু সময় সে ঘরে থাকে বইএর মধ্যে এমন ডুবে থাকে যে কোনো কথাই মন দিয়ে শোনে না। পার্বতী এক-আধবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বই-এর পাতাতে যে প্রভঞ্জনের মন বাঁধা রয়েছে তার মুখ দেখলেই বেশ বোঝা যায়। এই ত সেদিন রাত্রে পার্বতী গিয়ে খানিকক্ষণ টেবলটা গোছাবার চেষ্টা করল, তাতেও দাদার চৈতন্য হ'ল না দেখে একখানা ভারী বই মাটিতে পড়ে গেল পার্বতীর হাত থেকে। সেই শব্দে চমকে উঠে প্রভঞ্জন তাকিয়ে বললে—'কে? পার্বতী! তুমি ঘুমোও নি!…এখন আবার গোছগাছ কেন!'

পার্বতী থতমত খেয়ে বলেছিল—'সারাদিন ত আর ফুরসৎ পাই না! বাচ্চা-গুলো ঘুমিয়েছে, তাই তোমার টেবিলটা একটু—!"

কথাটা সমাপ্ত হওয়ার আগেই প্রভঞ্জন হাতের বইখানা মুখের ওপর তুলে ধরেছে দেখে পার্বতী মনে মনে হতাশ হ'ল। তারপর আর কোনো কথা হয় নি। দাদা যেন বড় বেশি পর হয়ে গেছে। নইলে, এর আগে পার্বতীকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করতে কেউ দেখেছে কি? যাক গে ওসব কথা ভাববে না পার্বতী, আজ দাদার কাছে নিজের প্রয়োজনের কথাটা বলে ক্ষান্ত হবে। ফলাফল সম্বন্ধে একটু আশঙ্কা আছে বই কি! এখনও সুযোগ পেলেই প্রভঞ্জন বলে, 'ওই ত দৌড়, একুশ বছরে প্রেম করে বিয়ে যারা করে, তারা এর বেশি আর কী করবে!' পার্বতী নিজের মনে মনেই দাদার সঙ্গে তর্ক করে। কিন্তু প্রভঞ্জনের সামনে দাঁড়িয়ে বলবার মত দুঃসাহস ওর হয় না।

আজ ভোর থেকে উঠে অবধি পার্বতী সংকল্প করছে বার বার—দাদাকে অনুরোধ করতেই হবে। স্বামীর জন্যে আপন দাদার কাছে আবদার করার মধ্যে ত অগৌরব কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু—দাদার স্বভাবটা পার্বতী বেশ ভালো ভাবে জানে বলেই আরো মুশকিল হয়েছে।—তবু বলতেই হবে।

প্রভঞ্জন টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখছিল।

পেছন থেকে পার্বতী এসে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে—দাদা, তুমি কি খুব ব্যস্ত আছো?

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রভঞ্জন শূন্য দৃষ্টি মেলে বলল—উঁ—হাঁ, কি বলছিস!

—একটা কথা ছিল।

—কথা? বলে ফেললেই চুকে যায়, চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন, এঁ্যা!

—উনি ত পরশু আসছেন।

—ও! তা বেশ ত! জয়ন্ত ভালো আছে ত! তোকে নিতে আসছে, না কি?

—শরীর আর তেমন ভালো কই। আপিসের ব্যাপার নিয়ে ত ভাবনায় ভাবনায় শুকিয়ে যাচ্ছেন. আর হজমও ভালো হয় না।

আসল কথাটা বলতে পারে না পার্বতী।

—তা ভালোই হবে, দুচার দিন থেকে শরীরটা অন্তত সারিয়ে নিতে পারবে, কি বলিস?

পার্বতীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন ঝড়ের বেগে ভেঙে পড়ল,—তার চেয়ে বড় বিপদ যে আমাদের মাথার ওপর ঝুলছে দাদা! তুমি তোমার বন্ধু···চৌধুরীকে একটু বললেই উনি খালাস পেয়ে যান।

—চৌধুরী ত আমার পেসেন্ট, বন্ধু নয়। তাছাড়া চুরিচামারির ব্যাপারে ওঁকে চাইতে পারবো না।

পার্বতী বললে—ওঁকে এবারটি তুমি বাঁচিয়ে দাও দাদা! পায়ে পড়ি।

পার্বতী সত্যিই মাটিতে বসে পড়ে প্রভঞ্জনের পা চেপে ধরল। ওর চোখের সামনে কেমন একটা ঘোলাটে ঝাপসা পর্দায় ঢাকা পড়ে গেছে দিনের আলো। ওর মনে যে আশঙ্কা ছিল সেটা এতদিন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় নি, কিন্তু আজ বুঝতে পারল দাদাকে চিনতে ভুল করে নি ওর মন।

ডুকরে কেঁদে উঠল অবুঝের মত—দাদা, তুমি বাঁচাও আমাদের। নীলাম্বর লিলি ওরা কি তোমার কেউ নয়!

প্রভঞ্জন পাথরের মত সোজা হয়ে চুপ করে বসে থাকে।

মা এসে ঘরে ঢুকলেন—হ্যাঁ রে কে কাঁদছে! পারু! কি হয়েছে? ওঠ মা।

তিনি এগিয়ে এসে মেয়ের হাত ধরে তুললেন—কি রে, কি হয়েছে মা!

প্রভঞ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের মুখের ওপর দৃষ্টি অচল রেখে বললে—যাই হোক, তোমায় আগে থেকে মিনতি করি, মা তুমি যেন আমায় কোনো অন্যায় সমর্থনের জন্য আদেশ করো না। আমি পারব না। যে সব মেরুদণ্ডহীন মানুষ দুর্বল বিকারগ্রস্ত মনের নোংরা প্রমাণ দিয়ে ওষুধ নিতে আসে আমার কাছে—

চমৎকারিণীর ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী লাগে না। তিনি মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রভঞ্জনকে উদ্দেশ করে বললেন—তোর আপনার বোন, বোনপোর মুখ চেয়েও কি এটুকু সম্ভব নয়!

—হ্যাঁ, মা। তার চেয়ে ভগ্নিপতির সম্পর্কটা অস্বীকার করা আমার কাছে ঢের সহজ।

হঠাৎ দলিতাফণিনীর মত চাপা হিস্ হিস্ শব্দ করে বলে উঠল পার্বতী—হ্যাঁ তা ত বটেই! বাইরে থেকে দেখলে সব মোহান্তই পরমধার্মিক। তবু যদি নিজের কীর্তির কথাটা আমাদের জানতে বাকী থাকত!

একটা আলগা হাসি হেসে প্রভঞ্জন বলে—অত রাগ করিস না পারু! একটু ভাবলেই বুঝতে পারবি, দাদা খুব অসঙ্গত কিছু বলে নি।

পার্বতী যেন আর নিজের আয়ত্তে নেই। একটা হিংসার ফুলিঙ্গ ছুটে দু'চোখে। ও বললে—হয়েছে, আর ন্যায়ের ধ্বজা জাহির করতে হবে না। দুবেলা ফিল্‌ম্ স্টারের আঁচল ধরে বেড়ানোতে দোষ নেই, যত দোষ ওই ছাপোষা গরীব ভগ্নিপতির জন্যে একটু তদবির করতে! ছি ছি—আমার মরণ হল না কেন। দাদা, তুমি শেষে এত ছোটো হয়ে গেলে! নিতান্ত নিস্পর মনে ক'রেও ত আমাদের কিছু উপকার করতে পারো?

প্রভঞ্জনের মুখের হাসি একটু একটু ক'রে ম্লান হ'য়ে আসছে। সে বলল—পরকে আপন করা সহজ, কিন্তু আপনকে ভুলতে ক'জন পারে? এই ধর মা, তুই কি আমাকে পর ভেবে নিয়ে এই অন্যায়ের জন্যে অনুরোধ করার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিস? পরের চেয়ে ঘরের লোক বেশি বিপদে ফ্যালে।

পার্বতী কান্নায় গুমরে উঠল। পরমুহূর্তে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল—প্রভঞ্জন ক্ষিপ্রতাসহকারে ওকে ধরে ফেলল। তারপর পার্বতীর সংজ্ঞাহীন দেহটা আস্তে আস্তে মাটির ওপর শুইয়ে দিয়ে, পাখা খুলে দিল। মা ব্যস্ত হয়ে নিজের ঘর থেকে একখানা হাত পাখা আর বালিশ নিয়ে এলেন।

প্রভঞ্জন বই পড়বার চশমাটা চোখ থেকে খুলে খাপে রাখতে রাখতে মায়ের দিকে চেয়ে বলল—হিষ্টিরিয়া হয়েচে তা এতদিন বলো নি ত মা! একবার নিধুকে চেম্বারে পাঠিয়ে দিও—ওষুধ দিয়ে দেবো। আপাতত মাথায় জল দাও ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

মেয়ের মাথায় বাতাস করতে করতে আর্ত দৃষ্টিতে প্রভঞ্জনের পানে তাকিয়ে মা বললেন—তুই কি বেরোচ্ছিস ?

—বলছি ত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি একবার চেম্বারে যাই, ওর ওষুধেরও ব্যবস্থা করতে হবে ত।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে চমৎকারিণী কি যেন বুঝতে চেষ্টা করেন। অবশেষে আর মনোগত ইচ্ছাটা দমন করতে না পেরে তিনি সহসা বললেন—ভেবেছিলাম জীবনে তোমাকে কোনো কিছুর জন্যে জুলুম করব না, কিন্তু এ সংকল্প বুঝি আর রাখতে পারি নে প্রভঞ্জন !

এক মুহূর্তে প্রভঞ্জনের সহজ সপ্রতিভ মুখের চেহারা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ঢেকে গেল, সে বললে—কিন্তু এ যে অন্যায়কে মাথায় তুলে দেওয়ার কথা !

—তুই দেখচিস একটা অন্যায়, কিন্তু তার জন্যে একটা পরিবার যে শাস্তি ভোগ করবে সেটা কি অবিচার নয় ? মুখের একটা কথায় এতগুলো প্রাণী যদি বাঁচে তবে সেটাই আমার মতে বড় সুবিচার করা হবে—তাতে ওইটুকু অন্যায়—

মায়ের কথার মাঝ পথেই প্রভঞ্জন বাধা দিয়ে বলে—ওইটুকু অন্যায় কাকে বলছ মা ? দেশের স্বার্থকে ছোট ক'রে দেখতে পারো কি করে ! জয়ন্ত যে অন্যায় করেছে আমাদের পরিবারের উপর—তার সেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছ পারুর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে। তারপর কত দফায় যে আমাদের অপমান করেছে, মুখ হাসিয়েছে জয়ন্ত—সে কথাও বাদ দিলাম। সে বেশ ভালো ক'রেই জানে যে, পার্বতীর খাতিরে তাকে বাঁচাতে আমি বাধ্য। কিন্তু তার সে প্যাঁচালো শয়তানী আমি এবার বরদাস্ত করব না। তাতে আমার যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন হ'তে দেবো। তুমি আমায় আর ব'ল না মা। আমি এখন সরে যাই। জ্ঞান হয়ে সামনে আমায় দেখলে সব কথা মনে পড়ে গেলে হয়ত আবার ফিট হয়ে যাবে।

প্রভঞ্জন বেরিয়ে গেল।

তার পিছু পিছু চমৎকারিণীও কয়েক পা এগিয়ে গেলেন, তারপর ফিরে এসে বসলেন মেয়ের পাশে। তাঁর দীর্ঘশ্বাসে নৈরাশ্যের রিক্ততা। শূন্য

ঘরখানির পাখা-চলার শন্ শন্ শব্দ বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আরও একটি দীর্ঘশ্বাস চমৎকারিণীর ফুসফুসের হাওয়া সব শেষ করে দিয়ে গেল।

জয়ন্ত। চোখেমুখে বুদ্ধির উজ্জল দীপ্তি। সে এক অন্যায় করল! পার্বতীর কথায় যতটুকু জেনেছেন তিনি, তাতে মনে হয় উপরওয়ালাদের চক্রান্তেই জয়ন্তর নামে নানা কুৎসা রটেছে। কিন্তু প্রভঞ্জন যে রকম ভাবে জয়ন্তর পক্ষ অসমর্থন করলে তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে জয়ন্ত গুরুতর একটা কিছু অন্যায় করেছে।

চমৎকারিণী এই সমস্যার কোনো সীমান্ত দেখতে পান না। ক্রমে তাঁর হাতপাখা চলা বন্ধ হয়—চিন্তার গভীরতায় তিনি মগ্ন হয়ে যান।

সহসা নীলাম্বরের গগনভেদী উল্লাস ধ্বনিতে বাড়িখানা চমকে উঠল—বাবা বাবা এসেছে। দিদিভাই দেখবে এসো বাবা এসেছে।

কে? জয়ন্ত এসেছে! চমৎকারিণী উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়লেন। মাথাটা ঘুরে গেল।

শচীন, নীলাম্বর, নীলিমা সবাই পিতাকে সঙ্গে নিয়ে কলরব করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল।

চমৎকারিণী ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন—তোমরা চুপ করো। মায়ের অসুখ।

জয়ন্ত শাশুড়ীকে প্রণাম করে মাটিতেই বসল। তারপর ঝুঁকে পড়ে পার্বতীকে একবার দেখে নিয়ে বললে—ও সেই পুরোনো ফিটের ব্যামোটা!" এক কাজ করুন মা, নাকের কাছে শুকনো লঙ্কা পোড়ার ধোঁয়া দিন, এক সেকেণ্ডে সেরে যাবে। আপনাদের ডাক্তারের বাড়ি, নাহ'লে টোটকা টুটকী ত আমাদের-দেশের পুরনো ওষুধ।

চমৎকারিণী ধীরে ধীরে বললেন—প্রভঞ্জন বলেছে আপনিই সেরে যাবে।

—আহা সে ত আজ হোক কাল হোক সব অসুখই সারে। তাই বলে একটা মানুষ কষ্ট পাবে এমনি করে?

চমৎকারিণী ম্লান হাসি হেসে বললেন—কিন্তু সেও তো বাবা খুব বাজে

লোক নয়, অন্য কোনো উপায়ে এ কিট সারানোর চেষ্টা করলে হয়তো বিপদ ঘটতে পারে! নইলে সে—

শাশুড়ীর কথা শেষ হবার আগেই জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলল—দাদা বুঝি বেরিয়ে গেছেন? যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি একবার।

চমৎকারিণী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—তুমি পারুর কাছে বরং বস বাবা। আমি যাই একটু ঠাকুর-দেবতার কাছে ছুটি নিয়ে আসি। আমি না ফেরা পর্যন্ত একটু থাকো, কেমন!

এক মুহূর্তেই চমৎকারিণী অন্তর্হিত হলেন।

ঠিক এই অবস্থায় জয়ন্ত যদি প্রভঞ্জনের সঙ্গে দেখা করে তাহলে চিরদিনের মত একটা বিবাদ পাকাপাকি হয়ে যাবে—চমৎকারিণীর বুকের মধ্যটা এই আশঙ্কায় ছ্যাৎ করে উঠেছিল বলেই তিনি ঠাকুর-দেবতার শরণাপন্ন হয়ে জয়ন্তকে আপাতত আটকে ফেললেন। এতে করে মাত্র বিপদের আসন্নতা কমল কিন্তু সম্ভাবনা অনিবার্যই রইল।

ঘণ্টাখানেক পরে চমৎকারিণী একটি রেকাবে কিছু ফলমূল এবং সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন—বড্ড দেরী হয়ে গেল বাবা, আটকে রেখে তোমায় কষ্ট দিলাম।

বলে তিনি চেয়ে দেখলেন জয়ন্তর মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। পার্বতী তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে উঠে বসল।

চমৎকারিণী মেয়েকে প্রশ্ন করলেন—কেমন আছো মা!

ঘাড় কাৎ করে পার্বতী বললে—ভালো।

জামাইকে বললেন চমৎকারিণী—যাও বাবা, হাতমুখ ধুয়ে এসে ঠাকুরের এই প্রসাদটুকু মুখে দাও। আর পারু, তুমি আর এখন উঠো না, এখানেই একটু গরম দুধ এনে দিচ্ছি, খেয়ে বিশ্রাম করো।

জয়ন্তকে নিশ্চলভাবে বসে থাকতে দেখে চমৎকারিণী মনে মনে বিচলিত হয়ে পড়েন—যাও, মুখ হাত ধুয়ে এসো বাবা জয়ন্ত!

মাথা না তুলেই জয়ন্ত জবাব দেয়—কিন্তু মা, আমায় আর অনুরোধ করবেন

মা [illegible] ঠাকুরের প্রসাদ আমার মাথায় রইল। এখানে জলগ্রহণ করবার উপায় নেই আমার

জোর করে হাসি টেনে এনে চমৎকারিণী বলেন—কী হলো বাবা! ভাই বোনে এখনো খুনসুটি করবে ওরা, তা ব'লে ওই পাগলীর কথা তুমি কানে তুলো না বাবা! আমি ত এখনো রয়েছি।

—আপনি বুড়ো হয়েছেন মা, আপনার মনে কষ্ট দিতে চাই নে। নইলে আর এক তিলও দাঁড়াতাম না। আমাদের বংশটা ছোটো নয়, আমাদেরও কিছু মানমর্যাদা আছে। আজ না হয় কপালের ফেরে আমি ব্যাঙের লাথি সহ্য করছি—তাই বলে কি বংশগৌরব ভুলতে পারা যায়!

চমৎকারিণী অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের কণ্ঠ সংযত করে বলেন—জয়ন্ত, তুমি বুদ্ধিমান, তোমার ওপর একটা সংসারের দায়িত্ব—ছেলেমানুষী করো না বাবা! মিথ্যে মাথা গরম ক'রে কিছু লাভ আছে কি? তার চেয়ে আমি বলি কি, একটু সুস্থির হও, আর আমিও ভেবে দেখি কিছু উপায় বার করতে পারা যায় কি না।

—না, মা। আমি এমনিতে আর জলগ্রহণ করব না এই আমার সংকল্প। তার আগে একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

—এত বেলায় বাসিমুখে গেলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে বাবা!

—আর্দ্র কণ্ঠে জয়ন্ত বললে—না, মা তা হতে দেবো না। আমার সর্বনাশ হতে বসেছে ব'লে যে আপনাদের অমঙ্গল হবে সে আমি সহ্য করতে পারব না। প্রসাদটুকুই আজকের শেষ আহার আমার। এই প্রসাদ ছাড়া আর কিছু খাবো না। আপনি জানেন না মা এদের কথা ভেবে ভেবে আমার শরীরের রক্ত শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। এই ধরুন'না, আসবার কথা ছিল শনিবার, কিন্তু কাল সারারাত বসে কাটল, ঘুম হল না। তাই ভোর বেলায় চলে এলাম। আপিসকাছারী কিছুতেই আর মন বসল না।

—অত ভেবো না বাবা, আমি বেঁচে থাকতে ওরা না খেয়ে মরবে না। আর প্রভঞ্জনও ত অমানুষ নয়।

—কেবল খাওয়াপরাই দেখলেন। মনটা কিছু নয়? ওদের মনে যে

[illegible] কে বুঝবে। [illegible]
বলবে।

চমৎকারিণী বিস্মিত না হয়ে পারেন না।

জয়ন্ত উৎসাহিত ভাবে প্রসাদের উপর বোঝ আনা সুবিচার করে এক গ্লাস জল নিঃশেষে পান করে স্বগতোক্তি করল—চা।

পার্বতী চায়ের ব্যবস্থার জন্তে উঠতে যাচ্ছে দেখে চমৎকারিণী বললেন—তুই দু'দণ্ড থির হয়ে বস, আমি দেখছি।

জয়ন্ত হেসে উঠল।

—এখানে তবু এতক্ষণ পাথরের মত বসে থাকতে দেখছি মা। আর আমাদের গোয়াড়ীতে হলে কখন হেঁসেলের কাজে লেগে যেত! এসব আরাম ধরতে গেলে গেরস্থালী চলে না মা! যাক্ না ও একটু চা করে আনুক।

পার্বতী চলে যেতেই জয়ন্ত চমৎকারিণীর দুটি পা জড়িয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে—মা, আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আপনার কাছে অস্বীকার করব না, চুরি আমি করেছি। ও রকম চুরি ত কত লোকেই করে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ—ধরা পড়ে গেলাম। যারা বড় বড় রুই কাৎলা তারা ত টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করল। কিন্তু আমাদের মত টিক্‌টিকি আরশোলাদের নিয়ে টানাটানি না করলে যে আবার ওপরওয়ালাদের কাজ দেখানো হয় না। আমাদের ধনেপ্রাণে মারবার ব্যবস্থা করছে তারা। দাদার পক্ষে একাজ করা শক্ত, কিন্তু আমার বাঁচবার অন্য কোনো পথ নেই। দোহাই মা, বাঁচান আমাকে।

চমৎকারিণীর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে অশ্রুধারায়। পা সরিয়ে নিয়ে তিনি জয়ন্তর ওষ্ঠপ্রান্তে ডান হাত স্পর্শ করে, হাতখানি চুম্বন ক'রে বললেন—একদিন ত বাবা তোমাকে সোনার চাঁদ ছেলে বলে ঘরে তুলেছি, আজও কি আর তোমার দুঃখ দেখতে পারব চুপ ক'রে। কিন্তু আমার ওপর ভরসা ক'র না বাবা! অন্তরালে থেকে যিনি সব মানুষের ভাগ্য চালাচ্ছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তোমার ভালো করুন তিনি।

পরক্ষণে জয়ন্ত সোজা হয়ে বসল। চমৎকারিণী আঁচলে চোখ মুছে বললেন

[illegible] নিশ্চিন্ত কাটছিল—আবার ওর শরীরটাও খারাপ হল। এমন দিনে তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে।

ডাক্তারখানায় বসে রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তার সরকারের মনটা আজ কেমন একটা শূন্যতার অব্যক্ত বেদনায় অবশ হয়ে পড়ছে। সকাল বেলার যে দিনের সূচনা হয়েছে আজ তাকে শুভারম্ভ বলা যায় না। অথচ এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ ছিল না। একটা যুদ্ধের ধাক্কায় জাতির, সমাজের দিকে দিকে যে ভাঙন ধরেছে তাকে নির্বিরোধে প্রশ্রয় দিলে একদিন মানুষ কোথায় তলিয়ে যাবে। ভবিষ্যতের ফলাফল জেনেশুনে একে মেনে নিতে পারবে না প্রভঞ্জন। এরা সবাই চলেছে অনিয়মের এক অন্ধ পথ দিয়ে কোন্ দিকে? এরা কি চায়? এদের লক্ষ্যহীন চলার অসংযমে কি তচ্‌নচ্‌ হয়ে যাবে এতদিনের গড়া মানুষের দর্শন, সভ্যতার সংজ্ঞা! একদল চলেছে আর্থিক ঐশ্বর্যের দিকে ধেয়ে—সোজা পথ দিয়ে যে পয়সা আসে তাতে এরা খুশি নয়; এদের চাই অজস্র অর্থ। আর একদল চলেছে—তাদের ক্ষুধাও অতি স্থূল ক্ষুধা। এখানেও সেই অধীর অদম্য লোলুপতার নগ্ন রূপ। অথচ সমাজ বিবর্তনের নিয়মে এই রূপটাও অনিবার্য।

এমনি অনেক কথাই ডাক্তারের মনকে নাড়া দিতে থাকে। এক সময়ে সে বুঝতে পারল, এই সব চিন্তার স্রোতে তার মন এতই হারিয়ে গেছে যে, রোগীদের দেখা এবং তাদের ঔষধপত্রের ব্যবস্থার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই, যন্ত্রবৎ এই কাজগুলো সে করে যাচ্ছে। নিজের এই অন্যমনস্কতায় সে বিরক্ত হয়ে উঠল—এ কী! এমন করে ফাঁকি দিয়ে সেও অমর্যাদা করছে মানুষের, যারা তার হাতে জীবনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে, তাদের।

ডাক্তার সরকার হঠাৎ উঠে পড়ল স্টেথোটা হাতে নিয়ে। কম্পাউণ্ডার ব্যস্তভাবে পিছু পিছু এসে জানাল—এখনও পাঁচ-ছ'জন বাকি রয়েছে স্যার সব দেখলেন না ত!

প্রভঞ্জনের প্রশস্ত ললাটে কতকগুলি সমান্তরাল কুঞ্চনরেখা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে—শরীরটা তেমন ভালো নেই।

একজন মধ্যবয়সী লোক কুণ্ঠিতভাবে জানালো—আমি স্যার, ওই মাঠ চাষপাড়া থেকে এসেছি। যদি একটু দয়া করে—

সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে ডাক্তার বললে—ও, আপনি সেই কোথাকার যেন জোতদারদের ঠিকেদারী করেছিলেন, না?

—আজ্ঞে সে আর বলবেন না স্যার। শালা জোতদারদের মদের খরচ যোগাতে যোগাতেই ফতুর, তার ওপর এখন উল্টো ধাক্কা খাচ্ছি। তবে হ্যাঁ ওই পেছনে লাথি খেয়ে যা খুদকুঁড়ো পেয়েছি তাতে একটা জীবন কাটবে কোনো রকমে, মানে ভালো ভাবেই।

—আপনি বরং কাল আসুন।

প্রভঞ্জন দৃঢ়পদক্ষেপে চলে গেল।

পরিবর্তন বৈঠকখানায় বসেছিলেন। প্রভঞ্জনকে দেখে খুশি হয়ে সরবে আহ্বান করলেন—এই যে ডাক্তারবাবু আসুন! তারপর, শরীরটরীর ভালো ত?

প্রভঞ্জন প্রত্যভিবাদন করে বললে—আপনি ভালো ত!

—আমার কথা বাদ দিন। সান্ত্বনার আজ চার-পাঁচ দিন জ্বর—শুয়ে আছে ও-ঘরে। অনেকবার বলেছি, আপনাকে খবর দেবার কথা, তা বলে, তার দরকার নেই, উনি সুস্থ হলে নিজেই আসবেন। আর যদি বলি আর কাউকে ডাকার কথা ত রেগেই অস্থির। অবুঝ মেয়ে নিয়ে বুড়ো বয়সে আমার দুর্ভাবনার শেষ নেই। যাক, আপনি এলেন ভালো হ'ল।

প্রভঞ্জনকে ঘরে ঢুকতে দেখে রমিতা বিছানার ওপর উঠে বসবার চেষ্টা করতেই পরিবর্তন ব্যস্ত হয়ে বললেন—তোমার ওই বড় দোষ, সান্ত্ব, ডাক্তার-বাবু বাইরের লোক নন। চুপ করে শুয়ে থাকো।

রমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। অবাধ্য রুক্ষ চূর্ণকুন্তল কপালের ওপর এসে পড়েছে। উঠে বসে বলল—এখন বেশ ভালো আছেন ত? ও কী, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে! এইখানে বসুন—ব'লে শয্যাপ্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করল রমিতা।

প্রভঞ্জন এগিয়ে এসে বলল—খুব অন্যায় করেছেন খবর না দিয়ে। ক'দিন হ'ল?

—সেই যে আপনার বাড়ি থেকে ফিরলাম, সে রাত্রে অনেক ঘোরাঘুরি করে প্রায় রাত একটার সময় ফিরেছি। সারারাত ঘুম এলো না। পরদিন থেকেই শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করছে—জ্বর সামান্যই।

—দেখি।

রমিতা হাত বাড়িয়ে দিলে। ওর শুভ্র সুডৌল হাতে সরু দু'গাছি চুড়ি চিক্ চিক্ করছে। কয়েকটি আঙুলের মধ্যে প্রভঞ্জন অনুভব করে রমিতার দেহে রক্তের গতি। দীর্ঘদিনের চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতায় এ রকম একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি তার কখনও হয় নি। আজ যেন রোগীর অবস্থা বোঝবার মত নিরাসক্ত মন নেই।

পার্বতীর বাঁকা ইঙ্গিতটুকু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—পার্বতীর চোখের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি মনে ভেসে উঠল, প্রভঞ্জনের আঙুলগুলো কেমন যেন শিথিল হয়ে এলো। অবশেষে নিজের অজ্ঞাতেই সে রমিতার মণিবন্ধ দৃঢ়ভাবে ধরল।

হাতখানা ছেড়ে দিয়ে প্রভঞ্জন উঠে দাঁড়াল। মনের মধ্যে যে প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠেছে তার কোনো চিহ্ন ব্যবহারে প্রকাশ পেল না।

রমিতা বলল—এখনই চলে যাবেন না।

পরিবর্তন সরবে জানাল—একটু কিছু খাবার করে দিতে বলি আপনাকে—। শুকনো দেখাচ্ছে বড্ড। সান্থ তোমার ত বার্লির সময় হল।

পরিবর্তন ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেলেন।

প্রভঞ্জন চশমা খুলে কাচ পরিষ্কার করতে করতে বললে—একটু ফলের রস খান। জ্বর—

তারপর নিজের ডান হাতখানা নিরীক্ষণ করতে করতে বলল—হ্যাঁ জ্বর ঠিক নয়। দুর্বলতা। কিছুদিন বিশ্রাম দরকার।

—আপনি ত ঘরে বন্দী রাখতে পারলেই খুশি। কিন্তু একা একা মন হাঁপিয়ে ওঠে। কিছুতেই পারি না—একা থাকলে মাথাটা কি রকম ভারি হয়ে ওঠে। নিজেকে বড় ভয় করে। মনে হয়, বুঝি বা পাগল হয়ে যাবো।

"এই যে ক'দিন শুয়ে আছি—শুয়ে শুয়ে সিঁড়ির দিকে কান পেতে রেখেছি কেউ এলে দুটো কথা কয়ে বাঁচি। কিন্তু তার উপায় নেই, বাবা ঠার পাহারা দিচ্ছেন, কেউ এলেই হাঁকিয়ে দিচ্ছেন।

প্রভঞ্জনের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে রমিতা ব'লে চলে—আপনি যে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে দেখতে আসবেন তা ভাবতেও পারি নি। আচ্ছা, কোনোদিন যদি আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় তাহলে আপনি চিকিৎসা করবেন?

প্রভঞ্জন এবারে রমিতার দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকায়। এ চাহনিতে সঙ্কোচ মাখানো।

-ওসব আজগুবি গল্প বাদ দিয়ে অন্য কথা বলুন। হেলাফেলাতে ত অনেক দিন বইয়ে দিলেন। সুখ পেয়েছেন কি?

-সুখ ত চাইনি। আমার জীবনের ব্যর্থতার বিষ চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি, এইটুকুই আমার বড় সান্ত্বনা—!

—তাতে কি লাভ?

—যুদ্ধে জিতে কি লাভ হয় বলতে পারেন? মানুষ যুদ্ধ করে। আমারও সেইরকম জয়লাভ হয়েছে।

রমিতার দিকে জিজ্ঞাসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কি যেন আবিষ্কারের চেষ্টা করে প্রভঞ্জন।

রমিতার রোগ পাণ্ডুর মুখে হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। ও বলে—একটা অনুরোধ আছে।

প্রভঞ্জনের স্বভাব-গাম্ভীর্য ফিরে এসেছে। তার এ দৃষ্টি সেই পুরনো, সহজ দৃষ্টি—বলুন।

—আপনি বার বার বিশ্রাম নিতে বলছেন। আমারও মনে হচ্ছে, বিশ্রাম দরকার। কিন্তু একা ফাঁকা সময় নিয়ে থাকা যে আমার পক্ষে কী যন্ত্রণা তা ত আপনার অজানা নয়। হাঁ, যদি এমন কোন মানুষের কাছাকাছি থাকতে পারি যার ওপর ভরসা করা চলে—সময়ে অসময়ে যার সঙ্গে সব কিছু নিয়েই আলাপ-আলোচনা করতে পারি, তাহলে,—

নির্লিপ্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রভঞ্জন জবাব দেয়—হ্যাঁ, তা পারেন ত খুব ভালো কথা। সে ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। আপনার মনে বাইরের হাওয়া লাগা দরকার। কি রকম জানেন—যেন এখন আপনার মনকে জোর ক'রে অনেক দিন একটা অস্বাস্থ্যকর ঘরে আটকে রাখা হয়েছে, তাকে বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়াই চাই।

—আপনি রাজি হলেই সব ব্যবস্থা করতে পারি।

—এতে আমার অমত থাকতে পারে না, অনেকদিন ধরেই ত বলছি বাইরে যান।

—জানি আপনি আপত্তি করবেন না। তা হলে আজ সন্ধ্যেবেলা একবার আসুন, পাসপোর্টের ব্যাপারটা জেনেশুনে নিই—আর কি কি নিতে হবে সঙ্গে, কোন্ জাহাজে আপনি যাবেন, সেইমতই সব ব্যবস্থা করা যাবে!

—পাসপোর্ট নিয়ে কি করবেন?

—কেন, বাইরে যাবো। আমার ইচ্ছে আমেরিকা পর্যন্ত যাই—হলিউড!

—দেশ ছেড়ে চলে যাবেন?

—আপনার সঙ্গে দুনিয়া ছেড়ে যেতেও আমি রাজি।

কথা শেষ করে রমিতা হাসতে হাসতে বালিশের উপর লুটিয়ে পড়ল। ওর কটাক্ষে তরল মায়ার মদিরা ছিল।

প্রভঞ্জন গাম্ভীর্যের বর্মটা যেন কঠিন করে তুলতে চায়।

স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে সে বললে—বিশ্রাম করুন। আমি এখন যাই।

চৈত্রের উন্মত্ত বাতাসের ব্যাকুলতা ওর কণ্ঠে বেজে উঠল।—না, না, এখনই যাবেন না।—

—আর বসতে পারব না, কাজ আছে।

কি এক রহস্যময় তাড়নায় প্রভঞ্জন আর এক মুহূর্তও এখানে স্থির থাকতে পারছে না। এমনিতেই আজ সকাল থেকে তার মন দোলাচল। পার্বতীর একটি ছোট আঘাতে তার ভাবস্থিতিতে দুর্যোগ লেগেছে। পার্বতীর কথাটা সে একনিমেষেই উড়িয়ে দিয়েছিল বালুকণার মত—কিন্তু এখন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে পার্বতীর কথা উড়িয়ে দেওয়া শক্ত।

রমিতার উজ্জ্বল হাসির রেশ সাদা ঘরখানার দেওয়াল ঝিল্-মিল্ করে এখনও, অথচ ওর মুখে-চোখে বিষণ্ণতা। রমিতা প্রশ্ন করে—ও বেলা আসবেন ত? সন্ধ্যেটা - না থাক, কাজ ক্ষতি করে আসতে বলব না।

—অভিমানের জাল দিয়ে আমাকে টানবার চেষ্টা করবেন না। আস

—তবে, আসবই একথা বলতে পারছি-না।

—অভিমান পর্যন্ত ধরতে পারেন, খুব আশ্চর্য ত!

রমিতার কণ্ঠে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা সুস্পষ্ট।

—তা পারি, তবে অভিমানে গলে যাবার মত নির্বুদ্ধিতা আমার নেই।

—পাথরে গড়া মানুষ বিরাট হতে পারে, বুদ্ধিমান হতে পারে কিন্তু দর হৃচ্ছে সোনা, সে সোনা এমনিতে যেমন শক্ত তেমনি মনের আগুনে গলে টল্ টল্ করে—আপনি সেই পাথর দিয়ে গড়া বিরাটত্বের মানুষ কাঠামো। আমি ভুল ক'রে মনের সোনা খোঁজ ক'রেছি আপনার মধ্যে।

রমিতার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছে।

প্রভঞ্জন সপ্রতিভভাবেই জবাব দেয়—পাথর হ'তে আপত্তি কী! হীরে ত পাথর!

—হীরে? না, আপনি কষ্টিপাথর। এই পাথরে মন যাচাই হয়।

—এটা কিন্তু ডাক্তারের পক্ষে বড় সার্টিফিকেট।

এ কথার জবাবে রমিতা তখনই কিছু বলতে পারল না, রমিতার কানের ইয়ারিং দুটো যেন একটু রক্তিম হয়ে উঠেছে। অস্তসূর্যের রক্তরাগে সূর্যমুখী ফুলের হলদে রঙে যেমন লালের আভা লাগে ঠিক তেমনি আভা!

রমিতার বক্রগ্রীবায় যেন প্রতিবাদের বাঁকা ভঙ্গি—বুদ্ধির দম্ভই মানুষের মনুষ্যত্বকে লুপ্ত করেছে; বুদ্ধিই তার সবচেয়ে বড় বাধা, তা জানেন!

প্রভঞ্জন ভারী গলায় আস্তে আস্তে সে কথার জবাব দেয়—এ ত আপনি বুদ্ধি-বিকারের কথা বলছেন। সহজ বুদ্ধি না থাকলে মানুষ থাকত?

—না তা থাকত না। তবে কি জানেন, অন্তর হচ্ছে কাঁচা সোনা, আর বুদ্ধি তার পালিশ—অন্তর আর বুদ্ধির সামঞ্জস্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য—এই সামঞ্জস্যের অভাবে মানুষ অমানুষ হয়।

—অমানুষ আর না-মানুষ কিন্তু এক কথা নয়।

—তা ত বটেই, বৈজ্ঞানিকও অমানুষ হতে পারে আবার জংলী অসভ্যও অমানুষ হতে পারে। তবে বৈজ্ঞানিকের অন্তরকে কুরে কুরে ফাঁকা করে বুদ্ধি ভরাট করার চেষ্টা হয়েছে, আর অসভ্য জংলীর মধ্যে বুদ্ধির পালিশ তেমন পড়ে নি। অসভ্য মানুষ নিজের সরল অন্তর দিয়ে যেটুকু দেখতে পায় তা ছোট হলেও সম্পূর্ণ। কিন্তু বিজ্ঞানীর বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় সে যা দেখে তারপরে আরও বেশি দেখবার জিজ্ঞাসা থাকে। একটা অতৃপ্তি অস্থির করে রাখে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিকে।

—এই অতৃপ্তি আর জিজ্ঞাসা না থাকলে বিজ্ঞান বড় হতে পারত না। ধ্বংসবুদ্ধি আর শুভবুদ্ধি ত এক নয়! তবে মনের দৃষ্টি যখন নিরপেক্ষ হয় তখন সে শুভাশুভের বোধকে অতিক্রম করে perfection-কেই বড় করে গ্যাখে।

—এ কথা কি করে বললেন? এ ত প্রলয়ের ইঙ্গিত। তবে কেন আজ—

—আমি তা বলি নি, সভ্যতার গতি বিশ্লেষণ করলে এ-ই পাই।

—ডাক্তারবাবু দোহাই আপনার, একটু অন্তর দিয়ে বিচার করুন। মানুষকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান বড় নয়।

হঠাৎ একটা কঠিন কথা প্রভঞ্জনের ঠোঁটের ডগায় এসে গেল। সে বলল—অন্যকে বলবার আগে নিজের জীবনকে বিশ্লেষণ করে দেখুন, আপনি কি বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে ঠকান নি?

রমিতা অবিচলিত ভাবেই উত্তর দিল—ঠিক বলেছেন, বুদ্ধি দিয়ে অনেককে নাচিয়েছি। সেটা কিন্তু অন্তরের অপমানে জলেপুড়ে তার প্রতিশোধ নেবার জন্যই। আর বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে গোছা বেঁধে ভালোবাসলে আজ আমার এই রকম জীবন হত না। এতদিনের জীবন দিয়ে জেনেছি যে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায় কিন্তু ভালোবাসে অন্তর দিয়েই। সেখানে বিচারবুদ্ধি অন্ধ। আপনি আজ আমার অভিমানকে সন্দেহ করে থাকতে পারেন। আর তাতে যে আঘাত পেলাম তাও আমার কাছে বড় পাওয়া!

বিচলিতভাবে প্রভঞ্জন বললে—রমিতা দেবী, যদি কোনো অশিষ্ট আচর
আপনাকে অসম্মান করে থাকি, তবে মাপ চাইছি। এখনকার মত চলি।

প্রভঞ্জন লক্ষ্য করে নি পরিবর্তন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। তাকে থাম
দেখে বলল—ও ঘরে যাবেন? না এ ঘরেই খাবার দেবে?

রমিতা বলল—বাবা, রোগীর ঘরে কাজো অন্যো খাবার এনো না। আমা
নজর লাগতে পারে।

এ কথায় সবাই হেসে উঠল। ঘরের হাওয়া এক নিমেষে বদলে গেল যেন

প্রভঞ্জনকে শুনিয়ে রমিতা বললে—বাবা, ডাক্তার সরকারকে একটু ভাে
করে বলো যেন আজ সন্ধ্যের দিকে আসেন। কি না হয় ডবলই নেবেন
আর হ্যাঁ, আমার বেড়ানো বলো, স্বাস্থ্য সঞ্চয়ই বলো আর ফিল্মের কা
শেখাই বলো—সব দিক দিয়ে সমুদ্রযাত্রাই প্রশস্ত, বুঝলে বাবা।

ডাক্তার সরকার হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে. নিজের চোখকে যে
বিশ্বাস করতে পারে না। এরই মধ্যে এত বেলা কি ক'রে হ'ল। আর এ
মুহূর্তও দাঁড়ালে চলে না। পার্বতীর শরীর খারাপ, মা শুকিয়ে বসে থাকবেন।

সিঁড়ি দিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সে নীচে নেমে এলো এবং গাড়িে
স্টার্ট দিল, গাড়িখানা ঝড়ের বেগে চলতে শুরু করল। সেই মুহূর্তে য
প্রভঞ্জন উপর দিকে তাকাত তাহলে দেখত জানালায় সপ্রশংস চোখে অপলক
দৃষ্টিতে কে দাঁড়িয়েছিল।

চমৎকারিণী সোজাসুজিই ছেলেকে বললেন—আমার এ কথাটা কিন্তু তু
ঠেলতে পারবি না। হোক অন্যায়, তবু একবার আমার মুখ চেয়ে এ অন্যায়ট
তোর গায়ে মাখা চলবে না প্রভু।

—কী বলছ মা? তুমি জানো, ভয়ঙ্কর কাণ্ড?

—জানি না, জানতে চাইও না আমি! শুধু এটা জানি যে এ যাত্রা ওবে
রক্ষা করতেই হবে—

—যদি সব জানতে তাহলে তুমি আমায় এ কাজ করতে বারণ করতে মা।
তবে শোনো—

—কিন্তু তারি আগে তুই কথা দে, ব্যবস্থা করবি। আমি অতশত বুঝি নে বাপু—

—কথাটা আগে শেষ করি। জালিয়াতী করে ওদের একটা দল গভর্ণমেন্টের দু'কোটি টাকা সরিয়েছে। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি, এর মধ্যে অনেক বড় বড় রুইকাৎলা জড়িত। আসল ব্যাপারটা বাইরে প্রকাশ পেলে ত দুর্নাম রটবে, সেইজন্যেই খবরটা চাপা আছে। শুধু এই একটাই ব্যাপার নয়। এই ক' বছরের যুদ্ধে আরও কতই যে কাণ্ড হয়েছে! জানো না তোমার ওই এন্‌-কে ঘোষের মামলাটা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চমৎকারিণী স্তিমিত কণ্ঠে বললেন—থাক বাবা! ওই দুঃখে আজকাল কাগজ পড়াই ছেড়েছি। কাগজ খুললে চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। দেশময় যখন এই রকম অনাচার চলেছে তখন তুই কি একাই ঠেকিয়ে রাখতে পারবি? মাঝখান থেকে বেচারী জয়ন্তের দুঃখে পারুটার যদি শক্ত কিছু অসুখ দাঁড়িয়ে যায়, আমি তা চোখে দেখতে পারব না বাবা!

—মা!

প্রভঞ্জন আবেগ কম্পিত কণ্ঠে চমৎকারিণীর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকায়। চমৎকারিণী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করেই বলেন—বুড়ো বয়সে আমার ভীমরতি হ'য়েছে রে! কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি বাবা!

—কাকে, কি কথা দিয়েছ মা!

—জয়ন্ত যখন আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল তখন নিজেকে শক্ত রাখতে পারলাম কই।

—কিন্তু মা, আমার কথাটা তুমি একেবারে ভাবছ না!

—তুই সত্যিই বিশ্বাস করিস তা?

—যদি সত্যি আমার কথা ভাবতে তাহলে ওদের দলে আমায় ঠেলে দিতে পারতে না! তুমি ত জানো মা ডরোথীকে যেদিন বিদায় দিয়েছি সেদিন আমার মনকেই হত্যা করেছি। সে সময়ে তুমিই বলেছিলে ধর্ম বড়। আমি যখন বলেছিলাম, 'মা আমার মনটা নয় তোমার পায়ে উৎসর্গ করলাম কিন্তু আর একটি অন্তর যে আমার জন্যে নিজের সমাজ স্বদেশ স্বজন সব কিছুই বিসর্জন

দিতে ব্যগ্র—তার কি হবে?' তুমি তখন বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে বলেছিলে—পিতৃপুরুষের মুখচেয়ে তাকে ত্যাগ করতেই হবে। ধর্ম তোমায় রক্ষা করবেন।'…আর আজ মেয়ে-জামাই-এর স্বার্থে ধর্ম নেই? তোমার ধর্ম এত স্বার্থপর কেন?

চমৎকারিণীর চোখে আর অশ্রু নেই। তাঁর মুখে একটা শুষ্ক আদেশের কাঠিন্য ফুটে ওঠে; তিনি বলেন—তর্ক করতে চাই না বাবা। যা বলেছি মেনে নিতে পারবে কিনা শুধু সেইটুকু জানতে চাই! তারপর আমি আমার ব্যবস্থা করব।

—ভয় দেখিয়ো না মা! অন্যায় করা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমায় দিয়ে হবে না।

—তবে এ সংসারে আমার অন্ন উঠল আজ থেকে।

—সংসার কার? বরং বলো, আমাকেই তাড়িয়ে দিতে চাও।

অকস্মাৎ চমৎকারিণী ছেলের হাত চেপে ধরলেন।

—খোকা, তুই অমন করে আঘাত দিস নে মায়ের প্রাণে! কথা ফিরিয়ে নে। ফিরিয়ে নে কথা। শেষ জীবনটা শান্তিতে মরতে দে খোকা! তোকে ব্যথা দিয়ে আমি কি সুখে আছি। মায়া বড় কঠিন রে! একবারটি মায়ের দুর্বলতাকে মানিয়ে নে। এভাবে আমাকে ছোট করলে মুখ দেখাবো কি করে?

প্রভঞ্জন মায়ের দিকে তাকাতে পারে না, অন্য দিকে চেয়ে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু তার হাতের তালুতে পড়ল। তার স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন গভীর রাত্রির বেহাগ সুর ধ্বনিত করে বলল —বেশ তাই হবে! কিন্তু মা, এরপর আমারও নিজেকে সোজা রাখা শক্ত হবে—তখন কিন্তু দোষ দিও না।

এই কয়েক মুহূর্তে প্রভঞ্জনের মনোজগতে যে ওলট পালট ঘটে গেল, তাকে বৃহৎ যুগান্তর বললে ছোট করা হয়—এ যেন ব্যক্তিত্বের রূপান্তর।

দিবানিদ্রার পরে বৈকালিক চায়ের কাপ হাতে করে প্রভঞ্জনের ঘরে ঢুকে অনন্ত জানালার ওপর কাপটা রেখে যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তখন

প্রভঞ্জনের কপালে দীর্ঘ কয়েকটি কুঞ্চনরেখা প্রকট হয়ে উঠেছিল। কোনো কথা বলে নি, একটা কঠিন হাসি হেসে সে পুনরায় বই-এর মধ্যে ডুবিয়ে দিল নিজেকে।

জয়ন্ত বলল—শরীর ভালো আছে ত দাদা! চেহারাটা কেমন ধসে গিয়েছে মনে হয়।

—হুঁ। বিধাতা বোধ হয় সবাইকে ভালো রাখতে পারেন না, কি বলো? টেবলের ওপর বইখানা রেখে প্রভঞ্জন ফিরে তাকিয়ে বলল।

জয়ন্ত একটু অপ্রতিভ হয়ে যায়, অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সে বলে—দাদা, আপনি যেন বিধাতারও ভুল ধরছেন। আজকাল বুঝি মনঃসমীক্ষণ শক্তি খুব এগিয়ে গিয়েছে!

—তাতে আর সন্দেহ কি! তবে এ শাস্ত্রে ডাক্তারদের চেয়েও বড় এক বিজ্ঞানী দল এগিয়ে গেছে—তাদের মানসিক সংজ্ঞা জুয়াচোর, জালিয়াৎ এবং সামাজিক পরিচয় ভগ্নিপতি, জামাই—মানে পরম আত্মীয়!

এতখানি ধাক্কা সামলানো যে কোনো মানুষের পক্ষেই শক্ত—বিশেষ করে জয়ন্তর মত লোকের চায়ের কাপ হাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় আরও অসম্ভব। সে স্বভাবসঙ্গতভাবে জবাব দিল—খবরদার, মুখ সামলে—!

—বাঃ, চমৎকার! এরপর কি গলায় হাত দেবে?

—আপনি অপমান করছেন তা জানেন?

—তাই নাকি? সে আবার কি বস্তু হে?

—তার মানে?

—চুরি করবার সময় মনে থাকে না?

—চুরি? চুরি কাকে বলেন! সংসারে চলতে গেলে টাকার দরকার হয়ই—সেই দরকারের জন্যে যদি টাকা রোজগার করি তবে সেটা চুরি হতে পারে না।—আমি যদি চোর হই আপনি তাহলে দুশ্চরিত্র।

প্রভঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তোমার কাছ থেকে চরিত্রের সার্টিফিকেট কেউ চায় নি। বিষদাঁত ভাঙবার ওষুধ আমার হাতে। এ ভাবে আমাকে চটিয়ে দিলে তোমারই ক্ষতি।

সকাল বেলা বাগানে বড় জাজিম বিছিয়ে বসবার ব্যবস্থা হয়েছে। পাশের বস্তির সাঁওতাল মাতব্বরও এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে তোয়াজ করছে সবাই, তার হাতেই নাকি আহার্য বা পানীয় সব-কিছুরই ব্যবস্থা!

কাজের কথাটা নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। একমাত্র অনুকূল বার-কয়েক চেষ্টা ক'রে অবশেষে হতাশ হয়ে বললে—যাঃ গেল! এরা কি এখানে গিলতেই এসেছে?

ব্রজেন বললে—তা ছাড়া আর কি!

এমন সময় যতীন চৌধুরী ঠোঁটে পাইপ লাগিয়ে এসে দাঁড়াল। সকলেই কণ্ঠস্বর সংযত ক'রে সম্ভ্রম প্রদর্শন করলে।

অনুকূল যতীন চৌধুরীকে বললে—তাহলে আর মিথ্যে গুলতুনি না ক'রে আমরা ফরেষ্টের দিকে যাই।

যতীন খুশি হয়ে বললে—এই ত চাই। I admire you? অনুকূল মানেই কাজ! তা তোমরা কোথায় যাবে!

ব্রজেন কথার খেই ধরে জবাব দেয়—এই আশপাশে একটু টিলা আর জংলা জায়গা দেখে সেখানেই—

অনুকূল বাধা দিল—না না, সে হ'তে পারে না। দশ বারো মাইলের মধ্যেই বেশ পাহাড়-জঙ্গল আছে। ধরুন সেখানকার ছবি যা হবে দুর্ধর্ষ!

যখন সকলেই বাসাডেরা পাহাড়ে শুটিং-এ যাবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে বেরুতে যাবে ঠিক সেই সময়ে যতীন চৌধুরী রমিতার অত্যধিক উৎসাহের প্রতিবাদে বললে—আপনি যাই বলুন, মিস মজুমদার, আমার কিন্তু বনজঙ্গলে যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই। সেখানে দেখবার মত কি আছে?

—আশ্চর্য, আমি যে ঠিক তার উল্টো কথাই ভাবছি। ঘাটশিলায় এসে অবধি এখান থেকে ওই যে নদীর ওপারে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওখানে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে যতীন বাবু!

ব'লে বিস্মিতভাবে রমিতা যতীন চৌধুরীর দিকে তাকাল।

যতীন চৌধুরী কলকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী! বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক তালিকার মাথায় তাঁর নাম দেখতে পাওয়া যায়। এরকম জংলা জায়গায় তিনি আসেন না, দিল্লী বোম্বাই-এর চোস্ত চেহারা দেখতেই অভ্যস্ত। হঠাৎ এবার কয়েকটি লোকের অনুরোধে একটি চলচ্চিত্রের কাজে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন। রমিতাকে পাহাড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখে তিনি পাইপ থেকে ঠোঁটটা মুক্ত করে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটু হেসে বললেন—ওটা আজকালকার ফ্যাশন। মানুষ যত বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলেছে ততই একদল লোক চীৎকার করছে, দাও ফিরে সে অরণ্য! আসলে বিভূতি বাঁড়ুয্যের বই পড়ে পড়েই আপনাদের বন দেখবার বাতিক গজিয়েছে মিস্ মজুমদার! জঙ্গল মানেই এঁদো অন্ধকার আর সাপখোপের আড্ডা। সেখানে মানুষ কেন যাবে? কি দেখতে? হ্যাঁ মেট্রো সিনেমায় বসে টার্জানের জংলা ছবি দেখতে আমারও ভাল লাগে। কিন্তু তাই ব'লে সেই বনবাদাড়ের জন্যে পাগল হতে হবে তার কোনো মানে নেই। মানুষের সভ্যতা তাকে সুন্দরতর জীবনের অধিকার দিয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষ থাকবে নিজের হাতে গড়া সভ্যতার সম্পদে। সমাজে তার কত কাজ—শুধু বনে যাবার জন্যেই বনে যাওয়ার কোনো মানে নেই। মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য ত অস্বীকার করতে পারেন না।

রমিতা হেসে ওঠে, বলে—আচ্ছা বলুন ত, মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কতটুকু? চৌধুরী মশাই, আপনি যেভাবে পশুর ছোঁয়াচ বাঁচাতে চেষ্টা করছেন তাতে ভয় হয় বুঝি মানুষের কৌলিন্যটা খুব ঠুনকো।

যতীন চৌধুরী দাঁতে পাইপ চেপে বলেন—বন জঙ্গল নয়, সৃষ্টির স্বপ্নই ত মানুষকে এত বড় করেছে। শুধু-চোখে দেখার দৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যে কল্পনা ধাবমান এগিয়ে যায় তাকেই বলে পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার পিছনে থাকে

ভবিষ্যতের স্বপ্ন। একটা কিছু গ'ড়ে তোলার জন্যেই চাই সেই গভীর দৃষ্টি। সে দৃষ্টি বাইরের রূপের মোহ কাটিয়ে ভেতরের ঐশ্বর্যকে অনুসন্ধান করতে চায়। যে মানুষ ব'সে ব'সে শুধুই পরের কাজের তারিফ করে, তাকে আপনি সমঝদার বা রসিক বলতে পারেন কিন্তু আমি বলব অকর্মণ্য। তার কিছু গড়বার নেই, তাই প্রকৃতিকে বাহাদুরি দিয়ে নিজের একটা বৈশিষ্ট্য আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু জঙ্গলের বাহ্যরূপটুকুর মোহ কাটিয়ে যে মানুষ প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে পেরেছে সে-ই ত মানুষের মত মানুষ।

—অবিশ্যি অভিযান ক'রে যাঁরা মাটির মধ্যে সোনার সন্ধান পেয়েছেন তাঁদের দুঃসাহস আর দূরদৃষ্টিকে সম্মান করা উচিত। তাই ব'লে সুন্দরের মায়াকে তুচ্ছ করবার কোনো যুক্তি নেই যতীন বাবু। যারা দেশ জয় করে কেবল নিজেদের বিলাস স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, সামান্য নিজের সুখের জন্য যারা অন্য কোনো মানুষকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে যেতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি সেই বণিকের শেখানো কথাই আপনি বলছেন। তারা একদিন সমুদ্র তরঙ্গ অগ্রাহ্য ক'রে এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করবার জন্যে। তাদের লোলুপতাই বনের সুন্দর শ্যামল রূপকে দেখতে দেয় নি—মাটির বুকে যে রস সঞ্চিত ছিল সেটুকু শোষণ করবার জন্য শ্যেন দৃষ্টি দিয়েছে তারা। আপনারও কথায় সেই লোলুপ মানুষকেই দেখছি।

যতীন চৌধুরী অবজ্ঞাসূচক হাসি দিয়ে রমিতার কথাকে লঘু করতে চান।

চা জলখাবার আসতেই সকলে আহার্যের প্রতি সুবিচারে মনোযোগ দিল। একটি চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। অনুকূল কিছু খাদ্য রমিতার দিকে এগিয়ে দিল। ব্রজেন সেটা লক্ষ্য করে বললে—মশাই, আর দেরি করা ঠিক নয়। এখান থেকে বারো মাইল পাহাড়ী রাস্তা, একটু সময় হাতে নিয়ে বেরুনো দরকার। অনুকূলবাবু আপনার ক্যামেরা আর পাঁয়তারা গুছিয়ে রেখেছেন ত।

অনুকূল বললে—আমার জন্যে কারুর ঠেকবে না, এখন আপনারা হুকুম করলেই রওনা দিতে পারি। আমার এস্টেটপত্তর লরীতে ওঠানো হয়ে গেছে।

—ও, তাই নাকি, তবে আমার ক্যামেরা, রিভল্বার আর বাইনাকুলারটা নিয়ে আসি।

রমিতা সবার আগে লরীর উদ্দেশে পা বাড়ায়।

যতীন চৌধুরী বলেন—মিস মজুমদার বনে গিয়ে কি-এত শান্তি পাবেন? শেষে সেখানে তপস্যায় লেগে যাবেন না যেন। আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে সঙ্গে যাই।

—না, না, তাতে আবার আপনার নিজেকে হারানোর ভয় আছে, নইলে আমার পাশেই বসতে বলতাম। নাঃ থাক, বারো মাইল উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ, দুপুরের কাঠফাটা রোদ, খাওয়া-দাওয়ারও কিছু ঠিকঠিকানা নেই—আপনি পারবেন কেন সহ্য করতে!

ব্রজেন দত্ত রিভল্‌বার ঝুলিয়ে বেশ বীরোচিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বল্‌লে—এই ত বীরাঙ্গনার কথা। যতীনবাবু, রমিতা মজুমদারকে তর্কে ঠকানো খুব সহজ কাজ নয়। কলেজে ও তর্কের লড়াইতে পুরস্কার পেয়েছিল। ভাবুন একবার, এক কলেজ মেয়েকে হারানো যে-সে কাজ নয়। ছেলেরা তর্ক করতে পারে কিন্তু সে তর্কে থাকে যুক্তি, আর মেয়েদের যাকে বলে এঁড়ে তর্ক। এঁড়ে-তর্কশাস্ত্র রীতিমত কঠিন। কাজেই—

যতীন বললেন—সত্যিই ভয় হচ্ছে, বাংলার এমন একটা প্রতিভা বাঘের পেটে চলে যাবে? ভালয় ভালয় ফিরে আসুন! তেমন বয়েস থাকলে নিশ্চয় বন্দুক বাগিয়ে আপনাকে আগলাবার জন্যে যেতুম।

ব্রজেন হেসে বললে—থাব্‌ড়াচ্ছেন কেন। আমার হাতে অগ্নিবান থাকতে বাঘভালুকে কিছু করতে পারবে না। আসুন না যতীনবাবু—আমি একাই একশ'। আপনারও দায়িত্ব নিচ্ছি।

যতীন বললেন—যদি যাই তবে অবিশ্যি ব্রজেনের ভরসায় নয়। কাজ নেই, তোমরা যাও, আমি আজ বিশ্রামই করি।

অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ সুরে যতীনবাবু রমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ লাগছে এখানে আলস্য করতে। আমার মতে, রমিতা তুমি না গেলেই পারতে! তোমার ও-ছবির টেকিং কেটে-জুড়ে 'সেট' করা ষ্টুডিওতে বসে ব'সেই হয়ে যাবে। থেকেই যাও। বনে বনে টো টো করে ঘুরলে মিথ্যে হয়রানি হবে, শরীরটাও খারাপ হবে, রঙ কালো হয়ে যেতে পারে।

রমিতা ঘোরতর বেগে ঘাড় নেড়ে বলে—রং-এর জন্যে অনেক করেছি চৌধুরী মশাই। ওতে রস পাই নে আর।

—কিন্তু সে জন্তুজানোয়ারের রাজ্য। জানো, লাকাইসিনির জঙ্গলে হাতী থাকে। আমার মতে এসব risk না নেওয়াই ভালো। নামজাদা একজন সাহিত্যিক কিন্তু বলেন Beauty with safety and comfort is ideal, মানে, আরামই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য! আর নিরাপত্তা ত গভর্ণমেন্ট আইন ক'রে বজায় রাখতে চায়। তাহলেই বোঝো—

বেশ ঝাঁঝালো গলায় রমিতা বলে—আপনার কথায় মনে হ'চ্ছে লেখক নিতান্তই সাহিত্যের অধ্যাপনা ক'রে থাকেন, অথবা খবরের কাগজের সম্পাদক। এক কাজ করুন, ওই ভেতো লেখকটিকে বরং কিছু মূলধন দিয়ে কারবারে নামিয়ে নিন। টাকা মার যাবে না, অবিশ্যি এটাও ঠিক একটা কানাকড়িও মুনাফা হবে না। একটি অনুরোধ করে যাই, একবার সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বেড়াতে যাবেন,—খুব কাছেই ত! সেখানে সৌন্দর্য আছে, বিপদেরও ভয় নেই! ভাত ত হজম হবেই। আর দেখবেন আপনার পূজ্যপাদ আই. সি. সি কি ভাবে সুবর্ণরেখার গলায় পা দিয়ে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। জয় বিজ্ঞানের জয়—নদীর জলে চড়া পড়েছে, জলের রং কালো হয়েছে আপনাদের বিজয় কলঙ্কে। আপাততঃ আপনার মহামূল্য জীবনকে নমস্কার ক'রে বিদায় নিই।

ব্রজেন প্রতিবাদ করে—আপনার জীবনেরই মূল্য কি কম, মিস্ মজুমদার! আপনার জীবন এত অকিঞ্চিৎকর হলে যেতাম না।

রমিতা ঘাড় বাঁকিয়ে তির্যক কটাক্ষে কৌতুকের লহর তুলে বললে—বলেন কি, আপনি আমার জীবনের দায়িত্ব নিচ্ছেন? হাবভাব দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে দেহরক্ষী হয়েই চলেছেন ব্রজবাবু!

—আজ্ঞে দেহরক্ষীও বলতে পারেন!

—তাই বলুন, দেহের আমার কিছু দাম আছে। জীবনের কোন মূল্য নেই।

ব্রজেন বাধা দিয়ে বললে—আপনার ওপর অনেক আশা ফিল্ম্ ইন্ডাস্ট্রীর, কাজেই এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারব না।

আজ পারছেন না, দু'দশ বছর পরে পারবেন—যখন আমার দেহের জৌলুষ নিভে যাবে তখন।

ওদিকে অনুকূল গাড়ি থেকে চীৎকার করছে শোনা গেল—কই, আপনারা যাবেন নাকি ব্রজেন-দা, রমিতা-দি আসুন!

বি. এন. আর লাইন পার হয়ে দু'খানা লরী গালুডি যাওয়ার গৈরিক-মেনাঞ্চল-বিছানো পথটুকু বাঁদিকে রেখে সামনের জঙ্গলে প্রবেশ করল। সকালের তরুণ রোদের মায়াতে কিশোরীর কোমলতা, সংকীর্ণ পথের পাশে ইতস্তত ছড়ানো পাথরের গায়ে শিশিরের রেণুগুলি তখনও শুকিয়ে যায় নি। পাতায় পাতায় বনের সবুজ সৌরভ। এখানে সভ্যতা ফুরিয়ে গেছে। শালের জঙ্গল—তার মধ্যে দিয়ে অসংস্কৃত পথ, উঁচুনীচু। আশপাশে বসতির কোন চিহ্ন নেই। লরীর হৃৎস্পন্দনের প্রতিধ্বনি পাথরের বুকে ধাক্কা লেগে ফিরে আসছে।

বুরুডিপাস ছাড়িয়ে গাড়ী আবার নীচে নামল। মনে হ'ল ওঠানামার পালা বুঝি এখানেই সমাপ্ত। সমতল। ব্রজেন এতক্ষণ বুরুডির অপূর্ব সৌন্দর্য উচ্ছ্বাসের দৈন্যে বিধ্বস্ত করছে। রমিতার কানের কাছে অনবরত 'আহা, উহু' ক'রে উত্যক্ত ক'রেছে। সমতলে এসে নামতে তার মুখরতা ক্ষান্ত হয়। মোটেরের গর্জন কমল।

সকলে নড়েচড়ে সহজ হয়ে বসল। রমিতাকে অনুকূল প্রশ্ন করে—রমিতা-দি, অস্বস্তি হচ্ছে না ত!

রমিতা শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়। ও যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না। ওর মন এ রাজ্যে নেই।

অনুকূল বলে—পাহাড়ে উঠ্‌তে নাম্‌তে গা ঘুলিয়ে বমি আসে কি না।

সে কথারও কোনো জবাব এল না রমিতার তরফ থেকে।

গাড়ি আবার গর্জন করতে করতে উপরে উঠ্‌তে শুরু করেছে। রমিতার চোখেমুখে শূন্য অভিব্যক্তি আরও ঘনিয়ে এল, আরও নিবিড় হয়ে। দেখ্‌লে মনে হয় ওর বাহ্যজ্ঞান নেই। কি এক স্বপ্নের ঘোরে ও বিভোর।

এক এক জায়গায় গাড়ির গতি এত মন্থর হয়ে আসে, মনে হয় থেমে যাবে, পাহাড়ের চড়াই এখানে সরল রেখার মত খাড়া উপর দিয়ে উঠে গেছে। লরীটা আস্ফালন করছে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে, যেন হাঁপিয়ে গেছে। ড্রাইভারের মুখচোখে একটা হিংস্রতা ফুটে উঠেছে। পাহাড়কে সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছে।

কিছুদূর এসে গাড়ি থেমে গেল। ড্রাইভার বল্‌লে—বাবুসাহেব গাড়ি আর যাবে না, পথ এখানে খতম।

সামনে কোনো রাস্তা নেই। ঠিকাদারেরা জঙ্গলের গাছ কাটতে কাটতে এই পর্যন্ত এসেছে এবং কাঠ নিয়ে যাবার জন্য তারাই রাস্তা তৈরী করেছে। দেখা যাচ্ছে এখানে আরও গোটা দুই লড়ী দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ পথে কোনো জনচিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি, কেবলমাত্র ফুলখোর যাবার পথটা যেখানে অন্যদিকে চলে গেছে, তার কাছাকাছি দু'তিনটে খোলার কুঁড়ে নজরে পড়েছিল। ওপরে গাছ কাটা হচ্ছে, তার ঠক্‌ঠক্ শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে পাহাড়ের ঘন অরণ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কাঠুরিয়াদের মিলিত কোলাহল অরণ্যের স্তব্ধ মৌনতাকে উচ্চকিত করে তুলছে। একখানা গোরুর গাড়ি এক পাশে পড়ে আছে।

বনকাটাদের একজন লোক এদের লক্ষ্য করে আপন মনেই বেশ জোরে জোরে বলে—এরা আবার এখানে কেন?

অনুকূল জবাব দিলে—এই বেড়াতে এলাম একটু।

লোকটি আশা করে নি বাবুরা তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারেন সে অনুকূলের দিকে অপ্রতিভভাবে চেয়ে রইল। তারপর সলজ্জভঙ্গিতে খাটো কাপড়খানা টেনে হিঁচড়ে হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে বলল—শিকার করতে এসেছেন, ত' মেয়েছেলে সঙ্গে কেন?

ব্রজেন বল্‌লে—উনিও ভালো শিকারী!

তারপর আড়চোখে রমিতার দিকে তাকাতেই ওর কৌতুকময়ী দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়।

একটু ভিতরে ঢুকে মনে হ'ল এখনও এখানে দিনের খবর পৌছয় নি; যেন

কোথাও রৌদ্রের বিন্দু পর্যন্ত এসে পড়ে নি। আশপাশে বুড়ো বড় গাছ। রমিতা সব গাছ চেনে না, চেনে শুধু শাল গাছ। তা ছাড়া যেসব গাছ দেখা যাচ্ছে সেগুলি অপরিচিত। গাছের গায়ে গায়ে অপূর্ব লতাগুল্ম! যেন তপস্বী কোনো বন-ঋষির মাথায় জটাজুট। দু'পাশে কালো রুক্ষ গম্ভীর পাথর দিয়ে ঘেরা পাহাড়, সেই পাথরের রুক্ষতাকে স্নিগ্ধশ্যাম সৌন্দর্য দিয়ে কামনার মত জড়িয়ে রয়েছে নাম-না-জানা অজস্র লতা, গাছ আর ফুল ফল। অরণ্য। এ কোন্ পৃথিবী!

রমিতা বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়।

অনুকূল বল্লে—আমরা এখানেই কাজ সারতে পারি, তবে মনে হচ্ছে আর একটু ওপরের দিকে গেলে পাহাড়ের মাথায় পৌছনো যেতো। এর চেয়ে সেসব জায়গা ভালো।

ব্রজেন রিভল্‌বারটা একবার হাত দিয়ে অনুভব ক'রে বলে—আবার ওপরে কেন? এখানেও তোমার dense forest—! বাবা এসব কেন্দানী কায়দার কোনো দরকার ছিল না। কত যে পাহাড় পর্বতের ছবি কলকাতায় ব'সে ব'সে উঠে গেল তার ঠিক নেই।

কিন্তু অনুকূলের উৎসাহের আতিশয্যে ব্রজেনের ক্ষীণ আপত্তি পরাস্ত হ'ল। দু'জন কুলী ওদের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আগে আগে চল্ল। পথ ব'লে তেমন কিছু নেই। পায়ে চলা বন-পথ। লোক চলাচলের কোনো চিহ্ন নেই। সর্বত্রই জঙ্গল। তবে এ অঞ্চলের অরণ্যের বৈশিষ্ট্য, ছোটখাট আগাছার ভিড় বড় একটা নেই। মহীরুহের সমারোহ।

ওদের সঙ্গে এ অঞ্চলের একজন পাহাড়ী ক্রীশ্চান 'ফরেষ্ট গাইড' রয়েছে। সে-ই পথ দেখিয়ে চলেছে। ব্রজেন তাকে প্রশ্নবাণে অস্থির ক'রে তুলেছে—আচ্ছা এখানে এই সময়ে বাঘ বেরুতে পারে না? কত বড় বড় সাপ আছে? গাঁয়ের মধ্যে ভালুকে কুল খেতে যাবে, সত্যি নাকি?

এবং লক্ষ্য করলে দেখা যেত ব্রজেনের একটি হাত সদাসর্বদা রিভল্‌বারের গা ছুঁয়ে আছে।

খানিকদূর ওঠবার পর অন্ধকার অনেকটা হাল্কা হয়ে এল! অনুকূল

এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি, সে হঠাৎ ব'লে উঠল—শুনলেন ব্রজেনবাবু, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কিছু একটা চলে গেল!

গাইডটি বললে—কিছু নয়, হয়ত বনমুরগী হবে। এ সময়ে ভারী শিকার বড় একটা বেরোয় না।

ভারী শিকার বলতে সাধারণত বাঘ নেকড়ে ভালুক ইত্যাদি

ব্রজেন বললে—বলা যায় না। আর এগোবার দরকার কি?

গাইড মোরেন বললে—আর একটু উঠলে আপনারা ধারাগিরির আসল মুখটা দেখতে পাবেন। নীচে যে ধারাগিরির ঝরণা দেখেছেন তার মুখ এই ওপরে। এখান থেকে জল নামছে।

রমিতা বলে—বেশ ত, গেলেই হয়।

মোরেনকে একটু চিন্তিত দেখা গেল—অবিশ্যি একটা মস্ত পাথর ডিঙোতে পারলে খুব কাছে হ'ত। কিন্তু সে আপনাদের কাজ নয়। একটু ঘুরে ওপরে গেলে সেখান থেকেও দেখা যাবে সব।

ধারাগিরির উৎসমুখে এসে সবাই শিলাখণ্ডে ব'সে পড়ে। পাহাড়ের খাড়া পথে উঠতে সকলেই ক্লান্ত হয়েছে। ঝির্‌ঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। দু'পাশে খাড়াই পাহাড়, মাঝখানে নীচ দিয়ে শীর্ণ জলধারা পাথরের অসমতল খাঁজে খাঁজে বাধা পেয়ে জমে গেছে—একটা ক্ষীণ অবিচ্ছিন্ন রেখা নীচে নেমেছে। আরও খানিকটা নীচে, হঠাৎ পাহাড়টায় যেন ধ্বস নেমেছে। তার নীচে ঝম্ ঝম্ ধারা ঝিমন্ত পরিবেশকে মুখর ক'রে জল পড়ছে। সেই জলধারা অন্ধকার রহস্যাবৃত পথে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে।

পাখীর ডাক এখন আর শোনা যাচ্ছে না, মধ্যাহ্নের রোদ গাছের ফাঁকে ফাঁকে নীচের জলের ওপর পড়ে চিক্-চিক্ করছে। পাখীরা থেমেছে, কিন্তু ঝরণার মুখর ধারা সঙ্গীতের রেশ টেনে চলেছে।

ব্রজেন চীৎকার করে উঠ্‌লো—অপূর্ব! আহা হা-হা, কী সুন্দর।

রমিতা ভ্রূকুটী ক'রল—অত চেঁচিয়ে সবাইকে বিরক্ত করছেন কেন? একটু শান্ত হয়ে বসুন ত! খুব খানিকটা চেঁচালেই সুন্দর জিনিসকে সুন্দর করে দেখা যায়?

ব্রজেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়ে বলে—মাপ করবেন, বুঝতে পারি নি।

পরক্ষণে সে আবার বলে ওঠে—আমার মনে হচ্ছে যেন একটু এই পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেলে খুব চমৎকার beauty spot পাওয়া যাবে। যাবেন, মিস্ মজুমদার?

রমিতা আস্তে আস্তে পাথরের ওপর পা রেখে রেখে শাড়ী সাম্‌লে নীচে নেমে যায়। ব্রজেনও তাকে অনুসরণ করে চল্‌ল। বাঁকের কাছে এসে দেখা গেল দু'পাশ বেদীর মত বাঁধানো। মনে হয় এখানে কা'রা অনেকদিন আগে একটা সেতু গড়েছিল। রমিতা বলে—এ কালভার্টটা কিসের?

—ওটা ম্যাঙ্গানীজ কোম্পানী তৈরী করেছিল। শুনেছি, বরাবর এই রকম বাঁধানো কালভার্ট নীচে পর্যন্ত রয়েছে। প্রত্যেক বাঁকেই এরকম কালভার্ট দেখতে পাবেন। জানেন, এই ম্যাঙ্গানীজ কোম্পানীটি স্রেফ রাস্তাঘাট তৈরী ক'রেই চৌদ্দ লক্ষ টাকা ফুঁকে দিয়ে দেউলে হয়ে উঠে গেছে।

—তাই নাকি! সত্যি ওদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আজ যদি তারা ফৌত হয়ে না যেতো তাহলে বনের এই সৌন্দর্য কোথায় থাকৃত তাই ভাবি।

ব্রজেন হঠাৎ রমিতার হাত চেপে ধ'রে বলে—তুমি রাগ করেছো রমিতা? বুঝতে পারি যে অন্যায় হচ্ছে কিন্তু তোমায় দেখলে চুপ ক'রে থাকতে পারি না কিছুতেই। এবারের মত মাপ চাইছি।

রমিতা ব্রজেনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বললে—এ ত শুধুই মাপ চাওয়া নয়, আরও বেশি কিছু চাইছেন। তখন রাগ করি নি, কিন্তু এখন করছি।

ব্রজেন ওপরের দিকে লক্ষ্য করল, না, কেউ এদিকে আসছে না। সে বললে—ব'স, এইখানে একটু ব'স। অনেক কথা বল্‌বার আছে।

রমিতা নিঃসঙ্কোচে বসে প'ড়ে বললে—বসুন। কিন্তু বিশেষ অনুরোধ, আজ আর ওইসব ভালোবাসার জোলো কথা বল্‌বেন না। তার জন্যে অনেক বাজে সময় পাওয়া যাবে।

রমিতার কথাগুলো ব্রজেনের কাছে গুরুগম্ভীর মনে হয়। অনেক আশা নিয়ে সে আজকের এই দুঃসাহসিক অভিযানে এসেছে। একটা পাথরের

গায়ে ঠেস দিয়ে ব'সে ব্রজেন ক্যামেরাটা নিয়ে তোড়জোড় করছিল। এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয় সে। একসময়ে বললে—একটু এ পাশ ফিরে ব'স ত রমিতা!

রমিতার বিভিন্ন ভঙ্গির অনেকগুলি ছবি তুললে ব্রজেন। অবশেষে রমিতা বললে—ওই গাছটার একটা ছবি তুলুন না।

ব্রজেন বলে—আম গাছের আবার ছবি কি!

—আমগাছ নাকি ওটা! তা হোক, বড় চমৎকার ভাবে ওর ডালগুলো জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আর ওই মোটা মোটা লতাগুলো কেমন এপারের গাছটায় জড়িয়ে গেছে! তুলুন তুলুন—একখানা ছবি ওর তুলুন।

ব'লে রমিতা ব্রজেনের হাত ধ'রে মৃদু ঝাঁকানী দেয়। এরপর ব্রজেন অবশ্যই আম গাছের ছবি তুলল—ওটা আম গাছ না হয়ে যদি কচুগাছ হ'ত তাতেও ব্রজেনের আপত্তি হবার কথা নয়।

পিছন দিকে শুক্‌নো পাতায় কি যেন একটা শব্দ হয়। শব্দটা বেশ জোরে জোরে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। চম্‌কে উঠে ব্রজেন ফিরে তাকালে। দেখা গেল অজস্র শুকনো পাতা একসঙ্গে এলো-মেলোভাবে উড়ছে। নিমেষের মধ্যে পাতায় পাতায় গহ্বরটা ছেয়ে গেল। জলের উপর শুক্‌নো পাতাগুলো ভাস্‌তে লাগল।

রমিতা হেসে বলে—ভয় পেয়েছিলেন ত! ভাবলেন, বুঝি এবারে ফটো কর্‌তে এসে প্রাণটাই বেঘোরে যায়!

তারপর পাতায় ঢাকা সঙ্কীর্ণ জল-রেখার দিকে তাকিয়ে কতকটা আত্মগত ভাবে রমিতা বললে—ঝরাপাতার গান বুঝি একেই বলে, না ব্রজেনবাবু!

—তোমার আর কি, বেশ কাব্য করছো। তোমায় নিয়েই ত বিপদ আমার। নিজে যে ঠিক ভয় পেয়েছিলুম তা নয়। এসব বনে কোথা দিয়ে কি আসে তার ঠিকানা নেই।

ব'লেই সে রিভলবারটা কেস থেকে খুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরল। পরমুহূর্তে বনের শান্ত মৌন পরিবেশ কেঁপে ওঠে গুলী ছোড়ার শব্দে।

রমিতার কানমাথা উষ্ণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় কি যেন একটা প্রলয় ঘটে গেল।

ব্রজেন উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—দেখেছো আমগাছের মাথায় যে লতাটা ঝুলছিল সেটা ছিঁড়ে গেছে। এ হাতের দাম দেয় কে?

রমিতার বিরস মুখভাব দেখে সে একটু দমে গেল। বিষণ্ণ আবহাওয়া কাটাবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে সে রমিতার হাতে রিভল্‌বারটা দিয়ে বললে—শিখবে? গুলী ছোঁড়া শিখবে?

—না, না। লতাটা নষ্ট করলেন শুধু শুধু! পুরুষমানুষের মন এমনই হয় বটে। অকারণে তারা যে কোনো কোমলতাকে ছিঁড়ে দেয়। একবার ভাব্‌লেন না ব্রজেনবাবু! কি লাভ হ'ল?

—কেন, ক্ষতি কি হয়েছে! তোমার মত স্মার্ট মেয়ের মুখে এরকম পুতুপুতু কথা মানায় না। শক্ত হও। আচ্ছা, একবার নিজে হাতে পরখ করো, দেখবে মনটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। রিভল্‌বার ছোড়া কেন শিখ্‌বে না! ধরো এটা, ভয় কি।

আগ্নেয়াস্ত্রটি দেখে যত হাল্কা মনে হয়—রমিতা হাতে ক'রে দেখ্‌লে সেটা আকারের তুলনায় রীতিমত ভারী। কেমন অস্বস্তিকর শীতল এর স্পর্শ। যেন সাপের গায়ের মত ভয়ঙ্কর এর মসৃণতা। রমিতার ইচ্ছে করে সর্বনাশা যন্ত্রটা এখনি ওই নীচের অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দেয়। অসহ্য এ স্পর্শ। তবু একটা কৌতূহলে ওর হাত-পা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল।

ব্রজেন হাতে ধরে গুলী করার কৌশলটা দেখিয়ে দিলে রমিতাকে।

অগ্নিগর্ভ অস্ত্রটি হাতে ক'রে রমিতার দেহটা কেমন যেন কাঁপতে থাকে। ওর মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত সর্বনাশের পক্ষে এর একটি গুলীই যথেষ্ট।

ব্রজেন বলে—এই বারে বেশ ভালো ভাবে লক্ষ্য করো—গাছের গায়ে ওই যে কালো দাগটা দেখ্‌তে পাচ্ছ ওইটা তোমার শিকার। ওটাতে গুলী লাগাতে হবে।

রমিতার কানে সে কথা যেন পৌঁছায় না। মনে হয় কোনরকমে এই সর্বনাশা বস্তুটির হাত হতে পরিত্রাণ পেতে হবে। কি ওর লক্ষ্য, সেটা

কতদূরে, কিছুই ভাবতে পারে না রমিতা। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো, মনের মধ্যে অহেতুক একটা আতঙ্কের দুঃসহ যন্ত্রণা। ও তাড়াতাড়ি চোখ বুজে হাতের চেটো দিয়ে যন্ত্রটার পিছনে চাপ দিয়ে ঘোড়া টিপ্‌লে। তারপর এক মুহূর্তের জন্য ওর জ্ঞানবুদ্ধি সমস্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি রিভলবারটা ব্রজেনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রমিতা মাটিতে অবসন্নভাবে ব'সে পড়ল। ফলাফল দেখবার কথাটা ভুলেই গেছে। রিভলবারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

ঠিক্ সেই মুহূর্তে পেছন থেকে অনুকূল বললে—ব্রাভো, দিদি আর একটা শট্, ক্যামেরা তৈরী হয়ে গেছে। নিন্ উঠুন। এটা আমাদের ছবির সঙ্গে জুড়ে দেবো দেশের লোক জান্‌বে বাংলা দেশে বীণা দাস ছাড়াও অন্য মেয়ে আগুন নিয়ে খেলা করতে পারে।

রমিতা শিথিল ভাবে পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলে—আমি পারব না। আর তা ছাড়া কার সঙ্গে কার তুলনা করতে পারা যায় সে বুদ্ধিটুকুও যাদের নেই তাদের কোনো কথায় আমি নেই।

ব্রজেন ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে—একটু চা খেয়ে নিন্।

—না না, ঠাণ্ডা জল দাও আমায়।

দূর থেকে সচকিত গরুগুলির হাম্বা রব ভেসে আসে। পাখীরা ডানা ঝট্‌পট ক'রে উড়ে যায়। বারুদের গন্ধ যেন বনের পবিত্র পরিবেশকে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। একটু ধুসর ধোঁয়া জমেছে গাছের মাথায়।

ব্রজেন লাফিয়ে উঠ্‌ল—The idea, এটা ত বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দিলে খুব চমৎকার stunt হবে।

নিতাই চৌধুরী বললে—কিন্তু বই-এর সঙ্গে যে কোনোই সামঞ্জস্য থাকছে না হে। বেখাপ্পা একটা 'বাহাদুর কী লেড়কী' গোছের ব্যাপার—

অনুকূল জবাব দেয়—কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ এ সবই ত চায়। জীবনে যাদের কোনোই বৈচিত্র্য নেই তাদের কাছে রক্ত চন্‌চনিয়ে ওঠার মত কিছু একটা হ'লেই হ'ল।

নিতাই চৌধুরী ঝানু লোক, সে সায় দিয়ে বল্‌লে—ঠিক হয়েছে। রমিতা দেবী আপনি ঘাবড়াবেন না।

প্রতিবাদ ক'রে রমিতা বল্‌লে—কিন্তু বই-এর সঙ্গে 'লিঙ্ক্‌' থাকছে না,—

ব্রজেন দু'হাত শূন্যে ছুড়ে বলে—আলবৎ বই-এর সঙ্গে লিঙ্ক্‌ থাকবে। দরকার হলে গল্পের প্যাঁচ পাল্টাতে হবে। সেজন্য ভাববেন না, লেখককে ত টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। সব আগে mass appeal -যাকে বলে Success!

—তাই বলে প্রেমের কাহিনীর বইটা গুলী দিয়ে নষ্ট করবেন?

রমিতা যেন লেখকের পক্ষে নিয়ে কথা বল্‌ছে।

ব্রজেন বলে—বুঝতে পারছেন না, সূক্ষ্ম রসের রসিকরা আমাদের বাংলা ছবি দেখতে আসে না, যারা আসে তারা চায় mass appeal.

রমিতা শুধু বল্লে—আমার কিন্তু জনসাধারণ সম্বন্ধে এত অশ্রদ্ধা নেই ব্রজবাবু। নিজের রুচিটা জনসাধারণের দোহাই দিয়ে চালানো আপনাদের পুরনো অভ্যাস।

নিতাই চৌধুরী ওদের তর্কের অবসান ঘটিয়ে বলে—ওসব মুলতুবি রেখে এখন কাজের-কাজটুকু সেরে নিন। যদি তুলতেই হয় তবে প্রস্তুত হয়ে নিন।

অনুকূল বললে—উঠুন দিদি। ব্রাণ্ডি দেবো? বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।

রমিতা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, বলে—না, দরকার নেই। এবারে লক্ষ্য ঠিক রেখে গুলী ছুঁড়ব। আসুন ব্রজেন বাবু ব্যাপারটা আর একবার বুঝিয়ে দিন ত! এবারে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ!

বেলা পড়ে আসছে। আবার রোদের সোনালী রং কোথায় লুকিয়ে গেছে। ছায়ায় ছায়ায় পাহাড়ের পরিবেশ প্রশান্ত।

ব্রজেনকে অনুকূল তাড়া দিয়ে বল্‌লে—আমি অনেক খেটেছি. এবারে ব্রজ-দা আপনি ওপরের দিকে গিয়ে দু'চারটে 'স্পট' ধরুন আবার শেষকালে আপনিই দেরী করিয়ে দেবেন।

ব্রজেন বিমর্ষ ভাবেই এগিয়ে যায়। তার পিছু পিছু আর সকলে চলে গেল। শুধু রমিতা একান্তে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। রমিতা বললে—আপনারা Spot selection করুন। আমি জিরিয়ে নিই!

অনুকূল আপন মনেই বলে—আপনাকে একা ফেলে যেতে পারব না।

রমিতার চূর্ণ কুন্তলের দু'একটি কপালের ওপর এসে পড়ে ক্লান্ত-সৌন্দর্যে মোহ সৃষ্টি ক'রেছে। অনুকূল সামনের দিকে একবার তাকায়, পুনরায় তার দৃষ্টি ফিরে আসে রমিতার মুখের ওপর। কয়েক মিনিট এই ভাবে নীরবে কেটে যায়। তারপর অনুকূল অদূরে একটা শিলাখণ্ডের উপর পা রেখে গালে হাত দিয়ে রমিতার কাছে সরে এসে দাঁড়ালে।

অনুকূল এগিয়ে আসতেই রমিতা সোজা হয়ে উঠে বসল। ওর চোখে সংশয়ের ছায়া পড়েছে। মুখে বিরূপতার আভাস।

অনুকূল সঙ্কুচিত ভাবে বলে—একটা কথা বলব?

রমিতা ভ্রূকুটি দৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—কি?

—অমন জ্বলন্ত চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস হচ্ছে না। একটু বরাভয় পেলে আবেদন জানাতে পারি।

পাখীর কাকলিতে মুখর হয়ে উঠল বনভূমি। দমকা হাওয়ায় শুক্‌নো পাতার সাড়া জাগে। আর সেই হাওয়ার দোলায় দুলে ওঠে ধাতুপ ফুলের রক্তিম গুচ্ছ।

অনুকূল ইসারা ক'রে একটা দোদুল্যমান লতাবেষ্টিত গাছের দিকে দেখিয়ে বলে—ওই কুচো কুচো বেগুনী রঙীন ফুলগুলো কেমন লাগছে।

—সুন্দর। কিন্তু তোমার কথাটা কী, বল্‌লে না ত?

অনুকূল যেন শেষের কথাগুলো শুনতে না পেয়েই বলে—আর এই নিকষ কালো পাথরের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঝির্‌ঝির্‌ করে নীচের দিকে চলেছে—ওই ওপাশে কেমন সুন্দর প্রজাপতি বসেছে, না!

—ইস্, ওর ডানায় কি রঙের বাহার!

—ভারী সুন্দর।

ব'লে অনুকূল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রমিতার দিকে তাকায়। আবেশবিস্তৃত আয়তচোখের গভীর চাহনী মেলে দিয়ে রমিতা বলে—বনের এত রূপ!

—একটু আগে ত সেই রূপেরই কথা বলছিলাম। সেই সময়ে আমার মনে একটা অপূর্ব সৌন্দর্যের ছবি ভেসে উঠল। এই মুহূর্তে সেটা যেন জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে! আমায় যেন পেয়ে বসেছে।

—কথাটা কি? ভালো ক'রে খুলেই বলো না।

বারকয়েক ঢোক গিলে, উঁচু একটা গাছের দিকে তাকিয়ে অনুকূল মৃদুস্বরে বললে—এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো মানবীর নগ্ন ছবি তুলে নেবো। চারিপাশের এমন অকুণ্ঠ সৌন্দর্য বিকাশের সঙ্গে নিরাভরণ নারীর সৌন্দর্য—সুন্দর ছবি নয়! সে ছবি অপূর্ব!

রমিতা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অনুকূলের দিকে তাকিয়ে বলে—তোমার চোখে বর্বর মানবের আদিম তৃষ্ণার আভাস ফুটে উঠবে না?

—সকল সন্দেহের অতীত হয়ে? সে কথাটা কি বলতে পারি, এতখানি জড় আমি নই। তবে খোলা বনে বলতে পারি, যে-মুহূর্তে আমার এ ইচ্ছা জেগেছে সে সময়ে বাসনার কোনো উদগ্র জ্বালা ছিল না। আমি শুধু সামঞ্জস্যের কল্পনায় আপনার নারীত্বকে মনে মনে সব আবরণ, সব আভরণ মুক্ত করে দেখেছি। আপনার মত এমন সাবলীল সবুজ সৌন্দর্য দুর্লভ। স্তাবকতা নয়, সত্যি বলছি।

—না, না, তুমি জান না বলেই এসব বলছ। মনকে ঠকিয়ো না।

—কিন্তু শিল্পীর সৌন্দর্যপিপাসার দাবীকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আপনি ভুলে যান এখানে কোনো মানুষের উপস্থিতি। মনে করুন আদিম যুগের মানুষ, যার মনের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে বনের পাতার কোন তফাৎ ছিল না, যারা সভ্যতার মুখোশে নিজেকে লুকোয় নি। এক মুহূর্তের জন্ত, একবারটি আমায় সেই অপূর্ব দৃশ্যের সুযোগ পেতে দিন। সভ্যতাকে মুছে ফেলুন। যে বনকে আপনি দেখতে এসেছেন তার কাছে নিজেকে অসঙ্কোচে মেলে ধরুন।

রমিতা অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—আমি সব পারি। আমার ত

বাধা নেই, কিন্তু আপত্তি এই যে, তুমি অনর্থক একটা বাজে নোংরামীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। এটা তোমার Snobbery।

—তা যদি মনে করেন তবে প্রতিবাদ করব। অবশ্য আপনার অসম্মত হওয়া এক কথা, কিন্তু আমার মনোবৃত্তিকে বিকৃতভাবে বিচার করবেন এটা ভালো লাগ্‌ছে না। বেশ ত, বলুন সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। কিন্তু সেটা লুকোবার জন্যে আমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে কি লাভ? অন্য মেয়ে হলে বল্‌তাম না, তবে আপনার মনের প্রসারতায় আমার আস্থা ছিল। আর্টের খাতিরে আপনি এটুকু পারবেন।

—বেশ, তবে তাই হোক্। তোমাকে ষোল আনা বিশ্বাস করছি।

ব'লে রমিতা একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিলে। জলের ছল্ ছল্ শব্দ, পাতার মর্মর, সহসা এই মুহূর্তে ওর কানের কাছে জীবন্ত, জাগ্রত হয়ে উঠল—সঙ্কোচের ব্রীড়া যেন সহসা ওকে কুণ্ঠিত ক'রে তোলে। গাছের ডালে একটি পাখী ব'সেছিল, হাতের ইঙ্গিতে রমিতা পাখীটিকে সরে যেতে ইশারা করল। তারপর একমুহূর্তের মধ্যে আত্মবিজয়িনী নারী বনসৌন্দর্যের পটভূমিতে এঁকে দিল আপন মূর্তি। এ নারী অনন্তকালের রমণী, এ রমণী জীব-জগতের প্রতীক! এ প্রতীক পুরুষের চোখে পরম বিস্ময়—অন্ধকারে ঢাকা পৃথিবীর অন্তরের মতই রহস্যময়ী। যুগপরিক্রমার প্রতিটি মুহূর্তে তার সেই বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি আঘাত ক'রে মানবীর মনে একটিমাত্র প্রশ্ন চিরজাগ্রত রেখেছে—"আমার মধ্যে কি এত সম্পদ, কি আছে অনাবিষ্কৃত গূঢ় গোপনতা?" বিস্মিতের বিহ্বলতা তাকে সচকিত করে, মূক মৌনতায় সে আবিষ্ট হয় আপন রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্রতে। সেই তন্ময় আত্মবিকাশের মুহূর্তগুলিই কি যৌবন? যার সঙ্গে আদিম জিজ্ঞাসার অঙ্গীকার স্বাক্ষরিত রয়েছে, সে অঙ্গীকার কালপ্রবাহকে অতিক্রম ক'রে রূপের উপান্তকে স্পর্শ করবার দুস্তর সাধনায় সৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে চলেছে!

এক চমকে 'ফ্ল্যাশ বাল্‌বে'র আলোটা জলে উঠে পিছনের আমগাছের মাথায় হারিয়ে গেল। কতকগুলি পাখী কলরব করে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যাওয়ার শব্দ ঘনীভূত পরিবেশকে কেমন হাল্কা ক'রে দিল যেন।

অনুকূল একবার ক্যামেরাটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদিকে ফিরে চাইল।

ছবি তোলার পর থেকে যেন রমিতা একটা দূরত্ব রচনা করতে চায়। চলতে চলতে রমিতা বললে—অনুকূলবাবু!

অনুকূল ফিরে দাঁড়িয়ে জবাব দেয়—কি দিদি!

—আচ্ছা অনুকূল বাবু, আপনি আমায় কী ঠাওরালেন, সত্যি বলুন ত!

—আপনার মধ্যে সত্যকার শিল্পীর বাস। সত্যি পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করছে আপনার। ভাবতেও পারি নি এত সহজে বিশ্বাস করবেন।

কিছুদূর চলবার পর রমিতার সন্দেহ হয় বুঝিবা পথ ভুল হয়েছে, তাই বেশ চীৎকার ক'রেই অনুকূলকে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু এরা গেল কোথায়?

ওপর থেকে মোরেন সাড়া দিয়ে বলে—আসুন, বাঁ-দিক দিয়ে উঠে আসুন।

ব্রজেন উষ্ণ কণ্ঠে বলে, তার কথার মধ্যে রীতিমত অসন্তোষ—আপনাদের যত কাণ্ড! এখানে এক কাজে এসেছেন, সেটা হোক আর না-ই হোক, দিব্যি নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জানেন ত বইখানার success-এর অনেকটা নির্ভর করছে এই পাহাড়-জঙ্গলের ওপর। যদি ছবি ঝুলে যায় তখন গাল খেতে আছে শালা ব্রজ দত্ত—!

আরও কিছু কঠিনতর কথা তার কণ্ঠনালীর বাঁকা পথে এসে জমে ছিল, কিন্তু রমিতার চেহারা দেখে সেটা হজম ক'রে নিয়ে ব্রজেন সংযত ভাবে বললে—আসুন রমিতা দেবী, এখন তাড়াতাড়ি দু'চারটে মোটামুটি shot নিয়ে নেওয়া যাক।

ব্রজেনের কথাগুলো যেন শুনতেই পায় না অনুকূল। সে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে—By jove! ওই পাশ দিয়েই ত hill top-এ পৌছনো যাবে মনে হচ্ছে! দেখেছেন রমিতা-দি, ওই খড়ের ঝোপটার ফাঁক দিয়ে আলোর আভা দেখেছেন?

মোরেন হেসে বললে—ওই সব জঙ্গলে বাঘ ঘুমোতে ভালোবাসে।

নিমেষে সকলের মুখের চেহারা বদলে যায়। কেমন একটা অদ্ভুত আশঙ্কায় পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এতক্ষণ এভাবে কাছাকাছি বিপদকে অনুভব করে নি কেউ। এবারে যেন বনভূমির অন্তর থেকে ইঙ্গিত করছে এদের চলে যাবার জন্যে।

ত্বরিতে ছবি তোলার কাজ শুরু হয়। অনুকূল এসব দিক দিয়ে ওস্তাদ। এই অল্প বয়সেই সে বেশ নাম কিনেছে। তার চোখ আছে, হাতের কাজও নিখুঁত। ছবি তুলতে সে যেমন তৎপর তেমনি সৌন্দর্যসন্ধানী দৃষ্টি তার। কাজেই ব্রজেন দত্ত মনে মনে যতই বিরক্ত হোক, মুখে তাঁর এক'শ' ভাগের একভাগও প্রকাশ করতে পারে না। ব্রজেন নামেই ওপরওয়ালা, কাজের দিক দিয়ে সে ষোল আনাই নির্ভর করে অনুকূলের ওপর।

পিছনে পাতার ওপর কিছু একটা এগিয়ে আসার শব্দ হচ্ছে। এবারের শব্দ শুধু শুক্‌নো পাতা ওড়ার শব্দ নয়। ভারী ভারী পায়ের চাপে শুক্‌নো পাতাগুলো যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শব্দটা এগিয়ে আস্‌ছে। ব্রজেন ব্যস্ত হয়ে আগ্নেয়াস্ত্রে হস্তক্ষেপ করে। মোরেন তাড়াতাড়ি হাত তুলে বলে—উঁহুঁ! বাবুজী, মানুষ আসছে।

তিনটি সাঁওতাল—বৃদ্ধা, তরুণী এবং যুবক। বৃদ্ধার মাথায় একটা ভারী বোঝা। তরুণীর হাড়ে-মাসে জড়ানো সুঠাম দেহ একটি ছোটখাটো কাপড়ে আবৃত, তেল চক্‌চকে পাকানো বাঁসের লাঠি, পুরুষটির স্কন্ধে তীর ধনুক এবং পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা।

ব্রজেন ভ্রূকুটি ক'রে বলে—এই, কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

তরুণীটি ওর দিকে চেয়ে সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে—কেনে!

বৃদ্ধা বল্‌লে—যাবো বালিডি।

মল্লিকা লক্ষ্য করে যুবতীটির দাঁড়ানোর ভঙ্গি—পিঠের দিকটা ঠিক যেন ধনুকের মত বাঁকা। কালো দেহের চিকন মসৃণ লাবণ্য ওকে মুগ্ধ করেছে। ও বলে—বালিডি কতদূর? সেখানে যাচ্ছ কেন?

এবারে জবাব দেয় যুবকটি,—রাধেশ্যাম আছ বটে!

তরুণীটি রমিতাকে দেখছে—সরল চোখে বিস্ময়ের কি অপূর্ব অভিব্যক্তি। রমিতার মনে হয় অনুকূল ভুল করেছে ছবি তুলতে। যদি এই মেয়েটির ছবি নেওয়া যেতো তাহলে প্রকৃতির ছন্দে যতিপতন হ'ত না। আহা, ভগবান্ যেন ওই নিকষকালো পাথর কেটে কেটে এই অঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। আর লাবণ্য ঢেলে দিয়েছেন কপিলা গাইয়ের গায়ে যেমন অকৃপণ হাতে লাবণ্য দিয়ে থাকেন। বনের হরিণী কি এর চেয়েও সুন্দর? রমিতা অবাক হয়ে ভাবছিল। আর সাঁওতাল মেয়েটি বারবার ওকে দেখছিল—তু'জনের চোখেই বিস্ময়!

মেয়েটির কাছে এগিয়ে এসে রমিতা বলে—রাধেশ্যাম কে? কোনো ঠাকুর দেবতা বুঝি!

একথার জবাব দিতে পারল না মেয়েটি, শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

ওরা আর দাঁড়ায় না। সন্ধ্যা হয়ে যাবে—বালিডি অনেকটা পথ। ওদের ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হ'ল রাধেশ্যাম কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি অর্থাৎ রাধেশ্যামকে চেনে না যারা, তাদের ওরা মানুষের মধ্যে গণ্য করা দরকার মনে কর না।

পরে মোরেন বললে—রাধেশ্যাম একজন কুলির ঠিকাদার। ওরা তার কাছে কাজের আশায় যাচ্ছে।

কাজের শেষে নীচে নেমে ওরা দেখলে কণ্ট্রাক্টরদের একটা লরীতে কাঠ বোঝাই হয়ে গেছে। আর একটিতে খানিকটা বাকী, এখন গাছ কাটার পালা শেষ হয়েছে। পাহাড়ের উঁচু জায়গা থেকে কাঠ কেটে ঢালু পথের মুখ পর্যন্ত গরু বেঁধে টেনে আনা হচ্ছে, তারপর সেখান থেকে গড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঢালু পথের গা-বেয়ে, গাছপালা ভেঙে কাঠগুলোপ্রচণ্ড শব্দ সহকারে নীচে নামছে। এইভাবে কাঠ নামছে, আর তার শব্দে চারিদিক মুখর হয়ে উঠেছে।

নামবার সময় খুব তাড়াতাড়ি বাসাডেরার নীচে এসে পৌছে গেল ওরা।

মোরেন বললে—একবার আমাদের বস্তিতে যাবেন?

সবাই যেন কেমন আশ্চর্য হ'য়ে যায়। এখানে মানুষের বাস? বিশেষ ক'রে মোরেনের মত শিক্ষিত লোক এইখানে থাকে!

মোরেন সত্যিই বেশ ভালো লেখা পড়া জানে, হয়ত এ দলের অনেকের চেয়ে বিদ্যাবত্তা তার বেশি।

হাত জোড় ক'রে বললে মোরেন—আপনাদের মত বড় মানুষ যদি আমাদের গাঁয়ে ঢোকে, তবে সেটা গল্পকথা হয়ে থাকবে। অনেক-পুরুষ পরেও লোকে বল্‌বে মোরেনের খাতিরে ছবিতোলা বাবুরা এসেছিল। বস্‌তির মানুষরা খুব ভালো। ওরা শহর বলে মৌ-ভাণ্ডারকে। ওরা মৌ-ভাণ্ডারের সাহেবদের মনে করে দুনিয়ার মালিক। অথচ অনেকে বেশ লেখাপড়া জানে, শিক্ষিত। আমাদের এখানে গীর্জা আছে, ছোট্ট ইস্কুল আছে।

মৌভাণ্ডার—ঘাটশিলার আই. সি. সি. কোম্পানীর এলাকা। সেখানে হপ্তায় একদিন হাট বসে। সেই হাটে সাঁওতালেরা যায়। হাটে যাওয়া ওদের কাছে উৎসবের মতই একটা আনন্দের দিন। সেদিন সকালে উঠে ওরা আপন মনেই বার বার বলে—হাটে যাবো, হাটে যাবো।

জীবনের যত বৈচিত্র্য এই হাটকে কেন্দ্র করে রচিত হয়।

—ইস্কুল? প্রশ্ন করে নিতাই চৌধুরী।

—হ্যাঁ বাবুসাহেব।

নিতাই চৌধুরী সম্পর্কে যতীন চৌধুরীর কি যেন হয়। তাকে খাতির করে সবাই।

—চলো, দেখে আসি! এই বনের মধ্যে ইস্কুল—এ সেই ইংরেজ মিশনারীদের কাজ। উঃ, কী সাংঘাতিক জাত। নিতাইবাবু বলল।

ব্রজেন দত্ত গাড়ীতেই বসে রইল। অনর্থক জংলীদের সঙ্গে এভাবে আত্মীয়তা করার কোনো সার্থকতা নেই; আরও অনেকেই গেল না। সারাদিন বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রে সবাই ক্লান্ত। তবে রমিতার উৎসাহ এখনও কম নয়, অনুকূলও গেল।

গ্রাম ছোট। পাহাড়তলীর ঢালু জমিতে গা-ঘেঁসাঘেঁসি কয়েক ঘরের বস্তী। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা এসে জুটল কলকাতার মানুষ দেখতে।

একটি তেইশ চব্বিশ বছরের মেয়ে নমস্কার ক'রে সামনে দাঁড়াতেই মোরেন বললে—এ হচ্ছে মেরী, আমাদের এখানকার স্কুলের টিচার।

নিতাই প্রশ্ন করে—ক'জন টিচার আছেন?

—স্কুল খুবই ছোট। ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে ষোলো সতেরো জন। মেরীই সবসময় দেখাশোনা করে, দরকার হ'লে আমিও আসি। যে যখন ফুরসৎ পায় স্কুলের কাজ করে। নিজেদের ব্যাপার ত।

মেরী রমিতার কাছে এসে বললে—আপনি আমাদের কিছু বলুন, শুনব।

রমিতা হেসে জবাব দেয়—কি বলব ভাই, কিছু ত জানি না।

—সত্যি জানেন না? নাকি, আমরা সে সব বুঝতে পারব না, তাই বলতে চাচ্ছেন না। আমরা ত জংলী।

রমিতা বলে—না, না, সে কথা মনে করছেন কেন? আমি শুনেছি, আপনারা সবাই শিক্ষিত।

মেরী খুশি হয়ে ওঠে। খুব সরল ওর মন, নইলে এত অল্পে খুশি হ'ত না। মেরী বললে—গান শুন্‌বেন? রবীন্দ্রসঙ্গীতের বই একখানা পেয়েছি—মোজেভ সাহেব দিয়েছেন, গানও উঠিয়েছি। সুর ঠিক হচ্ছে কিনা একটু দেখিয়ে দেবেন। মোজেভ সাহেব আমাকে অনেক জিনিস দিয়েছেন। জানেন না তাঁকে? খুব সুন্দর লোক। এখন বিলেতে গিয়েছেন।

রমিতার মন খুশিতে উছলে ওঠে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত! এই বাসাজোড়া গ্রামে সাঁওতাল মেয়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাবে!

মেয়েটির ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নেই। ও কারুর অনুরোধের অপেক্ষা করতে জানে না—স্বয়ং সম্পূর্ণ। এতটুকু অপ্রতিভতা নেই, নেই কিছুমাত্র বাহুল্য। গান শুরু হ'ল। একটু অন্যরকম শোনায়, যেন সুরের মধ্যে ঝুমুরের টান এসে পড়ছে। তবু এই পরিবেশের সঙ্গে এ গানের সামঞ্জস্য যেন এই সুরের মাধুর্যেই ফুটে উঠল। রমিতা ইচ্ছা ক'রেই সুরের ভুল ধরল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লীলায়িত ছন্দে মেরী গাইতে থাকে।

গান শেষ ক'রে রমিতার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চলল—কেমন, খুব সুন্দর গান না?

রমিতা ঘাড় হেলিয়ে বলে—খুব চমৎকার।

একটা গাছের নীচে গিয়ে মেরী বলে—আপনাকে কিন্তু আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে। আপনি ত কলকাতায় থাকেন—

মেরী আপন মনেই কথা বলে, কথাগুলো যেন ও নিজেকে শোনায়। এই কথাগুলো যে কতবার ও নিজে নিজে বলেছে তার ঠিক নেই। এই ক'টি কথা নিয়েই ওর জীবন সজীব হয়ে রয়েছে। ওর মনের কথা।

রমিতার হাত ধ'রে মেরী বলে—কলকাতায় ইলিয়াসও থাকে। আমার ইলিয়াসকে জানেন ত? ছিপ-ছিপে ফরসা, হাস্‌লে দাঁতগুলো চক্‌চক করে। কলকাতায় থাকে। অনেক বছর হ'ল যুদ্ধের চাকরী নিয়ে গেছে ইলিয়াস। কলকাতায় থাকবে ব'লে গেল, তারপর আর খবর পাই নি। ব্যস্ত কাজের মানুষ, হয়ত কাজের চাপে খবর দিতে সময় পায় না, কিন্তু আমার মন যে মানে না, জানতে ইচ্ছে করে সে কেমন আছে, কি করছে। অবিশ্যি যাবার সময় ও বলেছিল, ফিরতে দেরি হবে। সব ঠিক হয়ে আছে, ও ফিরে এলেই আমাদের বিয়ে হবে। আপনি কলকাতায় গিয়ে ইলিয়াসের একটা খবর নিয়ে চিঠি দেবেন আমাকে। আমার নাম ক'রে বলবেন তাকে, যেন সে চিঠি দেয়, আমি যে রোজ তার কথা ভাবি তা-ও বলবেন। আমাকে যদি কলকাতায় নিয়ে যায় তবে বেশ দুজনে থাকতে পারব, চাকরীও করতে পারব। কাজের চাপ কমলেই সে যেন একবার আসে। আসতে বলবেন ওকে।

রমিতা এই সরল মেয়েটির অর্ধ অচেতন তন্ময়তা দেখে অভিভূত হয়ে যায়। মনে হয়, একেই বলে প্রেম। এই প্রেমকে দেখেই বুঝি কবি বলেছেন—'Love is infallible, it has no errors, for all errors are the want of love'. রমিতার নিজের জীবনেও ত এমন হ'তে পারত! মেয়েটির মুখের ওপর থেকে ওর দৃষ্টি যেন সরতে চায় না।

মেরী বললে—দিদি. আমার এই কাজটা নিশ্চয় ক'রে দেবেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে যখন থাকব তখন রোজ আপনাদের ঘরের কাজ করে দিয়ে আসব।

হঠাৎ রমিতার চমক ভাঙলো, ও প্রশ্ন করল,—ইলিয়াসের ঠিকানা কি?

খুব নিশ্চিন্তভাবেই মেরী জবাব দিল—ঠিকানা? শহর কলকাতা। আপনি তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন, অমন টানা টানা দুষ্টুমী মাখানো চোখ, দেখনি আর কারও। বকের পালকের মত ধবধবে দাঁত—!... মিলিটারীর চাকরী করে সে। নাম ইলিয়াস।

অনেক চেষ্টা করেও রমিতা মেরীকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না যে কলকাতা শহরটা কত বড়। সেখানে টানা টানা চোখ আর ধবধবে সাদা চক্‌চকে দাঁতওয়ালা মিলিটারী চাকুরে ইলিয়াসকে আবিষ্কার করা যে কত কঠিন কাজ মেরীকে বোঝানো গেল না। রমিতার কোনো যুক্তিই মেরী মঞ্জুর করল না, অবশেষে ও বলল—আমি মোরেন কাকাকে অনেকবার বলেছি। কিন্তু ওরা ত পুরুষ মানুষ, কি করে বুঝবে আমাদের কথা। মোরেন কাকাও অমনি বলে, কলকাতা নাকি ভারী বিরাট শহর, সেখানে ইলিয়াসকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরা অবিশ্যি চায় যে মেরীটা এই বস্তীতে এই ভাবে থেকেই বুড়ো হয়ে যাক্। এমনিতে ত সবাই খুব ভালোবাসে আমাকে। কিন্তু আমার যে ইলিয়াসকে দেখতে ইচ্ছে করে—তার জন্যে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছি, তারই জন্যে আমি লেখাপড়া শিখলাম, তার জন্যে যে আমি দিনরাত ভাবি, এটা টের পেলেই মোরেন কাকারা ভীষণ চটে যায়। বলে শহরে হাওয়াতে আমি নাকি গাঁয়ের মেয়েদের মাথা খাচ্ছি সব। আপনার পায়ে ধরে বলছি দিদিমণি, মেয়েমানুষের দুঃখ আপনি ত বুঝতে পারেন, একটু কষ্ট করে খুঁজে বার করবেন ইলিয়াসকে। খুব খুঁজতে হবে না, এমন চেহারা যে দেখলেই চিন্‌তে পারবেন। সে নিশ্চয় কাজের চাপে ফুরসৎ পায় না। সোজা ত নয়, মিলিটারীর কাজ! কেমন আছে জানালেই অনেকটা শান্তি পাবো। তারপর অবসর-মত একবার এসে যেন আমায় নিয়ে যায়। এইটুকু বলবেন।

রমিতা স্তব্ধ হয়ে শোনে। মেরীর দৃষ্টির প্রতিচ্ছায়া পড়েছে রমিতার মনে। মেরীর চোখে মুখে প্রগাঢ় বিশ্বাসের চিহ্ন—সে বিশ্বাস ভ্রান্ত—কিন্তু কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় দৃঢ় সম্বন্ধ! একদিন হয়ত মেরীর এই অন্ধ আকাশস্বপ্ন আর থাকবে না। সেদিনের বিপুল ব্যর্থতার কল্পনা রমিতাকে পীড়িত করে। প্রতিটি সরল

স্বপ্নালু মনে এমনি একান্ত আশার একটি নীড় গড়ে ওঠে—কিন্তু নষ্টনীড়ের বেদনা যে কত মর্মান্তিক তা রমিতার জানতে বাকী নেই। আহা, মেরীর মত সরল মেয়ের জীবনে সেই চরম দুর্দিন যেন না আসে! কে জানে, হয়ত ঠিক এই পার্বতী-মেয়েটির প্রেমের নিষ্ঠা রমিতার প্রেমে ছিল না। রমিতা নিজের এই অহেতুক আশঙ্কায় মেরীর পবিত্র প্রেমকে অমঙ্গলের পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল মনে মনে। বিদায়ের সময় ও মেরীকে আশ্বাস দিল ইলিয়াসের খবর দেবে।

আবার বুরুডি পাস। এবারে পথের রূপ গেছে বদলে। অস্তসূর্যের রক্তিম আলোয় ডিনামাইট দিয়ে ফাটানো রুক্ষ পাথরগুলো লোহিতবর্ণ ধারণ ক'রেছে। অপর পাশে অনেক নীচে সমতল পথে পাহাড়ী নদী ব'য়ে চলেছে, সেখানে ঘন অন্ধকার, গাছগুলোর কালো আবছা মূর্তি মানুষের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে। ঠিক এই মুহূর্তে, এইখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় এ আর এক পৃথিবী —কি জানি হয়ত বা পৃথিবীর বাইরে! দক্ষিণদিকে উর্ধ্বলোকে ঘন দীর্ঘ বনস্পতির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালো পাথর। মসৃণ কালো কালো পাথর চকচক করছে! গাড়িখানা এক একটা বাঁক ঘুরছে আর মনে হচ্ছে ওই সম্মুখে বুঝি পৃথিবীর সীমান্ত আকাশে এসে মিশেছে।

মোরেন বললে—ওর ওপরে লাকাইসিনি পাহাড়। লাকাইসিনি জঙ্গল এ অঞ্চলের সবচেয়ে নিবিড় বন—সেখানে হাতীর বাস। হাতীরা খেলা করে সেখানে। মোরেন বললে,—যদি যেতে চান নিয়ে যেতে পারি।

ব্রজেন মন্তব্য করে—তারপর হাতীতে আমাদের নিয়ে লোফালুফি করুক আর কি। উঃ হাতীর রসিকতা বড় সাংঘাতিক। মশাই, ডুয়ার্সের জঙ্গলে আমার এক ডাক্তার বন্ধু থাকে। তার মুখে শুনেছি, একবার কোথা থেকে যেন রুগী দেখে সে মোটরে ক'রে ফিরছে, সন্ধ্যের মুখে একটা ব্রীজের সামনে হাতীতে পথ রুখে দাঁড়াল। বেগতিক দেখে বন্ধুটি তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলে একটা বড় গাছের মাথায়। গাছে চড়ে বসে বসে সে দেখলে গাড়িখানার চারি পাশে বার কয়েক ঘোরাফেরা ক'রে হাতীটা শুঁড় দিয়ে গাড়ীখানার বস্তুতত্ত্ব পরখ করবার জন্য কাৎ ক'রে ফেললে।

গাড়িখানা উল্টে গেল। অবিশ্যি সে যাত্রা ফাঁড়াটা গাড়ির উপর দিয়েই গেল।

মোরেন বললে—আপনি ঠিকই বলেছেন, হাতী যদি পিছনে লাগে তবে সাংঘাতিক কথা। কিন্তু না ঘাঁটালে ওরা ত কিছু করে না।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্যেই বোধহয় নিতাই চৌধুরী বললে—ওই মেয়েটি কে হে মোরেন?

মোরেন জবাব দেয়—কার কথা বলছেন? মেরী! মেয়েটি খুব ভালো। তবে ওর একটু মাথার দোষ আছে।

নিতাই মোরেনের কথাটা যেন বিশ্বাস করে না, সে বলে—তুমি যাই বলো, ভারী সুন্দর ওর গানের গলা। আর খুব স্টেজ-ফ্রি।

—বাবু সাহেব, অনেক কষ্টে ওকে গান শিখিয়েছি।

—ফিল্‌মে নামলেই চট ক'রে নাম হয়ে যাবে ওর। এই সব হচ্ছে টাইপ!

মোরেন একথার কোনো সদুত্তর দেয় না।

নিতাই চৌধুরীর কথাটা রমিতাকে অন্যমনস্ক ক'রে দিল। ওর চোখের সামনে মেরীর লীলায়িত সঙ্গীতের মত ছন্দোময় রূপ ভেসে বেড়ায়? পাহাড়ী মেয়েটির অন্তরে বাহিরে কী বিপুল সম্পদ! ইচ্ছে করে মেরীর সঙ্গে থাকতে, মেরীকে নিজের কাছে রাখতে। মেরী বেঁচে আছে, তার চোখে মুখে বনের সতেজ জীবনপ্রবাহের সজীব শ্যামলতা। মেরী নিজের সমগ্র অন্তর দিয়ে ভালোবাসে তার ইলিয়াসকে। নিজের সর্বস্ব সমর্পণ ক'রেই মেরী খুশি!

রমিতার নিজের দিকে তাকাতে সাহস হয় না। রমিতা নিজের রিক্ত মনের ব্যর্থ জ্বালা দিয়ে, সারা পৃথিবীকে নস্যাৎ ক'রে দিতে চায় কেন, কেন তার এই দংশনে জর্জর করার অদম্য প্রবৃত্তি, রমিতা বুঝতে পারে না। মেরীর সঙ্গে নিজের তুলনা করতে সাহসে কুলোয় না। তবু নিজের কাছে এটুকু ধরা পড়ে রমিতার —মেরী নিজেকে আবিষ্কার ক'রেছে, নিজেকে স্বীকার করে নিয়েছে, আর রমিতা নিজেকে খুঁজে পায় নি। ও যেন আপনার কাছেই একটা অনাবিষ্কৃত রহস্য হয় ত সেটা মোহ ছাড়া কিছু নয়। হয়ত নিজেকে নিজের চেয়ে

বড় ক'রে দেখার একটা অদ্ভুত অভিলাষই রমিতাকে অস্থির অতৃপ্ত ক'রে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একদিন রমিতার মনও সুকুমার ছিল, যখন ও চেয়েছিল একটি নিবিড় নীড় বাঁধতে, যখন ও এরকম ছন্নছাড়া জীবন কল্পনাও করে নি,—কিন্তু সেসব ত অন্য একটি মেয়ের জীবনের কথা বলে মনে হয় আজ। আজকের এই ছায়াছবির জগতে উন্মাদনা এনে দিয়েছে যে রমিতা সে সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে রমিতা পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে গেল।

খুব জোরে একটা বাঁক ফেরবার সময় লরীটা ঝাঁকানী দিয়ে লাফিয়ে উঠল। ঠিক তারপর থেকেই রমিতার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। প্রথমে আমল দিতে চায় নি। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই পেট্রলের গন্ধটাও নাকের কাছে বিশ্রী দুর্গন্ধ মনে হতে-না-হতেই গা গুলিয়ে বমি উঠে এল।

ব্রজেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললে। গাড়ি থামিয়ে মাথায় জল দিয়ে তখনকার মত একটু সুস্থ হ'ল রমিতা। গাড়ি চলতে শুরু করল খুব আস্তে আস্তে।

ওরা ঘাটশিলায় ফিরল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রমিতা রীতিমত অসুস্থ। রাস্তায় আরও বার-কয়েক বমি হয়েছে, অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে মনে হচ্ছে ওর। অনুকূল মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এক সময়ে হাত নেড়ে রমিতা বারণ করলে।

ব্রজেন আর অনুকূল রমিতাকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে এলো ঘরে। অবিশ্যি রমিতা আপত্তি করেছিল—আপনারা ছেড়ে দিন, আমি একাই যেতে পারব।

কেউই সেকথা শোনে না,—না না, চলুন।

রমিতার হাত-পা, মন, সব কিছুই কেমন একটা শৈথিল্যে অবসন্ন। যদিও ওদের এই অযাচিত যত্নটা গ্রহণ করতে তার ভালো লাগছে না তবু বাধা দেবার মত যথেষ্ট সামর্থ্যও নেই। আর একটা নিস্পৃহতা ওকে নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখেছে।

যতীন বাবু নিজের খানসামাকে বললেন—ওরে ছাখ ত বড় স্যুটকেশে ওডিকোলোনের শিশি আছে, বার করে আন!

রমিতা হাত নেড়ে ইশারা ক'রে জানালে—ওসব দরকার নেই, ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্যস্ত হবেন না যতীনবাবু।

যতীন চৌধুরী হেসে বললেন—এতে আবার ব্যস্ত হবার কি আছে। আসলে যা হজম করতে পারো তার চেয়ে অনেক বেশি সৌন্দর্য গিলে ফেলেছ। ওডিকোলোনে মাথা ঠাণ্ডা হবে, দুমিনিটে ঘুমিয়ে পড়বে।

সহসা রমিতা বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসল, বললে—কিন্তু আমার এখন ঘুমোবার সময় নেই, রাত্রের ফার্ষ্ট প্যাসেঞ্জারেই যেতে হবে। কাল শুটিং আছে অন্য কোম্পানীর।

ব্রজেন ব্যস্ত হয়ে বললে,—আপনার কি মাথার ঠিক নেই না-কি মিস্ মজুমদার! এই অবস্থায় রাত জেগে ট্রেনজার্নি? হতেই পারে না। চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন দেখি।

—না, না, এ নিয়ে ছেলেমানুষী করা চলে না ব্রজবাবু। কাল, পরশু, তরশু 'অনুকল্পের' ফ্লোর নেওয়া আছে। যদি না যাই তাদের যে বিস্তর ক্ষতি হয়ে যাবে।

অনুকূল গম্ভীর ভাবে বললে—অন্ততঃ আজ রাত্রে যাবার কোনো উপায় নেই। এ আপনার খুব অন্যায় দিদি, এমন অত্যাচার কতদিন আর সইবে? আপনাদের ত কথার খেলাপ হওয়া দস্তুর আছে।

—সে কথা আপনারা সিনেমাওয়ালারা বোঝেন কই? কোনো রকমে চুন মাখিয়ে সং সাজিয়ে আমাদের ক্যামেরার সামনে হাজির করতে পারলেই আপনারা খুশি। জানেন যে টাকা দিয়ে সবই পাওয়া যায়।

—দিদি, শুধু সিনেমাওয়ালাদের দোষ দিলে শুনব না, আপনি যদি সত্যিই না নামেন ত কারও বাবার সাধ্যি নেই আপনাকে জোর ক'রে নামায়। তর্ক থাক, শুয়ে পড়ুন ত, ডাক্তার এলে তাঁর পরামর্শমত ব্যবস্থা করা যাবে। তিনি যদি বাধা না দেন তবে আর আপনাকে আট্‌কানো হবে না। যাতে আপনি অসুবিধেয় পড়েন এমন কাজ আমরা কেউ করতে চাই না।

ব্রজেন সিগারেট ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বলে—তা ছাড়া যাদের চাহিদা আছে তাদের আট্‌কানো মানেই ক্ষতি করা।

যতীন চৌধুরী এতক্ষণ বিশেষ কথা বলেন নি, এবারে ব্রজেনের দিকে চেয়ে বললেন—ক্ষতির পরিমাণটা কত? জানতে পারলে আমি হয়ত মিটিয়ে দিই।

ক্ষীণকণ্ঠে রমিতা বললে—সব ক্ষতির দাম পয়সা দিয়ে দেওয়া যায় না যতীনবাবু! আমার কথার দাম আমি ছাড়া আর ত কেউ দিতে পারে না। সে যাক্, গাড়ির এখনও অনেক দেরী। একটু ঘুমিয়ে নিলেই আমি অনেকটা চাঙ্গা হয়ে যাবো। ডাক্তারের দরকার নেই। দরকার একটু বিশ্রামের।

সকলেই পরস্পরের দিকে একবার তাকাল। অনুকূল বললে—আচ্ছা ডেকে দেওয়া যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন।

আর সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক কোণে ঝি বসে রইল শুধু। অল্পবয়সী সাঁওতাল মেয়ে, বাবুরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেও আস্তে আস্তে রমিতার বিছানার কাছাকাছি এসে বসল। এত কাছাকাছি বসরার তার আর কোনো কারণ ছিল না—নিছক কৌতূহল। রমিতা তার কাছে একটা বিস্ময়। সে রমিতার পাতাবোজা চোখের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওর কাছে রমিতার সব কিছুই অদ্ভুত মনে হয়। শহরের অনেক মেয়ে দেখেছে সে। কিন্তু রমিতা যেন তাদের কারুর মত নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ওর কথা কওয়ার ভঙ্গি, চোখের চাহনী, ওর সাবলীল তনুবিক্ষেপ—সব কিছুই সাঁওতাল মেয়েটির মনে চমক লাগায়। ও নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়িয়ে রমিতার কপালের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে কি যেন দেখছিল। শান্ত নিয়মিত নিঃশ্বাসের ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে রমিতার বুকের কাপড়ে তরঙ্গ উঠছে। সাঁওতাল মেয়েটি একবার নিজের দিকেও তাকাল। তারপর সরে দাঁড়াল। বুঝি বা নিজের বন্য লাবণ্যের সব কিছুই ও অগ্রাহ্য করতে চায়। নিজের দেহের অটুটযৌবনকে লজ্জায় সঙ্কুচিত করে রাখতে পারলে যেন ও সব চেয়ে স্বস্তি পেত। এ যেন রজনীগন্ধাকে দেখে কেতকীর লজ্জা।

বাইরে সাইকেলের শব্দ হতেই ঝি আরও খানিকটা সরে গিয়ে নিজের কোণে আশ্রয় নিল। ডাক্তারবাবু এসেছেন। এখুনি আবার ওই মদ্দগুলি ঘরে ভিড় করবে। সবাই মিলে একটি মেয়ের জন্যে কীই না করছে। ওর মনে ধারণা জন্মেছে এই রকম অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের জন্যে পুরুষরা সবই করতে চায়। রমিতার যে অসুখটা কী ও বোঝে না—রেল ত কথা কইছিল,

কোনো রকম যন্ত্রণা নেই, চীৎকার করে না, জ্বরও হয় নি! তবে কেন ডাক্তারবাবুকে ডাকা হ'ল?

যতীন চৌধুরী ডাক্তারকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন—আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু!

তারপর চা পান ক'রে 'ফি' পকেটস্থ ক'রে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন। যেহেতু রমিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে আর বিরক্ত করতে বারণ করলেন তিনি। এবং যাবার সময় বলে গেলেন—complete rest দরকার। যাই-হোক কাল সকালে আবার আমি আসব। আপনাদের কথায় মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার heart weak, এখন থেকে যদি গোড়া ধ'রে চিকিৎসা হয় তবেই ভালো—নইলে কি হ'বে বলা ত যায় না। আচ্ছা নমস্কার।

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর পার্বতী দাদার ঘরেই পাখা খুলে একটু বিশ্রাম করছিল। সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য পার্বতী বাপের বাড়ী এসেছে। সঙ্গে এসেছে তার তিন ছেলেমেয়ে নীলাম্বর, শচীন এবং নীলিমা। বলা বাহুল্য যে তিনটি ছেলেমেয়েতে বাড়িখানা তচ্‌নচ করে বেড়াচ্ছে। তাদের এই অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার সাধ্য নেই কারও। তারা একমাত্র দিদিমার কথাই মন দিয়ে শোনে, তাছাড়া আর সকলের কাছে তাদের অখণ্ড প্রতাপ—কারণ এটা তাদের মামা-বাড়ি।

নীলিমা দৌড়ে এসে মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পার্বতী এক হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে বললে—আঃ এই গরমে আর গায়ের ওপর ঠেসান দিও না মা, সরো। একটু জিরোবারও উপায় নেই তোদের জ্বালায়।

ফুট্‌ফুটে বছর তিনেকর মেয়ে নীলিমা। এখনও তার কথার আড় ছাড়ে নি ভালো ক'রে। মায়ের তাচ্ছিল্যকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। আরও

গা ঘেঁসে ব'সে মায়ের কানের কাছে মুখ রেখে বললে—জানো মা, বড়দাদা না মামাবাবুর পকেট থেকে পয়সা চুরি ক'রেছে একটু পরে।

একটু পরে অর্থাৎ কিছুক্ষণ পূর্বে। নীলিমার অভিধানে এই রকম কতকগুলি শব্দের নিজস্ব অর্থ আছে সেগুলি কেবলমাত্র তার মা-ই জানে। ইদানীং তার দিদিমাও নতুন ক'রে পাঠ নিচ্ছেন।

পার্বতী ধমক দিয়ে ওঠে—থাম দেখি, দিনরাত তোর গিন্নীপনার গুঁতোয় আর পারি না।

নীলিমার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে ওঠে, ও বলে—হাঁা ত! ছচিন বললে ত, যে দাদা ম্যাংডোলিয়া কিনবে বলে চুরি করল পয়সা।

ইতিমধ্যে আসামী নীলাম্বর এসে হাজির হয়েছে! সে বিনাবাক্যব্যয়ে নীলিমার চুলগুলো মুঠোর মধ্যে বাগিয়ে ধরবার চেষ্টা করতে করতে বলে—রাক্কুসী, অমনি টুনুস্ ক'রে মায়ের কাছে নালিশ করতে এসেছ! দাঁড়াও না, দেবো বলে সেই কথাটা?

শচীনও পিছু পিছু চীৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল—দাদা চোর—দাদা চোর।

নীলাম্বর এবারে প্রবল প্রতাপে শচীনের গলা জাপ্টে ধ'রে পা বাধিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়ে বলে—ফের যদি চ্যাঁচাবি তবে গলা টিপে সাবড়ে দেবো, হুঁঃ! চোর! তুই ব্ল্যাকমার্কেট।

ব্ল্যাকমার্কেট কথাটার সম্যক অর্থ নীলাম্বর নিজেও জানে না। তবে অত বড় একটা শব্দ প্রয়োগ করার যথেষ্ট বাহাদুরি আছে এটা নীলাম্বর নিজের মনেই অনুভব করে।

পার্বতীর আর শুয়ে থাকা চলে না। উঠে এসে নীলাম্বরকে সরিয়ে দিয়ে বলে—ও কী শচীন! দাদাকে চোর ব'লছ! দিন দিন বাঁদর হচ্ছ।

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলে—বেশ করব, একশ' বার বলব। মামার পকেট থেকে দাদা রোজ ত চুরি করে—হাঁা। এঃ দাদা না ছাই—চোর!

নীলাম্বর আস্ফালনে কিছু কম যায় না, সে মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে আর বলে—দাঁড়া তোর চোর বলা বের করছি।

নীলিমা সুর ক'রে বলে—না বলিয়া—

শচীন আরও জোরে হাঁকে—পরের দ্রব্য লইলে কি হয়?

এবারে নীলাম্বর দাঁত ভেংচে বলে—আহা! মামার জিনিস বুঝি পরের হ'ল?

পার্বতী মহামুশকিলে পড়ল, তিনটি ছেলেমেয়েকে সাম্‌লানো তার একার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আগে হ'লে সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন ওর শরীরের যা অবস্থা তাতে একটুও ধকল সয় না। তবু যদি বা ছোট দুটোকে কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখা যায় কিন্তু বড়টি কিছুতেই কথা শোনে না। দেখতে মাথায় এতটুকু হলে কি হয় নীলাম্বরের গায়ে জোর আছে।

নীলাম্বর বল্লে—আর, মামা ত জানতেই পারে নি! নিয়েছি বেশ করেছি।

পার্বতী ধমক দিল—নীলু!

নীলাম্বর মায়ের দিকে একটি আধুলি ছুঁড়ে দিয়ে বললে—চাই না চাই না পয়সা—ওই নাও।

নীলাম্বরের গালে একটি চড় বসিয়ে দিল পার্বতী।

আধুলিটি ফেরৎ দেওয়ার পর এরকম দুর্ঘটনার জন্য নীলাম্বর প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ চড় খেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সপ্তমে গলা চড়িয়ে কান্না জুড়ে দিল।

আরও কয়েক ঘা ছেলের পিঠে বসিয়ে দিয়ে গজ্‌-গজ করতে লাগল পার্বতী—আমার কপালেই কি যত বাঁদর এসে জুটবে!

চমৎকারিণীর দুপুরে খবরের কাগজ পড়া অনেক দিনের অভ্যাস। এই সময়টুকু তিনি নষ্ট করেন না। মেয়ের কাছে অবশ্য তার জন্য যথেষ্ট অনুযোগ অভিযোগ শুনতে হয়। পার্বতী প্রায়ই দুঃখ ক'রে বলে—মা যেন বদলে গেছে। দুদিনের জন্যে এলাম তা খবর-কাগজ মুখে দিয়েই ত তুমি বসে থাক। ছেলের ছেলেই নাতি হয়, মেয়েরা সব বানের জলে ভেসে এসেছে! তাদের ছেলের বুঝি আদর-আবদার থাকতে নেই!

চমৎকারিণী এসব কথা গায়ে মাখেন না, বলেন—তোর যা ইচ্ছে ব'লে নে। মাকে হাতে পেয়েছিস ছাড়বি কেন! মাথায় তুলে নাচলেই বুঝি আদর হয়! ওরা বেঁচেবর্তে থাকুক, মানুষ হোক—এই হ'লেই আমি খুশি! ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে যে ঘরকন্না করা আমার ভাগ্যে হবে না, সে কথা তুই শুনিয়ে কি করবি, আমিও জানি মা। আর ক'টা দিনই বা আছি।

চমৎকারিণীর মনে এই একটি বেদনাই নিরন্তর জাগ্রত। প্রভঞ্জন যে আর কোনদিন বিবাহ করবে এ বিশ্বাস তাঁর নেই এবং এর জন্যে সব কিছু জেনে শুনে ছেলেকে অবুঝের মত পীড়াপীড়ি করতে তাঁর ভরসা হয় না। আজও তিনি দুপুর বেলায় খবরের কাগজের ওপর শূন্য দৃষ্টি মেলে দিয়ে প্রভঞ্জনের কথা ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ···এমন সময়ে নীলাম্বরের চিৎকার কানে যেতে চশমাটা চোখ থেকে ঠেলে কপালের ওপর তুলে দিয়ে চমৎকারিণী বিস্রস্ত অঞ্চল সংযত করতে করতে এ ঘরে এলেন।

—কী রে, দিনদুপুরে যে ভূতের কেত্তন জুড়ে দিয়েছিস, এ্যাঁ!

'ভূতের কেত্তন' কথাটা পার্বতীর মনঃপুত হয় নি, সেটা মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তার চেয়েও স্পষ্ট ক'রে বোঝাবার জন্যই বোধ হয় সে এগিয়ে এসে ছেলের পিঠে গোটা কয়েক কিল বসিয়ে দিলে—বাঁদর, ভূত তোদের আবার অত কিসের? বড়লোক মামার বাড়ি এসেছিস, মানুষের মত থাকবি।

চমৎকারিণী হাজার হ'লেও মেয়েমানুষ, পার্বতীর বাঁকা কথাটি খুব সহজেই বুঝতে পারেন। মেয়েকে নিরস্ত করবার জন্য বলেন—থাক্ থাক্, ভাইকে বললে মাকেও বাদ দেওয়া হয় না। তেমন অন্যায় বলি নি মা, আমার নাতিকে আমারও বলবার এক্তার আছে, তুই অমন ঝাঁঝিয়ে বেচারার ওপর রাগের শোধ তুললি। ওকে ত মারা যেন আমাকেই মেরে বসলি! যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক বাপু। শরীর খারাপ হ'য়ে মেজাজও হয়েছে তোর।

তিনি নীলাম্বরের হাত ধরে টেনে নিলেন—আয় ভাই, আমরা আজ একটা মজার গল্প করব।

ও পাশ থেকে নীলিমা ব'লে উঠল—দিদিভাই, সেই উড়ুক্কু বাঘের গল্প বলবে, আমায়? এ্যাঁ!

শচীন বাধা দিয়ে বলে—লিলির ওই এক উড়ুক্কু বাঘের গল্প ছাড়া আর কিছু নেই। দিদিভাই তুমি বেশ নতুন ভূতের গল্প বলো। আমি রাত্তিরে লিলিকে সেই উড়ুক্কু বাঘের গল্প শুনিয়ে দেবো।

পার্বতী গম্ভীর মুখে অন্য ঘরে চলে গেল।

নীলিমা চমৎকারিণীর হাত ধ'রে বলে—দিদিভাই, মা খুব রাগ করেছে। খুব রাগ হয়েছে মার, না দিদিভাই! দাদাটা ভারী দুষ্টু!

দিদিমার সঙ্গে যাবার সময় নীলাম্বর আধুলিটা টুক্ ক'রে কুড়িয়ে নিল।

চমৎকারিণী প্রশ্ন করেন—হ্যাঁ দাদাভাই, কি দুষ্টুমী ক'রেছিলে!

নীলাম্বর চুপ ক'রে থাকে। শচীন ব্যগ্রভাবে বলে—বলব দিদিভাই, আমি জানি—এই, দাদা না—

চমৎকারিণী বাধা দিয়ে বলেন—না, তুমি নয়—নীলু। বল তো নীলু!

শচীনকে এভাবে আমল না দেওয়াতে যে নীলাম্বর খুশি হয়েছে তা শচীনের বুঝতে বাকী নেই।

নীলু বললে—মামার কাছ থেকে আমি পয়সা নিয়েছি, সেই জন্যে।

নীলিমার বড় বড় চোখ বিস্ময়ে আরও বড় হয়ে ওঠে। ও বল্লে—না, ত! দাদা ত পকেট থেকে নিল, একটু পরে।

শচীন পুনরায় যোগ দেয়—জানো দিদিভাই, মামার পকেট থেকে দাদা পয়সা চুরি ক'রেছে। এখন আবার তোমায় মিথ্যে বানিয়ে বলছে।

চমৎকারিণী অবাক হ'য়ে যান, বলেন—শচীন! তুমি এসব কথা কোথায় শিখলে! মামার পকেট থেকে নীলু পয়সা নিয়ে অবিশ্যি ভালো কাজ করে নি—কিন্তু একে চুরি বলে না।

শচীন সুর ক'রে বলে—তবে কেন বইতে লিখেছে, 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়!'

শচীনের কথা শুনে চমৎকারিণী স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, তারপর নীলাম্বরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—দাদাভাই, আর কখনও এমন ভাবে পয়সা নিও না। আমায় বলবে, পয়সা দেবো, জিনিস দেবো। মামার পকেট থেকে পয়সা নিতে যাবার দরকার কি!

নীলাম্বর এবারে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বলে—জানো দিদিভাই, বাবাকে চাইলে ত পাওয়া যায় না, তাই বাবার পকেট থেকে পয়সা নেয় মা। আর পকেট থেকে নিলে বাবা টেরও পায় না।

—ছিঃ, ওরকম ভাবে পয়সা নিও না দাদাভাই!

—বা রে, আমরা নিলেই দোষ? মা ত' সব সময়ই বাবার পকেট থেকে নেয়। আর বাবা ধরতে পারলেই বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া লাগে। তখন মা বলেন, 'বেশ করেছি, তুমিও ত ঘুষ নাও।' জানো দিদিভাই, এক-একদিন এমন ঝগড়া লাগে, আমাদের খুব ভয় করে। বাবার গায়ে যা জোর—! হাঁ দিদিভাই, ঘুষ কি করে নেয়? বাবাকে জিগ্যেস করেছিলাম। বাবা, ভীষণ ধমক দিয়েছিলেন।

চমৎকারিণীর মুখ আঁধার হয়ে আসে। তিনি ভেবে পান না, এই ন' বছর বয়সে নীলাম্বর এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তাঁর মুখ চোখের চেহারা দেখে নীলাম্বর উৎসাহিত ভাবে ব'লে যায়—সেবার হ'ল কি, একদিন রাত্তির বেলায় আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন বাবা। দেখলাম, মা কাঁদছে, আর বাবা খুব চুপি চুপি মাকে কি সব বলছেন। জানো দিদিভাই, সেদিন না আমাদের বাড়ি পুলিস এসেছিল।

দাদার কথার জের টেনে শচীন বললে—দাদাটা কিচ্ছু জানে না। বুঝলে দিদিভাই, দারোগাবাবুর সঙ্গে বাবার সে সব অনেক কথা হ'ল। বাবা নাকি অনেক টাকা কোথা থেকে নিয়েছেন। তাই দারোগাবাবুকে পাঠিয়েছিল তারা। দারোগাবাবু চ'লে গেলে বাবা বললেন, 'অনেক খরচ হয়ে গেল। তবু ত দুধে হাত পড়ে নি!' মা বললে…'তুমি আর কখনো জোচ্চুরী কাজে যাবে ত আমার মাথা খাও।' জানো দিদিভাই, বাবার ভারী বুদ্ধি।

একটা দীর্ঘশ্বাস চমৎকারিণীর বুক পিষে বেরিয়ে আসে। এইটুকু সব দুধের ছেলের মুখে এসব কী কথা!

নীলিমা তাঁর গলা জড়িয়ে বলে—দিদিভাই তুমি কেন রাগ করেছ? আমাকে সেই উড়ুক্কু বাঘের গল্প বলো না! দাদার কথা, ছচিনের কথা শুনো না তুমি। জানো দিদিভাই, পুলিস

এভাবে নীলিমা বাধা দেওয়াতে শচীন বিরক্ত হয়। কিন্তু সে জানে দিদিভাই-এর কাছে নীলিমার আদর সব চেয়ে বেশি, তাই প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও নীলিমার চুল টানার লোভ সম্বরণ করতে হয় তাকে। নিঃশব্দে চোখ পাকিয়ে নীলিমাকে শাসন করে শচীন।

চমৎকারিণী ছেলের কাছে রাত্রে সব কথাই বললেন। প্রভঞ্জন মায়ের কথা শুনে বললে—তা এর জন্যে কি করতে হবে বলো।

চমৎকারিণী বললেন—সেই কথাই জিগ্যেস করছি। জামাই-এর ভাব-গতিক ত খুব ভালো ঠেকছে না। দুধের বাচ্চাগুলোর মনেও বিষ ঢুকছে যে!

প্রভঞ্জন পায়চারী করতে করতে বলে—হুঁ, পারুকে বলেছ এসব কথা!

অসহিষ্ণু ভাবে চমৎকারিণী বলেন—আহা, তোর কি এসব বুদ্ধি হ'ল না। *জামাইয়ের নিন্দে শুনলে মেয়ে কি কবুল খাবে, না খুশি হবে? এমনিতেই বেচারী নিজের দুঃখে পাথর*—আবার সেই কথা আমার মুখ থেকে শুনলে গলায় দড়িটড়ি দিয়ে বসবে শেষে। এবার এসে অবধি পারুর মুখে হাসি দেখি নি। জয়ন্তটা শেষে এমন অমানুষ হ'লে!

—ছাখো মা, জয়ন্ত যে মানুষ হবে একথা কেউ কোনো দিন বিশ্বাস করে নি। একুশ বছরে যে ছেলে পাড়ায় বেপাড়ায় প্রেম ক'রে বেড়ায় তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হ'তে পারে না একথা আগেই জানা উচিত ছিল। তখন বাধা দিয়েছিলাম, তা তোমার মন মিষ্টি কথায় ভিজে কাঁথা হয়ে গেল। যাক সে সব পুরোনো কথা। এখন কি করতে হবে তাই বলো। যদি মাসিক টাকাকড়ি দিতে হয় তা-ই বলো, আর যদি চাও পারু এখানে থাকে—তাও হতে পারে।

—না, তাতে সংসারে অশান্তি বাড়বে। জয়ন্তর আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে। ছেলেমেয়েগুলোর ত এমনিতে বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি রয়েছে। ওর হাতে পড়ে থাকলে কিন্তু পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।

—চুরি-জোচ্চুরী করবার সময় আত্মসম্মান কোথায় থাকে? সে রাস্কেলের কীর্তিকলাপ কি আমার চেয়ে বেশি জানো! একটা শয়তান!

প্রভঞ্জন মুখের কথা শেষ ক'রেই দেখলে দরজার সম্মুখে পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে। পার্বতীকে দেখে প্রভঞ্জন বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হ'ল না, সে ডাকলে—আয় পারু, এখানে ব'স। তোর সঙ্গে অনেকগুলো দরকারী কথা আছে।

চমৎকারিণীর হঠাৎ ঘুম পেয়ে গেল, তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন—হ্যাঁরে, রাত অনেক হ'ল যে। বড্ড চোখ টেনে আসছে। আর তোরই বা কম কি বাপু, আবার ত সেই কাক না ডাকতে উঠে আলো জেলে মাথামুণ্ডু ক'রতে বসবি—দেহটাকে বিশ্রাম দে! দিন রাত হটর্ হটর্ করে ঘুরবি, রাতে একটু না ঘুমোলে যে ভারী অসুখ হয়ে যাবে। নে শুয়ে পড়।

প্রভঞ্জন বলে—না, না, পার্বতীর সঙ্গে খোলাখুলি কথা হয়ে গেলে ওর মনটাও অনেক হাল্কা হয়ে যাবে। তুমি বোঝ না কেন যে, পারু তোমার ভাঁড়ার থেকে আচার চুরি ক'রলে দাদাকে ভাগ না দিয়ে মুখে তুলত না—আজকে দুঃখের দিনেও ত আমার কিছু ভাগ পাওনা আছে। কি রে, তুই কি বলিস পারু!

পার্বতী জবাব দিতে পারে না। স্বভাবগম্ভীর দাদার এই অদ্ভুত আচরণে পার্বতী অভিভূত হয়ে পড়ল।

প্রভঞ্জন বলে—আমার কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভালো হবে না। বল ত, জয়ন্তর চাকরীর অবস্থা কেমন?

কথা বলতে পার্বতীর কষ্ট হচ্ছে, সংক্ষেপে ও বল্লে—এই একরকম।

—সে আজকাল অল্প খেটে বেশী আয়ের তালে থাকে, তাই না!

—না, তবে—আগে যুদ্ধের শুরুতে অনেক টাকা আনত। আগের মত আয় আর নেই—আমি অতশত কিছু বুঝি না।

—আজকাল ওর নাকি নানারকম খেয়াল হয়েছে?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পার্বতী বল্লে—আর কিছু আমায় জিগ্যেস ক'র না। সংসারে আমার কোনো দুঃখু কষ্ট নেই। তিনিও এমন কিছু খারাপ ব্যবহার করেন না।

—অমন করে লুকোনো যায় না পারু। তোর শ্বশুরবাড়ির সবাই যে-কথাটা জানে সেটা আমি দাদা জানতে চাইলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে

আমি সব জানি। বরং বলি কি, জাল জুচ্চুরী ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে একটা কিছু করুক। কি বলিস তুই।

—সে পুরুষ। আমি তার কি পরামর্শ দেবো! তুমি নিজে বলতে পারো।

—হুঁ! যাক, সেসব পরে হবে। ও রকম হাম্বাগের কাছে কোনো ভালো কাজ আশা করা চলে না। অবশ্য এর আগেও লিখেছিলাম আমার ল্যাবরেটরীতে আসবার জন্য—তা তখন পছন্দ হ'ল না, এসব নাকি বাজে কাজ। যাক গে, যা খুশি করুক। শচীন আর নীলাম্বরকে আমার কাছে রাখব। তুমি এটা জয়ন্তকে জানিয়ে দিও।

—দাদা!

—দাদা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলতে প্রস্তুত নয়! ছেলে দুটোকে মানুষ করতে হবে বোঝো ত! That's all, আমার ঘুম পেয়েছে। মা, সাড়ে চারটের সময় ডেকে দিও ত! অনেক কাজ আছে কাল।

চমৎকারিণী ক্লান্ত স্বরে বলেন—অত ভোরে আমি বুড়ো মানুষ উঠতে পারব না বাপু। যখন ঘুম ভাঙবে ডেকে দেবো।

প্রভঞ্জন হেসে জবাব দিলে—না, না দেরী হলে চলবে না। তুমি ত সেই সাড়ে তিনটের সময় উঠে তোমার ঠাকুর-দেবতার কানে মন্তর দেবে; তোমার যতো বুড়ো হওয়া কেবল ভোরবেলা ডেকে দেবার বেলায়। ওসব চলবে না। ডেকো কিন্তু।

ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকার কালো শেলের চশমাটা চোখ থেকে খুলে রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে বলল—Next. এরপর কে আছেন আসুন।

পাশের ঘরে প্রায় ৩০।৩৫ জন স্ত্রীলোক এবং পুরুষে মিলিয়ে অপেক্ষা করছে। ডাক্তার বাবুর গলার আওয়াজ পেয়েই দু'তিনজন লোক একসঙ্গে স্প্রিং-এর দুটো পাল্লা ঠেলে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। কম্পাউণ্ডার বললে,—জগপতি চৌবে।

জগপতি ঘরে ঢুকে গেল। ডাক্তার চশমাটা চোখে লাগিয়ে নবাগত রোগীর দিকে ভ্রূকুটি ক'রে বললে—কেমন আছ? কিছু কম মনে হচ্ছে?

—আজ্ঞে হাঁ অনেকটা। বিনীত এবং কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে নিবেদন করল চৌবে। জগপতি চৌবের এই অপূর্ব বিনয়াবতার রূপটি অতি দুর্লভ। একমাত্র বৃহত্তর মহাজনের দ্বারস্থ হ'লে সে এই পোশাকী চেহারায় করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করে। বড়বাজারের গদিতে সমাসীন শেঠ জগপতিরাম চৌবে পৃথিবীকে নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই দেখতে অভ্যস্ত। মক্কেলদের ধমক দিয়ে ছাড়া কথা বলে না সে। আজ ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হ'তে পারে ডাক্তার সরকারের চোরাগুদামে লুকোনো ওষুধপত্রগুলি সে দাঁও মেরে সস্তায় কেনবার জন্যই এরকম গড্ডুরভাব অবলম্বন করেছে।

—হুঁ, হাসি ফুটেছে দেখছি।

পাশের ছোট টেবিলে টেলিফোন বেজে ওঠে। টেলিফোনটা এমন শব্দ করে যেন মনে হয় পৃথিবীতে সেটার দাবিই সর্বাগ্রে। কম্পাউণ্ডার দৌড়ে এসে রিসিভার তুলে ধ'রে মাউথপিসের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে অনুচ্চস্বরে বললে—হ্যালো, এাঁ! হ্যাঁ আছেন! তিনি রোগী দেখ্‌তে ব্যস্ত।

ওদিকে প্রভঞ্জন সরকার জগপতিকে খুব কড়া ধমক দিচ্ছে—তোমাদের যত ছোটলোকী কাণ্ড!

—আর এ ভুল হবে না ডাক্তার সাব্।

—কিন্তু এখন কি করছ তাই বলো। নিজের আর কি, অসুখ ত সেরে গেল, ব্যাস্! ঘরে যে বৌটা মরবে। এর ওপর আবার বলছ, তার ছেলে হবে।

—আজ্ঞে তার ত কিছু হয় নি অসুখ-বিসুক।

—হয়েছে কি-না তুমি কি ক'রে জানলে? ডাক্তার হয়েছ! জানো এসব রোগ তোমার হওয়া মানেই তারও হওয়া। এখানে আন্‌লে পয়সা লাগবে ব'লে অসুখ পুষে রেখে পরে ছেলেপুলে নিয়ে নাকাল হবে! তাকে এগজামিন করাও।

—আর আমার কি ইলাজ হবে বাবু? কিছুটা ফি মাপ করে দিন দয়া ক'রে হুজুর।

—প্রভঞ্জন কঠিন কণ্ঠে বলে—না, ওসব হবে না। বাতাসী বিবির ফি এক

আধলা কমাতে পেরেছিলে? রোগ ধরাবে এন্‌তার পয়সা খরচ ক'রে আর সারাবার বেলা মুফৎ? হবে না।

কম্পাউণ্ডার টেলিফোনের মুখটা একহাতে চেপে ধ'রে ঝুঁকে পড়ে বললে—স্যার, এগারোটার সময় পার্কিনসন প্লেসে যাবার কথা বলছে।

—বলে দাও একটার সময়। ওধারে ত কেস আছেই, একবারেই সেরে আসবো।

—আচ্ছা।

কম্পাউণ্ডার রিসিভারটা প্রভঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে—পরমেশ নন্দী কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।

প্রভঞ্জন বলে—ধরতে বলুন। কেসটা সেরে নিই।

জগপতির দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রভঞ্জন বলে—কিছুদিন একদিন অন্তর ইন্‌জেকসন চলুক তারপর আবার পরীক্ষা করতে হবে। খরচ আছে বই কি! শেঠজী, দুনিয়াটা ফাট্‌কার বাজার নয়। সুখের মাশুল দিতে হবে—সস্তার সুখ। আর তোমার স্ত্রী pregnant, এ অবস্থায় তাকেও ইন্‌জেকসন দিতে হবে।

—গরিব মানুষ ডাক্তার বাবু।

—হুঁ। গরিবের ঘোড়া রোগ হ'লে তা'র চিকিৎসা ত অল্পে হবে না।

প্রভঞ্জনের অচল গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে শেঠজী বুঝল আশা ভরসার কোন কিছু নেই। বেশি দরদস্তুর করতে গেলে বিপদ আছে, কি জানি হয়ত সস্তাদরের চিকিৎসায় অসুখটা যদি আরও খারাপে দাঁড়ায়! ভেজাল দেওয়া দুনিয়ায় খাঁটি জিনিসের দর বেশি একথা জগপতির চেয়ে বেশি কে বোঝে! তাই সে ইনজেকশনের পর ষোলটি টাকা দর্শনী দিয়ে নমস্কার ক'রে বিদায় হ'ল।

জীর্ণবাস পরিহিতা বয়স্কা এক স্ত্রীলোক দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে, কেউ কিছু বলবার আগেই সোজা এসে টেবিলের নীচে মাথা গলিয়ে দিয়ে একেবারে প্রভঞ্জনের পা জড়িয়ে ধরল।

ব্যস্ত হয়ে প্রভঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—ও কি করছ ললিতার মা! কাজ করতে দাও, যাও এখন বাইরে বসো।

ললিতার মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—না, ডাক্তার দাদা আমার আর বলবার মুখ নেই। তুমি দেবতা—দেবতা, তোমার কাছে নীচু হয়ে আমরা বেঁচে আছি। তুমি না দেখলে কবে সব উজোড় হয়ে যেতো। তাই বলি, যাই একবার ডাক্তার দাদার কাছে ঘুরে আসি।

—বাইরে বসো। পরে শুনবো।

টেলিফোন ধরে প্রভঞ্জন অতি সংক্ষেপে বল্‌লে—হ্যালো, কে? পরেশ, খবর কি? ও, আচ্চা বেশ—ধন্যবাদ। কিন্তু ভাই আমি ত একটার আগে পারছি না। আচ্ছা, হ্যাঁ, তার জন্যে ভাবনা কি—আরে সেকথা বল্‌বার দরকার ছিল না। তোমার পরিচিত Patient বলে ভালো ক'রে দেখব? নইলে কি ভালো ভাবে দেখতাম না? নিশ্চয়. পয়সা নেবো আর দায়িত্ব নেবো না, তা কি হয়? আচ্ছা নমস্কার।

একটি অল্পবয়স্ক যুবক শুক্‌নো মুখে প্রভঞ্জনের সামনের চেয়ারে এসে বসল। তার মুখের দিকে ডাক্তারের দৃষ্টি পড়তে যেন আরও বিপন্ন বোধ করে। ডাক্তার প্রশ্ন করে—আপনার কি—?

বারকয়েক ঢোক গিলে, গলাটা খাটো ক'রে সে বললে—আজ্ঞে, একটু প্রাইভেট!

—বলুন, এ ঘর আমার একলার। কি ব্যাপার?

—আজ্ঞে, একটা Suspected Pregnancy.

শীতের শেষের শুক্‌নো গাছে নিষ্পত্র এবং ধূলিমলিন গাছের মত যুবকটির চোখেমুখে একটা রিক্ত রুক্ষতার ছাপ।

প্রভঞ্জন হেসে বলে—আপনি ত বেশ বিজ্ঞ দেখছি। Suspected T. B.-র মত Pregnancy একটা ব্যাধি নাকি?

ছেলেটি গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়—অন্যক্ষেত্রে এটা ব্যাধি না হ'তে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে রোগ বলাই ভালো।

—বেশ, তাহলে mature করুক, দুশ্চিন্তা কাটবে। এই বুঝি প্রথম?

—So far as I know এটাই প্রথম।

—তার মানে?

—বল্‌ব সব, একটু সম্‌ঝে নিতে সময় দিন ডাক্তার বাবু!

ছেলেটি মাথা নীচু ক'রে মিনিট দুই চুপ ক'রে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে—আপনার সাহায্য চাই। এ অবাঞ্ছিত সন্তানকে আমরা কেউই মেনে নিতে পারব না।

—আগে সেটা চিন্তা করা উচিত ছিল। সে মেয়েটি যদি অবিবাহিতা হয় তবে আপনি বিয়ে করুন। এবং সন্তানকে নিজের বলে স্বীকার করুন।

—আর যদি বিবাহিতা হয়?

—তবে ত সামাজিক স্বীকৃতি ঠেকাতেই পারে না কেউ।

—আজ্ঞে মুশকিল হয়েছে সেইখানেই। কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।

—অর্থাৎ? বিয়ে করেছেন, আর সন্তানকে অস্বীকার করতে চান? তা-ই যদি মতলব ছিল তবে বিজ্ঞানের সহায়তা আগে নিলে ভালো করতেন। এখন যা হবার তা ত হয়েছেই, উপরন্তু একটি স্বাস্থ্যের উপর অত্যাচার করা কি ঠিক হবে? It will tell upon her mind and body.

ছেলেটি হঠাৎ জ্বলে উঠে ফেটে পড়ল—তার দিকটাই দেখছেন কেবল? আর আমি, আমার বাবা-মা, ভাইবোন এদের দিকটা একবার ভাবছেন না। আমাদের বাঁচতে হলে, সমাজে মুখ দেখাতে হ'লে, ও সন্তানকে স্বীকার করা অসম্ভব। ডাক্তারবাবু আপনি বুঝবেন না অহরহ কি যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হয় আমাকে। আর পারছিনা।

—কি বলতে চান? স্পষ্ট করে বলুন।

—আমার বিয়ে হয়েছে আজ সাঁইত্রিশ দিন। বো-এর শরীর খারাপ ব'লে দিন তিনেক আগে ডাক্তার ডাকা হয়। তিনিই বলেছেন,—advanced stage.

—I see! এটা কি আপনার প্রেম-পীড়িত বিবাহ? মানে Love marriage?

—আজ্ঞে না, বাবা-কাকা সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দিয়েছেন। মার্চেন্ট অপিসের কেরানি, দু'বেলা দুটো টুইশান করি। প্রেম-টেমের সময় নেই।

ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে পায়চারী করতে করতে আরও অনেক কথা ঝড়ের বেগে বলে যায়। প্রভঞ্জন স্তব্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ একসময়ে ছেলেটি প্রভঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললে—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এমন হয় না, যাতে রোগ আর রোগী দুই-ই শেষ! যত টাকা চান দেবো! এ থেকে উদ্ধার করুন আমায়!

প্রভঞ্জন গম্ভীরভাবে বলে—উত্তেজিত হবেন না। শান্ত হোন। পাশের ঘরে লোক রয়েছে।

—আমায় পাগল ভেবেছেন, না? কিন্তু মোটেই তা নয়, আমার মত ধীর- স্থীর ছেলে ছিল না, সে যাক্! How much do you want?

—আঃ, আপনি কি ডাক্তারদের মানুষ মনে করেন না? এ প্রস্তাব অপমানকর। এসব কাজের জন্যে অন্য লোক আছে। চিকিৎসা ক'রে যাদের পসার হবার আশা নেই, তারা গোপনে এইসব কাজ ক'রে থাকে।

—But you are a man! সব শোনবার পরেও কি মনে হচ্ছে যে আমি অন্যায় করতে যাচ্ছি! পৃথিবীতে এমন সভ্য দেশ আছে যেখানে অবাঞ্ছিত সন্তানকে সম্ভাবনাতেই নির্মূল করা হয়ে থাকে—আইনসঙ্গত ভাবে সেটা সমাজ অনুমোদনও ক'রে থাকে। আমার ইচ্ছে নয় আজেবাজে লোকের হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিই, তাতে প্রসূতির স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা খুব বেশী। হয়ত উত্তেজনার বশে আমি তার প্রতি কটু মন্তব্য করেছি, তাই বলে সত্যিই ত আর মেরে ফেলতে চাই না।

—আচ্ছা ভেবে দেখি কোনো যোগ্য লোক ব্যবস্থা করতে পারি কিনা! তবে কথা দিতে পারছি না। পরে জানাবো।

—না, না, অনিশ্চিতে রাজি নই। না হয় বিকেলেই জবাব দেবেন, দুপুরটুকু ভাবুন। আমি সাড়ে পাঁচটায় আসবো।

—আচ্ছা, আপনি কি কোনোদিনই সন্তান না-হওয়া চান?

—বর্তমানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই।

—আচ্ছা, কাল সকালে ফোন করবেন। বিকেলে আমি কখন থাকব তার ঠিক নেই!

ছেলেটি গমনোদ্যত গতি সংযত ক'রে বললে—আপনার নাম শুনেছি খুব। দেখবেন, আমার কথাটা একটু সহানুভূতির সাথে ভাববার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা নমস্কার! হ্যাঁ, আপনার দক্ষিণা কি—

—আমি ত case হাতে নিইনি। থাক ওটা আর দেবেন না।

—কিন্তু এতক্ষণ সময় নষ্ট করলাম।

—এখন থাক। পরে অনেক বেশি খরচ হতে পারে। আচ্ছা নমস্কার। আর একটা কথা বলে রাখি, যদিও শুনতে ভালো লাগবে না তবু কথাটা মিথ্যে নয়—এই সব তুচ্ছ ব্যাপারকে এত মর্মান্তিকভাবে যাঁরা নেবেন তাঁদের পক্ষে পৃথিবী অচল, অথবা পৃথিবীর পক্ষে তাঁরা অপাংক্তেয়। এত বড় একটা যুদ্ধ যেখানে ঘটে গেল, সেখানে এর চেয়ে কত মারাত্মক অনাসৃষ্টি চলেছে এবং চলবে তার খোঁজ রাখেন কি? চারদিকে চোখ মেলে দেখুন!

—ডাক্তারবাবু, আমি যদি আমারটুকু না দেখি তবে কে দেখবে? তর্ক করতে চাই নে।—তবে একটা প্রশ্ন করি, আপনার জীবনে যদি এরকম ঘটনা ঘটত তাহলে আপনি কি করতেন? Honestly বলুন। অসহ্য! জানেন, দিনরাত কী যে আকাশপাতাল চিন্তা করি তার কোন অর্থ হয় না। এক এক সময় ভয় হয় পাগল হয়ে যাবো। এখন মনে হচ্ছে ওই cursed issue-টাকে যদি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে পারি তাহলেই মনের শান্তি ফিরে আসবে। অথচ নিজেকে খুব উদারচেতা বলে প্রচার করেছি। বাড়িতে সবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছি. একটি আধলা পণ নিতে দিই নি আমার বিয়েতে। কিন্তু. অবাক হয়ে যাই—ডাক্তারবাবু, Now I am ready to murder!

প্রভঞ্জন ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে—আপনি উত্তেজিত হবেন না। পৃথিবীতে আপনার চেয়ে দুঃখীর অভাব নেই।

ওপাশ থেকে টেলিফোনটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠ্‌ল। ডাক্তার নিজেই রিসিভারটা তুলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে সাড়া দিল—হ্যাঁ, হ্যালো!

ছেলেটি স্প্রিং দরজার পাল্লা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

একে একে রোগী দেখা হয়ে গেল। ললিতার মা আস্তে আস্তে ঘরে এসে বসল।

প্রভঞ্জন ডায়েরীর পাতা উল্টে আজ কোথায় কোথায় যেতে হবে দেখছিল। ডায়েরীতে চোখ রেখেই বললে—আবার কী হ'ল তোমার?

—আর দাদা, আমার দুঃখের কথা ব'লো নি। মেয়েটার অরুচি হয়েচে। এদিকে পেটে ভাত জোটে না। কিন্তু ভগবানের কি এমনি আইন—আরে বাপরে বড়লোকের ঘরদোর খাঁ-খাঁ করবে, খাবার লোক নি! আর আমাদের বস্তির একখানা ঘরে মা ষষ্ঠির দয়ায় এমনি-এমনি ক'রে গণ্ডায় গণ্ডায় বেড়াল ছানার মত সী-সী ক'রে শুকিয়ে মরতি আসবে।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পদোচিত গাম্ভীর্য বজায় রেখে ডাক্তার বলে—জামাই কি করে?

—আর জামাই! জামাই ত লয়, চামার। এই ত দিনকাল, চট্‌কলের চাকরী। তা বাবুর লবাবী কত! এক বিয়ে করা পরিবার নলিতে, তার ওপর আবার সাধের মেয়ে মানুষ আছে একটি। তিনি ত সেখানেই ছেলেন এ্যাদ্দিন। মেয়েটা চোখের সামনে হেদিয়ে মরে। তা বুঝলে দাদা, অনেক লোভ দেখিয়ে ফন্দিফিকির এঁটে জামাইকে নে এলুম। বললুম তোমায় চাকরী করতে হবে নি আমি ঘরে বসিয়ে খাওয়াবো। তা বুঝলে, বাবু ত এলেন। দিনরাত হাসি! কিন্তু গরিবের কপালে সুখ সইবে কেন? মাস যেতে না যেতেই মেয়ের অরুচি, কিচ্ছু মুখে তোলে না। বলে শরীর খারাপ করতেছে। সেই শুনে জামাই ত মহামারী ব্যাপার করলে, বললে,—নলিতে সতী লয়।' আরও কত কেলেঙ্কার, ডাক্তার দাদা। এইসব সতেরোগণ্ডা বলে, সে নেমকহারাম ত সরে পড়েছে।

—বেশ করেছে। তোমাদের মনের সাধ মিটেছে ত!

—বলতে নজ্জাও নাগে, কিন্তুক সরমের মাথা খেয়ে মেয়ের হয়ে ভিক্ষে চাচ্ছি, হেই দাদা! গরিব মানুষ এমনিতে না খেয়ে মরছি, এর ওপর বংশ বিদ্ধি হলে আর অক্ষে নেই। যদিও ভগবানের দান, তা বলে কি করি! গাছগাছ্‌ড়া অনেক করিছি, কিছুতে কিছু নয়। ও একেবারে বেদবাক্যির মত হয়ে রয়েছেন। তুমি একটা ওষুধবিষুধ দিয়ে মেয়েটারে বাঁচাও।

—ওসব করবার আমার সময় নেই। পেটে ভাত নেই, এদিকে হুঁশ থাকে না।

—হেই দাদা, অমন বলো নি। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমরা কশ্মিন কালেও জ্যান্ত পিঁপড়েটা পর্যন্ত মেরে ফেলি নি। মায়ের প্রাণ কি তা পারে? সে যারা করে তারা ডাইনী, সে ওই তোমাদের ভদ্দর ঘরের কেলেঙ্কার, যা বলব সত্যি কথা হ্যাঁ! তবে হ্যাঁ, দৈবি-টোটকা এসব করি বটে—আমরা ছোটনোক। কিন্তুক একবার জন্মালে যে সন্তান হয়, তাকে মারে কার সাধ্যি! ভগবানের ভয় কে না করে দাদা, বলো!

ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকার প্রথম যখন আধা ইংরেজ পাড়ায় পসারের জন্য বসেছিল তখন থেকেই তার সংকল্প ছিল মানুষের উপকারই করবে যথাসাধ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষকে যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আজ নীতি-দুর্নীতির সূক্ষ্ম বিচারটা তার কাছে রীতিমত সমস্যারূপে দাঁড়িয়েছে। এক দিক দিয়ে যে কাজকে সে অন্যায় প্রতিপন্ন করে অন্য দিক দিয়ে ঠিক মানবচরিত্রের স্বভাবের মানদণ্ডে ওজন করলে দেখা যায় সেই অন্যায়টাকে দোষ দেওয়া কঠিন। বর্তমানে তার ব্যক্তিত্বের বাইরের পৃথিবীকে ন্যায় অন্যায়ের বদলে সে স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক এই দুই পর্যায়ে ফেলে দেখ্‌তে শুরু ক'রেছে।

ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকার অধিকতর গাম্ভীর্য সহকারে বলে—আজ বড় ব্যস্ত আছি ললিতার মা। আমার এসব করার সময় নেই।

—আচ্ছা দাদা, তবে কাল এসব! কিন্তু তুমি দয়া ক'রে এযাত্রা অক্ষে করো দাদা।

—না, না ওসব আমায় চাপিও না।

—দাদা, তোমার কাছে ছাড়া আর কোথায় যাই বলো। রাগ করো না দাদা, তোমার ত হাতযশ এদিকে আছেই। গরিবকে একটু ক্ষ্যামা ঘেন্না ক'রো। দুধের বাছা আমার মরতে বসেছে!

পার্কিন্‌সন প্লেস। দুপুরবেলা পথে লোকজন নেই। দু' একটি মোটর নিঃশব্দ পরিবেশকে মুহূর্তের জন্য উচ্চকিত ক'রে চলে যায়। পথের দুধারে বড় বড় গাছ, তার ডালের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে নীচের ছায়াচ্ছন্ন মাটিতে—রোদের টুক্‌রোগুলো যেন কোন শ্যামলী মেয়ের কানে মিনে করা ঝুম্‌কো।

একটি তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়ীর দোতলার জানালায় উদ্‌গ্রীব একটি মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি এক একবার জানালায় এসে দাঁড়াচ্ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট একটি হাতঘড়িতে একবার সময় দেখছে এবং নিজের অজ্ঞাতেই নিজের বেশবিন্যাস আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখে নিয়ে আবার জানালায় ফিরে আসছে।

ঘরের ভিতর একটি সেটিতে বছর ত্রিশের একটি সুদর্শন ব্যক্তি বসে বসে মার্কিনী কোনো সচিত্র মাসিক পত্রিকার ছবি দেখতে ব্যস্ত। মেয়েটির চলাফেরা তার তন্ময়তাকে কিছুমাত্র ব্যাহত করছে না।

এক সময়ে মেয়েটি হতাশভাবে ফুলদানী রাখার মাঝারী টেবিলের ওপর বসে পড়ে বলল—দ্যাখো পরমেশ, তোমার ডাক্তারটির কাণ্ড! দেড়টা বাজতে চললো এখনও পাত্তা নেই।

—দেড়টা বেজে গেল? আমি চলি, আজ কামাই করা চলবে না।

—না, না, আমার অসুবিধে হবে। সব কথা বলতে কেমন সংকোচ হয়। থাকো।

—তুমি-ই আমার সর্বনাশ করবে। একেবারে প্রফেসরের সাম্‌না-সাম্‌নি ধরিয়ে না দিলে আর উপ্‌কার কি করা হ'ল?

—তোমার সর্বনাশ কেউ করতে পারবে না। সূর্যকে কেউ পুড়িয়ে মারতে পারে? উঃ কী আমার ছাত্র রে! ক'বছর ডাক্তারী পড়ছ?

—তা হিসেব ক'রে দেখলে হয়ত দেখা যাবে যে প্রভঞ্জন সরকারের সঙ্গেও পড়েছিলাম। প্রভঞ্জন কিন্তু খুব ভাল ছাত্র ছিলেন।

—ব্যবসায়ী মোটেই ভালো নন। সময়ের সম্বন্ধে একেবারে বেহুঁশ। দেড়টা বেজে গেল। পাত্তাই নেই!

—তা যা বলেছ। রোগীকে ধ'রলে ত তাকে জেরায় জব্দ ক'রে ছাড়ছে। সেই হচ্ছে ওকে নিয়ে মুশকিল। অনেক কেস্ ছেড়ে দেয়, বলে, 'সময়ে কুলোতে পারি না।'

পরমেশ এবং রমিতা যখন এইসব আলোচনা করছিল সেই সময়ে নীচে একখানা গাড়ি দাঁড়াল।

হালে আমদানী সিংরোঁয়া গাড়ি থেকে ডাক্তার সরকার বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে রমিতা নেমে এসেছে, ডাক্তারকে নমস্কার ক'রে রমিতা বললে—আপনিই ডাক্তার সরকার? আসুন।

—হ্যাঁ! ব'লে প্রভঞ্জন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—আমি রমিতা রায়। আসুন, ওপরে আসুন।

উপরে উঠতে উঠতে ডাক্তার সরকার প্রশ্ন করে—নন্দী এসেছে না?

ঘরের ভিতর থেকে পরমেশ সাড়া দেয়—এই যে, আসুন স্যার।

ঘরে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করে—তারপর কি ব্যাপার?

পরমেশ বার কয়েক কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—তেমন কিছু নয়। আপনার পেসেণ্টকে ত দেখলেন। ইনি নামকরা ফিল্ম্ স্টার। বর্তমানে খুব পসার।

—That is immaterial. অসুখটা সম্পর্কে কিছু জানো নাকি?

পরমেশ হেসে জবাব দেয়—এ সব লাইনে যা যা হ'তে পারে, মোটামুটি এঁর সে সবই আছে।

—I see. কই তিনি কোথায় গেলেন? সময় অল্প, তাঁকে ডাকো।

পাশের ঘর থেকে রমিতা সাড়া দিল—দয়া ক'রে এ ঘরে আসুন ডাক্তার বাবু।

পর্দা সরিয়ে দিলে পরমেশ। ডাক্তার সরকার ঘরে ঢুকে দেখলে রমিতা কাউচে বসে আছে।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ডাক্তার বসে বলল—প্রথমে আপনার রক্ত পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে। আগে দেখা দরকার—

তাঁর কথা শেষ না হ'তেই পিছন থেকে পরমেশ বললে—আপনার সুবিধের জন্য ব্লাড্ এ্যানালিসিস্ থেকে শুরু ক'রে যা যা দরকার মোটামুটি সবই করিয়ে রেখেছি—এই দেখুন।

পরমেশের দিকে তাকিয়ে প্রভঞ্জন অকুণ্ঠভাবে হাসতে লাগল—আরে ভুলেই গেছলাম তুমিই ত ডাক্তার! Thanks.

এক মিনিটের মধ্যে এক গোছা রিপোর্ট সে এনে ধরলে ডাক্তারের সম্মুখে। উল্টে পাল্টে দেখে ডাক্তার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একবার রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—হুঁ। তা ত বুঝলাম। কিন্তু সময় নেবে বেশ।

রমিতা ম্লান হাসি হেসে বলে—সে কথা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। তবু আন্দাজ কতদিনে সারবে মনে করেন?

—সারা না-সারা আপনার হাতেই বেশি নির্ভর করে।

—তাহলে বোধহয় নীরোগ হওয়া আমার ভাগ্যে নেই।

—তার মানে, রোগ পুষে রাখতে চান নাকি। তবে আর ডাক্তার ডাকা কেন?

রমিতা চোখমুখ ঘুরিয়ে মোহিনী ভঙ্গীতে বলে—চিকিৎসা দরকার শুধু শরীরটাকে কাজ চলার উপযুক্ত রাখার জন্য। আপনি আমি এই যেমনটি কাটাচ্ছি তেমনিই কাটাবো, শুধু ওষুধপত্তর দিয়ে সামলে যাবেন। আমার ধর্ম যৌবনধর্ম! আমার কর্ম জৈবপথে। অবিশ্যি জীববৃদ্ধির পথ মোটেই নয়! এসব কথা হয়ত খারাপ শোনাচ্ছে, কিন্তু কি করব, আত্মপরিচয় না দিলে আপনারই কাজের অসুবিধে হবে।

—আপনি একটি peculiar case. আমার চেয়ে ভালো ডাক্তারের হাতে আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার। ব্যাধির চেয়ে আধিই বড়। মনটাই বেশি অসুস্থ।

—না ডাক্তার বাবু, আমার মনের কোন রোগ নেই। এ মনকে মানিনা আমি। মন বলে কিছু নেই।

কয়েক মুহূর্তের মত কেউ আর কোন কথা বলে না। ঘরখানা নির্জন পথের মতই স্তব্ধ। দেয়ালের বড় ঘড়িটা টিক্ টিক্ ক'রে চলছে। জানালার পর্দাটা তারের বাঁধনের বাধা পেয়ে বাতাসের বেগে ফুলে ফুলে উঠছে। মাথার ওপর পাখা ঘোরার একটা নিরবচ্ছিন্ন সোঁ সোঁ শব্দ।

ডাক্তার সরকার প্রশ্ন করে—আপনি কি এতে খুব আনন্দ পান? এই ধরনের জীবনযাত্রায় কি মাধুর্য বলুন ত?

রমিতা তির্যক দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে জবাব দেয়—এ প্রশ্নটা কি চিকিৎসার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, না কি কৌতূহল?

—ব্যক্তিগত কৌতূহল নয়, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা!

—তাহলে শুনুন, আমি আনন্দও পাই আবার কষ্টও পাই।

বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল। রমিতা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত ভাবে পরমেশের দিকে তাকিয়ে বললে—গাড়িটা বার করো। I am sorry ডাক্তার বাবু, আমার খুব জরুরী কাজে বেরুতে হচ্ছে। আর এক মিনিটও আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। মাপ করবেন। If you don't mind—কাল ঠিক একটার সময় আসবেন।

পরক্ষণে রমিতা উঠে চলে গেল। প্রভঞ্জন ঠিক বুঝতে পারে না তার কি করা উচিত। আধ মিনিটের মধ্যেই একজন বৃদ্ধ এসে ডাক্তারকে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল—এই যে আপনিই ডাক্তার সরকার, কিছু মনে করবেন না, মেয়েটা আমার ওই রকম খামখেয়ালী। হ্যাঁ, দেখলেন ত সব? ওর আর সবই ভালো, দোষের মধ্যে মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, বুঝলেন!

ডাক্তার সরকার উঠে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে পড়ল—ওকী, এরই মধ্যে চললেন নাকি? বসুন না একটু গল্প করা যাক। না, থাক আপনি খুব ব্যস্ত। আচ্ছা একদিন সময় ক'রে আসবেন, চা-টা খাওয়া যাবে। বুঝলেন, এখানে বড় Lonely মনে হয়। আজ আপনি বড্ড ব্যস্ত না? এই যে আপনার ফি-টা ধরুন।

কখনও প্রভঞ্জন কোনো রোগীর কাছে এরকম অভদ্র আচরণ পায় নি। নূতন অভিজ্ঞতার ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারে নি ব'লেই বৃদ্ধের কথাটা শুনতে পায় না সে। দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় প্রভঞ্জন। বৃদ্ধ আরও খানিকটা এগিয়ে তার হাতে পাঁচখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল। প্রভঞ্জন যেন চিন্তারাজ্য থেকে ফিরে তাকাল—একী! এত কেন? আমার ফি কুড়ি টাকা।

বৃদ্ধ জিভ কেটে বললেন—সে কী হয়! আপনার ফি যাই হোক রুদ্রি যে পঞ্চাশ টাকা দিতে বলে গেছে।

—না, সে হয় না। তিনি যাই বলুন এ তিরিশ টাকা আপনি রাখুন।

বৃদ্ধ বলে—সে আমি পারব না মশাই।

—Impossible. I am not a beggar. ন্যায্য পাওনার বেশি কেন নেব? তাঁকে বলে দেবেন দুনিয়ায় টাকা দিয়ে সব কেনা যায় মনুষ্যত্বটুকু ছাড়া। আচ্ছা নমস্কার।

বৃদ্ধ একবার চারদিকে বেশ ভালো ক'রে চেয়ে দেখে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল—নিলেই পারতেন, She has enough to spare. ওর ত দেখি খরচা হয় না আর কিচ্ছু। খরচ যা ডাক্তারের পিছনেই।

প্রভঞ্জন সরকার গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার আগে একবার ডায়েরী খুলে দেখে নিল এরপর কোথায় যেতে হবে। মনে মনে সে হিসেব ক'রে দেখলে এখনও চারটে বাড়ি বাকী!—তার মধ্যে একটি সিরিয়াস টিটেনাস কেস, দুটি পুরোনো জ্বর। বাড়ি ফিরতে চারটে বেজে যাবে।

ষ্টিয়ারিং ধ'রে তার মনটা উদাস হয়ে যায়। সামনের ফাঁকা রাস্তা যেন মোহ বিস্তার করে তার মনোরাজ্যে! অনেকক্ষণ পরে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সেই কোন সকাল থেকে শুরু হয়েছে একটানা দুঃখের ইতিহাস শোনার পালা—বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র সমস্যা। সকলেই ডাক্তারের কাছে আসে দুঃসহ বেদনার ভার নামিয়ে দিতে, আশ্বাস খুঁজতে।

গাড়ির গতি কিছু মন্থর ক'রে দিয়ে প্রভঞ্জন সামনের দিকে পা ছড়িয়ে মুখের সিগারেটটা দু-এক টান দিতে দিতে চোখের সামনে দেখলে—একটি

সুন্দর মুখ। সে মুখের কমনীয়তা, কোমল আবেদন, ওষ্ঠের রক্তিম আভা, চোখের ঘন টানা চাহনী—সবই সুন্দর। এ ত রমিতার চেহারা। কিন্তু মেয়েটির মন যেন মাটি ছোঁয় না। একটা কঠিন অবজ্ঞার ঔদ্ধত্য। পরক্ষণেই ডাক্তারের মনে পড়ে যায় রমিতার রক্তের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের হিসাব—রোগজর্জর প্রতিটি রক্তকণিকা। রমিতা তার কাছে একটি জটিল সমস্যা। জগপতি চৌবের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই কি? আছে, জগপতি রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় আর রমিতা চায় না। প্রভঞ্জনের মনে হয় এই সব মেয়েই সমাজে রোগ-বিস্তারের কেন্দ্র হয়ে ছড়িয়ে বেড়ায় বিষ।...তার মনে পড়ে যায় Salversion, Neosalversion, Bismath, Penicillin. ক্রমে ক্রমে কত জীবনকে বিপন্ন ক'রে কত সময় অতিবাহিত হয়ে তবে এই চিকিৎসা উন্নততর পথে এগিয়ে এসেছে। একদিকে যেমন বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করেছে তেমনি আর এক দিকে মানুষের অত্যাচারের প্রবৃত্তিও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। পথ যতই মনোরম হোক না কেন, পথিকের অসম্বৃত পদলাঞ্ছনায় তার সে সৌন্দর্য মূল্য পায় না।

রাত সাড়ে-এগারটার সময় রমিতার বাড়ির সামনে একটি গাড়ি এসে থামল। দুপুরে যে গাড়িতে রমিতা বেরিয়েছিল এখানা সে গাড়ি নয়—তার চেয়ে অনেক দামী। দুটি তরুণ যুবক তাকে গাড়ি থেকে ধরে নামায়। তার আলগা আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শিথিল হাতে আঁচল তুলে নিয়ে রমিতা বললে—আচ্ছা আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ ফ্রেন্ড। আজকের মত বিদায়। আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট করলেন, ধন্যবাদ।

একজন বললে—না, না কষ্ট কি? চলুন ওপরে পৌছে দিয়ে আসি।

—তার দরকার নেই। নারী হ'লেও আমি অবলা নই—If I can stand so many pegs and you all, then I can walk this way at ease. কিছু ভাববেন না।

তরুণ দুটি ব্যস্ত হয়ে বলে—আমাদের এভাবে তাড়িয়ে দেবেন না, এই ক'টা সিঁড়ি, সঙ্গে গিয়ে পৌছে দিয়ে আসি, অনুমতি দিন।

রমিতা আধবোজা চোখের পাতা মেলে দিয়ে বলে—তারপর? যবনিকা! কালো যবনিকার গভীর অন্ধকারে পথ হারিয়ে যেতে পারে, হয়ত ফিরে আসবার পথও খুঁজে পাবেন না। আমারও একদিন হয়েছিল এমনি—সেই থেকে চলেছি ত চলেছিই। আজও চলছি, আরও কত কাল চলতে হবে কে জানে—

অপেক্ষাকৃত যে ছেলেটি সুন্দর সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে—আপনার কথাই যেন সত্যি হয়—পথ যেন হারাতে পারি—

তারপর ছেলেটি রবীন্দ্রনাথের একটি গান গুণগুণিয়ে গেয়ে উঠলো।

রমিতা সহসা ভ্রূকুটি ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কে যেন ওর সমগ্র সত্তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। স্পষ্ট জড়তাবিহীন কণ্ঠে রমিতা বললে—রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আপনাদের জন্য কলম ধরেন নি। দোহাই তাঁকে আর উত্যক্ত করবেন না দীপ্তেন বাবু!

—মাপ করবেন। আমি সত্যিই—সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি।

—সে যদি বলেন ত আমিও আপনাকে ভালোবাসি। কত ছেলেকে ভালোবেসেছি তা যদি জানতেন—?

—আমার তা জানবার দরকার নেই, শুধু চাই ভালোবাসতে। সে অধিকারটুকু পেলেই খুশিতে পাগল হয়ে যাবো।

—দোহাই আপনার, আমাকে যেন পাগল করে মারবেন না। রাস্তায় দাঁড়িয়েই যা উচ্ছ্বাস, তাতে এত রাত্রে বাড়িতে ঢুকতে দিতে ভরসা হয় না। আচ্ছা আজকের মত নমস্কার।

—আর এক মুহূর্ত সময় চাই। এই আংটিটা তোমায় পরতেই হবে, এটা অনুরোধ নয়, প্রার্থনা।

রমিতা সাগ্রহে হাত পেতে নিয়ে আংটির দিকে না তাকিয়েই বললে—আসল হীরে যে।

—তোমাকে কি নকল দিতে পারি?

—অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু এত ভালো হীরে দেখি নি। আসল হীরের জ্যোতিই আলাদা, কি বলেন?

—কাল আবার দেখা হবে।

রাজকুমার দীপ্তেন উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

—কাল অন্য কাজ রয়েছে যে! অন্য ষ্টুডিয়োতে—।

—আচ্ছা বেশ ত, কখন বেরুবে বল, পৌঁছে দিয়ে আসব।

—ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না। একচেটে করতে গেলে ঠকবেন দীপ্তেন বাবু।

—না, না তা নয়। I am always yours. কাল আসব!

রমিতা আর একমুহূর্তও দাঁড়ায় না। শরীরটা ক্লান্ত, কি রকম যন্ত্রণা হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। কোনো রকমে শয্যার আশ্রয় নিতে হবে ওকে।

ছেলে দুটি ওর চলে যাওয়ার গতিভঙ্গির পানে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সিঁড়ির বাঁক ফিরে রমিতা অদৃশ্য হয়ে না যায়। তারপর দুটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রেখে গাড়িতে গিয়ে বসল তারা। এতক্ষণ যে ছেলেটি নির্বাক ছিল, সে এবারে বললে—Charming, সত্যি the precious Jewel. তোর নজরের তারিফ করি দীপ্তেন। একেবারে স্বপ্নলোকের উর্বশীর দীপ্তি নিয়ে নেমে এসেছে। হীরের আংটি কেন, দিতে পারলে নিজেকে লুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কি খাই খাই বুক—!

—হ্যাঁ! তুই খুব ফস্ ফস্ করিস্ আমার কাছেই। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। টুঁ শব্দটি করলি না!

—না ভাই কেমন যেন হয়ে হয়ে গেল। অবাক হয়ে শুধু ওকে দেখলাম—আর দেখলাম—আর দেখলাম। কথা ফুরিয়ে গেল, হাওয়া উবে গেল, পৃথিবী মুছে গেল—শুধু রইল ওই ছবি। সে ছবি উর্বশী বলতে পারো, মোনা লিসা বলতে পারো, বিয়াত্রিচে বলতে পারো, বিম্ববতী বলতে পারো, Keats-এর La belle dame sans merci-র ছবি বলতে পারো।

> And her eyes were wild
> ...And there she lulled me asleep
> And there I dreamed—Ah!—woe betide!

আমার হুঁশ ছিল না ভাই। চলে গেল তখন যেন মনে হ'ল···And no birds sing'.

—থাম, থাম। এখন বাজে না বকে কাল দুটো কবিতা লিখে নিয়ে আসবি। ওকে শোনাবো। এই ত শুরু—এরপর সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। I must have her—possess her.

এক জায়গায় গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে দীপ্তেন বললে—এখানে নামবি ত রতীন? কাল সকালে কিন্তু কবিতা আমার চাই। দেখব তোমার কাব্যরস কেমন মিষ্টি।

—নিশ্চয়। এমন inspiration পেলে দেখিস বাংলাদেশকে ন্যাকামীর বন্যায় ভাসিয়ে দেবো—গদ্য কবিতা নয়. দস্তুর মত, ছন্দের জোয়ার দিয়ে। তাজা রক্তের মত জীবনময় কবিতা!

—সে কি রে old school! মিল দেওয়া কবিতা?

—বন্ধু, তবে সত্যি কথাটা বলি। যখন ভাব আর ভাষা একসঙ্গে জোটে তখনই হয় কবিতা—গদ্য কবিতা হচ্ছে ভাষার দৈন্যে গোঁজামিল।

— I don't admit.

—আমিও করতাম না বিশ্বাস। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে মিল দেওয়া কবিতাই কবিতার পূর্ণাঙ্গ। দেখই না কাল লিখে তোমায় শোনাই। আজ রাতে আর কোনো কাজ নয়।···তোমার জাগ্রত রাত্রি স্বপ্নে স্বপ্নে প্রভাত হোক, মধুর বেদনায় পাগল করুক তোমায়! আচ্ছা, বিদায় বন্ধু।

গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ হল, পরক্ষণে গাড়িখানা রতীনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাত্রির নির্মল আকাশে উজ্জ্বল অসংখ্য নক্ষত্র উন্মনা রতীনকে তন্ময় করেছে।

সারাদিনের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। শুভ্র শয্যার নিবিড় আমন্ত্রণে রমিতা শিথিল বিবশ দেহ এলিয়ে দিল।

দিনমান কাটে প্রকাণ্ড বন্যার বেগে। প্রতি পদে ও ভুলে থাকে আপনাকে। নিজেকে ভুলে থাকাটা ওর সাধনার্জিত। কিন্তু রাত্রি গভীর

হয়ে ওঠে আর ওর একাকীত্ব জেগে ওঠে। অনেক চেষ্টা করেও রমিতা এই ভয়াবহ একাকীত্বকে এড়াতে পারে না। ক্লান্তিতে দেহের প্রতিটি অনুভূতি যখন শিথিল, নির্জীব হয়, যখন ওর নিজের ওপর নিজের দখল থাকে না, তখন ভয়ঙ্কর নেই একাকীত্ব ওকে পেয়ে বসে। এর হাত থেকে নিস্তার নেই। চোখের ঘুম চলে যায়, নেশার ঘোর কাটে। ওকে দাঁড়াতে হয় নিজের মুখোমুখি। একটিই প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর আজও দিতে পারে নি ও। প্রশ্ন—এর শেষ কোথায়? কোথায় চলেছ?

প্রত্যহের ঘটনা-প্রবাহ ওর মনে চলচ্চিত্রের মত ঘুরে ঘুরে দেখা দেয়। মনের আপাত প্রসন্নতাকে তিক্ত করে, দগ্ধ করে। আজও বিছানায় শুয়ে পড়ে রমিতা দেখতে লাগল সারাদিনের ছবি।

ষ্টুডিওর ছবি।…অনুকূলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপনকারী যে ক্ষুধিত আদিম মানুষ উঁকি দিচ্ছে, তাকেই রমিতার সবচেয়ে বেশী ভয়। বাসাডেরার পাহাড়ে অনুকূল প্রথম যে ছবি তুলেছিল কয়েক মাস আগে, সে ছবি আজও অনুকূল দিল না রমিতাকে, একবার মাত্র দেখিয়েছিল। তারপর সেটাকে বড় করে আঁকিয়েছে। আজ সেকথা স্বীকার করেছে সে। ছবিটি সে নিজের সঙ্গে সঙ্গেই রাখে। যথেচ্ছভাবে ছবিটি চুম্বন করে সে। ছবিটি সে একান্ত গোপনে রেখেছে। সে বলছে—একমাত্র তোমাকেই সে ছবি দেখাতে পারি রমিতাদি, আর কাউকে নয়। ওটা আমার জীবনের সম্বল। তুমি চলো আজই দেখাবো। রঙ চড়িয়ে যা দাঁড়িয়েছে! So lovely!

অদ্ভুত মানুষ অনুকূল। তাকে জোর করে দূরে সরিয়ে দেওয়া খুবই শক্ত, অথচ অনুকূলকে মেনে নেওয়া আরও অসম্ভব।

রমিতার অবসর নেই। পরিচালক, লেখক, চিত্রকর, পরিবেশক এদের ভিড় কাটিয়ে কোথাও একান্তে যাওয়ার সময় কই—বিশেষ করে নিজের একটি ছবি দেখবার জন্য যাওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক। তার চেয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফাঁকা পথে বেড়াতে গেলে হাওয়া লেগে মাথা হাল্কা হয়। সেজন্য আজ রমিতা দীপ্তেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল। ছবির বাজারের লোক নয় দীপ্তেন। রমিতার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যই সে ষ্টুডিওতে ঘোরাঘুরি করছে।

আজ ওদের পরিচয়ের প্রথম দিন।

দীপ্তেন নিতান্ত ছেলেমানুষ। নেহাৎ ভাবালুতার ফানুস। এ ধরনের ছেলেদের নিয়ে চলাফেরায় বিপদ আছে। এতো অল্পেই বেশি আঘাত পায় যে, ভরসা করে দুটো কথা বলতেও সংকোচ হয়। শিকারের অযোগ্য। এদের আঘাত দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না—অনুকম্পায় মনটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে। তবু তরুণ কমনীয় কান্তির মাদকতা কে অস্বীকার করতে পারে! নিজের সংকল্প ত ভুলতে পারে না রমিতা! মিহিরলালের অত্যাচারের প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। সমগ্র পুরুষ সমাজকে ও চিনেছে মিহিরের মধ্য দিয়ে।

দীপ্তেনকে নষ্ট করতে মায়া হয়—কিন্তু লোভটা তার চেয়ে ছোট নয়। মায়া দয়ার মূল্য বিচার করবার দায় এখানে নেই। হোক না নষ্ট। ওরা ত তাই চায়। রমিতার কোন মায়াদয়া থাকলে চলবে না।

রমিতার মন অন্য দিকে ফিরে তাকায়। ভবিষ্যত। একটা অন্ধকার ঘর, কোন দরজা নেই, জানালা নেই—অন্ধকার। ও একলা!…একটা রহস্যময় বিভীষিকার আতঙ্কে ও যেন শিউরে উঠল। চীৎকার করে উঠল রমিতা। তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে যায় তার। অন্ধকারের কোন নীচে পৃথিবীটা ডুবে গেল। ঝিম্‌ঝিম অনুভূতি—তারপর শূন্য। কিছু নেই।

পাশের ঘরে বৃদ্ধ পরিবর্তন বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসল! আস্তে আস্তে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে চারদিকেত াকিয়ে নিল একবার। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসে মেয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। অস্ফুটস্বরে বললে বৃদ্ধ—Smelling salt!

পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ আপন মনেই বলে—থাক। এ অবস্থায় যেটুকু থাকে সেটাই ওর লাভ। থাক! মরবে না, মরবে'না। শুধু অজ্ঞান হয়ে থাকুক না, মন্দ কি!

সে নিজের ঘরে ফিরে আসে। মেয়েকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে চুপ করে থাকা যায় না। ঘুম নেই চোখে। নানান টুকরো চিন্তা, অতীতের অসংখ্য স্মৃতি থেকে এক একটি কথা সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

বৃদ্ধ পরিবর্তন মজুমদার মেয়েকে চেনে ভালো করেই। অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছে, অঙ্ক ভুল হয় নি কখনও। না, ঠিক তা নয়—ভুল হয়েছে বই কি—একবার হয়েছে ভুল। সে ভুলই ত আজকে সারাটা জীবনকে ছেয়ে দিয়েছে আগাছা আর কণ্টকলতা দিয়ে। সমগ্র নির্ভুলের সমষ্টিকে খর্ব করে দিয়ে উদ্ধত সত্যের মত সেই একটি ভুলই মোচড় দিয়ে জীবনকে কঠিন বেষ্টনে জড়িয়ে ধরেছে।

রমিতাকে পরিবর্তন মজুমদার গড়ে তুলতে চেয়েছিল অসামান্যা বিদুষী করে। মা-হারা মেয়েকে কোনোদিন সে বুঝতে দেয় নি কোনো অভাব। আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন, রমিতা কখনও টের পায় নি যে, তারা বড়লোক নয়। পরিবর্তন মজুমদার নিজেকে বঞ্চিত করে পয়সা বাঁচিয়ে মেয়ের প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়েছে।

…তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে রমিতা তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করে ওঠে—বার করে দাও, তাড়িয়ে দাও ওকে। আমায় অপমান করেছে! অপমান? কই, গেলে না তুমি!

রমিতার কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে যায় আপনিই।

মেয়ের ঘরে ফিরে গিয়ে পরিবর্তন বলে—সান্ত একটু ঘুমোও মা। ঘুমোও! কেউ ত নেই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। মেয়েটির সারা দেহ নিংড়ে যেন এই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। তারপর সে আস্তে আস্তে বলে—"মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে-জ্ঞানকে পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে।" কিন্তু মানুষের সংস্কার কাকে বলে? বাবা তুমি একটু বসো, আমি বড় ক্লান্ত—কিছু বুঝতে পারছি না। 'জ্ঞান বড়, না জীবন, বল তো বাবা!'

পরিবর্তন স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে—জীবন না থাকলে জ্ঞানের দেখা কোথায় পেতে মা? জীবনকে বাদ দিয়ে ত জ্ঞান নেই! তবে জ্ঞানহীন জীবনেরও কোনো মূল্য নেই।

—কোনো মূল্য নেই? কে বিচার করবে? তুমি কিছু জানো না বাবা।

এ সব কথাই পণ্ডিতদের অহংকার। জ্ঞানের দরকার সামান্যই। দরকার শুধু রূপের, শুধু দেহেরই দাম দেয় মানুষ।

—সান্ত্বনা ঘুমোও এখন মা। একটু ঘুমো তুই! মানুষ যে দাম দিল তার চেয়ে বড় মূল্য আত্মমর্যাদা—সেটা নিজেদের কাছে পেতে হয় না।

—আমার ঘুম আপনিই আসে। যেমন একদিন এসেছিল মিহির। শোনো বাবা, মিহির কিন্তু গোড়াতে খুবই ভালোবেসেছিল। তুমিও জানো। বাসে নি?

মেয়েকে নিরস্ত করবার কোনো উপায় খুঁজে পায় না পরিবর্তন। এক একদিন মনে হয় যে, বকতে বকতে রমিতা পৃথিবীর ওপর ঘৃণায় বিরক্তিতে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে সংজ্ঞাহীন না হওয়া পর্যন্ত অনর্গল বকে যায়।

রমিতা বলে—ওদের কি বলব বাবা। ওরা লোভী, ওরা ভিখারীর মত দোরে দোরে প্রেম ভিক্ষা করে বেড়ায়। এ ওদের স্বভাব। এ স্বভাবকে প্রশ্রয় দেয় যেসব মেয়ে—তাদেরও কিছু বলব না। কিন্তু ওই ভিখারীদের আশ্রয় বলে ভুল করলেই আর মরণকে ঠেকাতে পারে না। আমি ব'লে নয়। তুমি দুঃখু কর না বাবা, মনে কর না যে তোমার ভুলেই সান্ত্বনার আজ এই অবস্থা হয়েছে। মোটেই তা নয় বাবা, পৃথিবীতে সবাই মিহিরলাল। হ্যাঁ বাবা—এ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা যায় না? জীবনের যথাসর্বস্ব বাজী ধরে যে অভিজ্ঞতা পেলাম তাকে জ্ঞান বলতে বাধা কি?

পরিবর্তন এবারে ধমকের সুরে বলে ওঠে—পাগলামী করতে হবে না, তুই ঘুমো।

—আচ্ছা, আচ্ছা ঘুমোবো। জামাইয়ের নিন্দে বুঝি সইছে না?

—মেয়ের অপমৃত্যু দেখতে পারি—আর? আচ্ছা বুড়ো ছেলেকে কাঁদিয়ে তুই কি সুখ পাস মা? তুই যেন সত্যিই পাষাণী হয়ে গেছিস—নিজের রক্ত পান করিস আর ছেলেকে আঘাত করিস। তার চেয়ে আমায় ছুটি দে, পাপ চুকে যাক।

—সে বেশ হয়। কিন্তু তার জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। হাতের মুঠোর মধ্যে মরণের বীজমন্ত্র রয়েছে আমার। কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হয় নি এখনও।

—কে কার কাজের বিচার করবে মা।

—বিচার করব কেন? সেটা ত কাপুরুষের কাজ। আজকের পৃথিবীতে বিশ্বাস, বিচার, ন্যায়—কিচ্ছু নেই। আছে স্বাধীনতা—যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা। পশুর মত প্রতিশোধ নিতে হবে পৃথিবীর কাছে। সমাজকে পঙ্গু করতে হবে। যে সমাজের আশ্রয়ে এইসব বাঁদর মাতব্বরী করে বেড়ায় তাদের নাচিয়ে, নাচ দেখে খুশি হয়ে তবে ফিরব।

—আমি বুড়ো মানুষ, তুই শুয়ে পড়লে এখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোতে পারি।

—তোমায় ছাড়বো না বাবা। স্নেহে, যত্নে লালন করার অপরাধ ত তোমারই। তুমিই বোকা বানিয়ে রেখেছিলে—তার ফল পেতেই হবে। আমার ঘুম নেই? সেই সকালে উঠে শুরু হয়েছে বাঁদর নাচ দেখা, আর চলেছে নাগাড়ে রাত দুপুর পর্যন্ত। আমার ক্লান্তি আসে না বুঝি।

তারপর পরিবর্তনের মুখের পানে তাকিয়ে অবজ্ঞাভরে বলে—আচ্ছা, আজ যাও। আমায় একটু ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও।

পরক্ষণে রমিতা আবার বলতে থাকে—'প্রকৃতিস্থ সমাজ অনেক পাপ সইতে পারে, কিন্তু যখন তার বিকৃতিটাই হয়ে ওঠে প্রধান, তখন চিন্তায়, ব্যবহারে, সাহিত্যে, শিল্পকলায় পশুরক্তস্রোত আত্মস্থ করে সমাজ বেশিদিন বাঁচতেই পারে না।' রবীন্দ্রনাথ ত ভুল বলেন নি, বাবা! এ সমাজের মৃত্যু আসন্ন। *এবার একে শেষ করে দাও। মিথ্যে এই জঞ্জাল বওয়ার দরকার কি? সমাজ যদি একটা প্রাণী হতো তবে বিষ খাইয়ে শেষ করা কতো সহজ হতো বল তো?*

পরিবর্তন কিছু বলে না। সে জানে প্রতিবাদ করলেই সারা রাত রমিতা বকবে। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে এল সে। মনে মনে ভাবনা, রমিতা যেন দিন দিন কোথায় চলে যাচ্ছে। রমিতার কি এক ধারণা হয়েছে—সমাজটা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। একে ভেঙে ফেলে দিতে হবে, তাহলে এর পর নূতন বাঁধুনিতে সমাজ গড়বে মানুষ। পরিবর্তন অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে মেয়েকে কিন্তু তাতে ফল হয় নি কিছুই, উল্টে বকবক

দিয়েছে রমিতা—তুমি কি বোঝ এসবের? একচক্ষু, তুমি কেবল মেয়েকে স্নেহের পাকে ডুবিয়ে দিতে জানো। যদি চোখ থাকত তবে দেখতে, কোথাও আশ্রয় নেই। তুমি সে সব বুঝবে না। যারা দেখতে পায় তারা নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। তারা জানে এরপর আর সময় পাওয়া যাবে না—এই বেলা চুরি করো, চুরি করো। পরের কাছ থেকে কেড়ে নাও। নিজের কাছ থেকেও চুরি করো, নিজেকে ঠকাও। মুখোশটার রং চড়িয়ে দাও।

পরিবর্তন আর ভাবতে পারে না। তার মাথা ঝিম্‌ঝিম করে। রমিতাকে অসামান্য করতে গিয়ে এ কী অঘটন ঘটালো সে! নিজের জীবনের নির্যাস দিয়ে এ কী বিষময় আতর প্রস্তুত হল! পরিবর্তনের ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে কোথাও পালাতে। এর আগেও পথে বেরিয়ে পড়েছে একাধিকবার। কিন্তু ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো রাস্তা সে খুঁজে পায় নি। রমিতাকে একলা ফেলে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। মেয়েটা বড়ই একাকিনী।

পাশের ঘরে রমিতার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে! পরিবর্তন সেদিকে কান দিল না। তার মনে পড়ে যায় একটি দিনের ছবি—একটি ফুটফুটে মেয়ে, চোখে মুখে তার বুদ্ধির দীপ্তি, কয়েকশ' মেয়ের মধ্যে সহজেই সে স্বকীয়তায় ভাস্বর। সবাই তাকে চেনে, বিদ্যায়তনের সকলেই তাকে উৎসবের উদ্যোগে প্রাধান্য দিয়েছে। এক কথায় সে-ই উৎসবের প্রাণ। সেদিন এই মেয়েটির পিতা বলে পরিচিত হতে পরিবর্তন নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছিল। মেয়েকে মানুষ করার অপূর্ব কুশলতার জন্য প্রশংসাও পেয়েছিল।···সেই কিশোরী কুমারী সান্ত্বনা আজ অভিনেত্রী রমিতা। সেদিনের গৌরব আজকের এই সুতীব্র বেদনায় কিছু প্রলেপের কাজ করছে বই কি! মাঝখানে সান্ত্বনার নীড়-রচনার কালটুকু যেন অবাস্তব হয়ে গেছে।

ভাবতে ভাবতে শ্রান্ত পরিবর্তন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পাশের ঘরে রমিতা তখনও বকছে আপন মনে—যারা জানে সমাজই মানুষের শ্রেয়, তারা বোকা, তারা মানুষের বুদ্ধিকে স্বীকার করে না। আমাদের এই সমাজ থাকবে না—মরে যাবে, আজই এখনই মরুক। 'নিন্দা-প্রশংসার ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে, শাসনের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, আত্মরক্ষার উদ্দেশে

সমাজ যে-ব্যবস্থা করে থাকে তাতে শ্রেয়োধর্ম গৌণ, প্রথাঘটিত সমাজ-রক্ষাই মুখ্য।...

ভেগানিনের প্রক্রিয়ায় রমিতার শ্রান্ত দেহ নিস্তেজ হয়ে পড়তে বিশেষ দেরী হল না। তার ঘুমে অচেতন দেহের আলুলায়িত ভঙ্গী আলোর নীচে একাকী পড়ে রইল। এমনিই হয়—প্রত্যহ এমনি ভাবেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যখন রমিতা ঘুমিয়ে পড়ে তখন ওর চোখেমুখে, যে শ্রান্ত কমনীয় মাধুর্য মূর্ত হয়ে ওঠে তার সঙ্গে পৃথিবীর কারও পরিচয় নেই। এমন কি রমিতা নিজেও বহুদিন ধ'রে নিজের এই রূপটা দেখে নি। ও যে এত ভঙ্গুর, এত নমনীয় ওর স্নিগ্ধসৌন্দর্য, সেটা রমিতা হয়ত ভুলেই গেছে। ও শুধু দিবারাত্র জ্বলছে, জ্বালাচ্ছে ওর আশপাশে বাসনার বহ্নি।

হাসপাতালের লেবার ওয়ার্ডে নার্সেরা ব্যস্ত-সমস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর একদিকে রোগিনীদের বিভিন্ন রকমের কাতরোক্তিতে বাতাস থম্‌থমে। আবার এর মধ্যে কেউ কেউ অপরের সম্ভাবনা নিয়ে রসিকতা করতেও ছাড়ছে না। পাশের ঘরটা নার্শারী। সেখান থেকে সদ্যোজাত শিশুদের মিলিত কান্নার কোলাহল ভেসে আসছে।

একটি প্রসূতি নার্সের আঁচল চেপে ধরেছে—কখন থেকে বলছি ছেলেটা কাঁদছে, ওকে আমার কাছে এনে দিন। আমার ছেলে কেন আমার কাছে থাকবে না? এনে দিন বলছি!

নার্স হেসে বলে—আপনার ছেলে আপনারই আছে ভাই। সময় হলেই এনে দেবো। এখন আপনার শরীর খারাপ, নড়াচড়া একেবারে বারণ—শান্ত হয়ে ঘুমোন। কেউ নিয়ে পালাবে না আপনার খোকাকে।

মেয়েটি অসহিষ্ণুভাবে উঠে বসতে চেষ্টা করে। নার্স তাকে জোর করে ধরে শুইয়ে দিয়ে বললে,—এবারে কিন্তু ষ্টুডেন্টকে ডেকে বলে দেবো। ডাক্তারবাবু এসে খুব বকবেন। চুপ করে লক্ষীটি হয়ে শুয়ে থাকুন আপনি।

এমন সময় একজন এসে খবর দিল—পরমেশ নন্দীকে ফোনে ডাকছে।

পরমেশ [illegible] নয় [illegible] মিষ্টার?

নার্স অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—তা ছাড়া আর কে-ই বা আপনাকে ডাকতে যাবে বলুন ?

বেলা সাড়ে-এগারটার সময় রমিতা কয়েকজন অতিথিকে বিদায় করে পরমেশকে তার কলেজে টেলিফোন করছে।

পরমেশ ফোন ধরেই বললে—আর ব'ল না, মেয়েদের জুলুম সামলাতে সামলাতে হাল্লাক হয়ে গেছি। কাল সন্ধ্যে থেকে 'লেবার ডিউটি'। সারারাত ঘুম নেই, আর তেমনি দুর্ভাবনা। একটি মেয়ে খুব সিরিয়াস অবস্থায় কাৎরাচ্ছিল। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত—ভোরের দিকে সেই মেয়েটির একটি কন্যা হয়েছে—আমরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

রমিতা বললে—আর এদিকে আমি ভেবেই সারা হলাম। বাড়িতে খবর করে শুনলাম, কাল থেকে তুমি নিখোঁজ। তা হলে এক দিক দিয়ে পুষিয়ে নিচ্ছ, কি বলো। মিথ্যেই তোমার জন্যে ভাবা।

—থাক, অমন সৌভাগ্যের আমার দরকার নেই। আজ আরও সাত আটটা কেশ রয়েছে। এরপর আর নতুন কেউ না এলে বাঁচি। এক ফাঁকে যাবো পালিয়ে, তুমি থেকো। প্রতিনিয়ত চোখের সামনে মানবজীবনের সূত্রপাত দেখাটা খুব উপভোগ্য নয়।

—কিন্তু সারাদিন ত আমার বসে থাকবার উপায় নেই। পারো তো সকাল সকাল ডাক্তার সরকারকে নিয়ে এসো। কাল তাঁর সঙ্গে কথাই কইতে পারি নি। বাবার কাছে শুনলাম খুব চটেছেন তিনি।

—অত চটবারই বা কি আছে ? অন্য কাউকে ডাকা যাবে না হয়।

—না, না, আমারই দোষ। তুমি ওঁকে একটু ব'লে ক'য়ে নিয়ে এসো।

—আচ্ছা, তোমার মর্জি যা তাই হবে।

—কখন আসছ ?

ঠিক বলতে পারছি না। আমার সঙ্গে যার ডিউটি আছে সে ছাত্রটি বারটার সময় খেতে যাবে বলেছে। কোনো রকমে তাকে আটকাতে পারি ত এখনই যাচ্ছি! নইলে সরকারকে ফোন করে দিচ্ছি। ওঁর সঙ্গে বেশ খোলাখুলি আলোচনা করতে পারো। উনি একটি নীরেট গরু।

—তার মানে ?

—গন্ত মানে যা কাব্য নয়,—যাকে বুর্জোয়ারা আদর্শবাদ বলে। আরে গন্ত নাহ'লে অমন খাশ বিলেতী মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিতে পারে কেউ ? জান, ওর সঙ্গে ডরোথী বলে এক আর্লের মেয়ে পড়ত। ডরোথীর বাবা আসাম কিংবা সি, পি,-র গভর্ণর-টভর্ণর ছিলেন। সরকারের ছায়ার মত ডরোথী ঘুরত। আজ হঠাৎ কলেজে একটা ছবি দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। কলেজের বার্ষিক সম্মেলনের গ্রুপ ফটোখানা সিঁড়িতে এখনো টাঙানো রয়েছে। ডরোথী ঠিক সরকারের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে ছবিতে। এ নিয়ে তখন কলেজে সবাই আড়ালে খুব হাসাহাসি করত। কিন্তু সরকার খুব ভালো ছেলে, তেমনি গম্ভীর। এদিকে ডরোথীও খুব সভ্যভব্য মেয়ে কিনা—কাজেই সরাসরি কেউ কোনো কথা বলতে সাহস করত না। আশ্চর্য, সরকারটা এমনিই ফসিল্ যে ডরোথীরা বিলেত ফিরে যাবার আগে ওকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে, দুদিন সরকারকে রেখে দিলে ওদের বাড়িতে—তবু, নাঃ। জানি না, ডরোথী ওকে কি ব'লে প্রণয় নিবেদন করেছিল। তবে—তবে যা-ই বলুক, সরকার বোধ হয় মানুষ বলতে তার এ্যানাটমিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখেই ক্ষান্ত হয়। কী বলব তোমায়, খাশ ইংরেজ মেয়ে ডরোথীর যেমন রং তেমনি স্বাস্থ্য—আর চোখ! তুমি যদি দেখ্‌তে তবে তুমিও ভুলতে পারতে না রমিতা।

—তাই নাকি ? তোমার কথায় বুঝতে পারছি যে সেই মাধুরীর অভাবেই তুমি বাংলা দেশের পান্‌সে মেয়েদের প্রতি কৃপা করছ না। যাক, সেজন্য মোটেই দুঃখিত নই। ডরোথীর ছবি তোমার ডাক্তারী বই-এর আড়ালে লুকোনো নেই ত ?

—আরে রামঃ, ডাক্তারী বই হচ্ছে কঠোপনিষদের মত, সেখানে কোনো রোমান্স থাকলে হাড়গোর হয়ে যেতে বাধ্য—বরং মনে মনে কোনো বাঙালিনীকে ছবির মত ক'রে সাজিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। কেন, ডরোথীর ছবির এত খোঁজ কেন ? দেখতে চাও তো হাসপাতালে এসো, দেখিয়ে দেব। ছাত্রী হিসেবে ডরোথী খুব নাম করা মেয়ে ছিল। এখন সে তাদের

কাউন্টীতে প্র্যাক্‌টিস্ করে। আর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা, আজও সে কুমারী।

—কেন, কৃষ্ণপ্রেম নাকি? শুনে শ্রদ্ধা হওয়া উচিত। কিন্তু হাসি পাচ্ছে যে!

—তোমার এই সিনিক মন্তব্যটুকু খুব উচ্চাঙ্গের হ'লেও সমর্থন করতে পারছি না।

—তুমি যে পুরুষ মানুষ। তোমাদের ফাঁকির গ্যাস দিয়ে বোঝাই করা মর্যাদার ফানুষে টোকা মারলেই ভয় পাও, ভাবো বুঝি চুপ্‌সে যাবে। ডরোথী কেমন মেয়ে জানি না—তবে সে যেমনই হোক, পুরুষকে শ্রদ্ধা করে—প্রেমের মর্যাদা আশা করে—বড্ড বোকা—মেয়েরা যেমন হয় আর কি! আচ্ছা সে দেখা যাবে। তোমার ওই পরম ঋষি ডাক্তার সরকারকে আমি বাজিয়ে দেখব'খন। ডরোথীর ভুল ভাঙবার সুযোগ খুঁজে বার করব-ই। কারণ এমন একটা সাঁচ্চা মেয়ে তা সে হোক না ইংরেজ কষ্ট পাবে কেন? ওর মিথ্যে স্বপ্ন ঘুচিয়ে দেবো। তুমি তাহলে আসছ কখন?

—ঠিক নেই। 'লেবার ওয়ার্ডে'র কাজে ফাঁকি দেওয়াটা ঠিক নয়। মেয়েদের কষ্ট দেওয়া কি উচিত? তুমিই বলো।

—আচ্ছা থাক। আমিই ডাক্তারকে ডেকে নেব। কিন্তু ডরোথীর ছবি দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।

—আর নয় এবারে যাই, ওদিকে নার্সদের মহলে চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। কোন ডাক্তার এসে পড়বে হয়ত। আচ্ছা, দেখা করব এক সময়ে।

পরমেশ ব্যস্ত ভাবে রিসিভার নামিয়ে চলে গেল।

রমিতা রিসিভারটা নামিয়ে মিনিট দুই অপেক্ষা করে আবার টেলিফোন করল ডাঃ সরকারকে।

—ডাক্তার সরকার বড় ব্যস্ত আছেন। আপনার কি দরকার বলুন। বললে কম্পাউণ্ডার।

অধীর কণ্ঠে রমিতা বলল—তাঁকেই দরকার, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাই।

—তাহলে একটু ধরে থাকুন।

মিনিট তিনেক পরে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠের প্রশ্ন এসে পৌঁছলো রমিতার কানে—হালো, ডাক্তার সরকার কথা বলছি। ' আপনি ?

রমিতা নমস্কার সম্ভাষণ জানিয়ে বললে—আজ একটু আসুন না ? কাল হঠাৎ চলে যেতে হয়েছিল বলে খুব লজ্জিত আছি।

—আই সী, আপনি পার্কিন্‌সন প্লেসের ইয়ে···। হ্যাঁ, দেখুন, একটা কথা, অত টাকা ফি দেওয়াতে আমার আপত্তি আছে। আর ভেবে দেখেছি আপনার অসুখ তেমন কিছু নয়। ডাক্তারের চেয়ে প্রয়োজন একটা সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার—অর্থাৎ—

রমিতা বললে—দয়া করে একবারটি আসুন, অত দূর থেকে রায় দেবেন না।

—কিন্তু আজ ত আমি খুব ব্যস্ত—সময় নেই।

আহত কণ্ঠে রমিতা বললে—কই, কাল ত একবারও বলেন নি সে কথা! আমার 'কেস' ভালো করে শোনবার আগেই ত চলে যেতে হল। অসুখ আমার আছে কি নেই, সেটা আপনি স্থির করবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আনুপূর্বিক তথ্যটা জানুন।

—অল রাইট। যাবো আমি এক সময়।

—কখন আসবেন ?

—সঠিক সময় দিতে পারছি না।

—কিন্তু আমার যে কাজ রয়েছে! যদি আন্দাজ দেন একটা।

—তা হ'লে আজ বাদ দিন। আপনার কাজ নেই এমন একটা দিন বলুন গম্ভীর কণ্ঠের স্বরগ্রামে টেলিফোনের বৈদ্যুতিক তারগুলো গমগম করছে

রমিতার সুগোল মধুর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হ'ল অপর প্রান্তে—আচ্ছা তবে কালই আসুন। কাল আপনার জন্য সব সময় বাড়ি থাকব।

—আচ্ছা তাই হবে। নমস্কার।

এম, ই, ভারবাণী লিমিটেডের অন্যতম কর্তা ছবিতে রমিতাকে নিয়োগ করবার জন্য চুক্তিপত্রাদি নিয়ে হাজির হলেন বেলা সাড়ে বারোটার সময়। চাকর এসে পাখা খুলে দিয়ে গেল এবং ভিতর থেকে ঘুরে এসে জানাল যে,

দেড়টার আগে দিদিমণির দেখা করবার ফুরসৎ হবে না। বেগতিক দেখে ভারবাণীর সঙ্গীটি এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে।

—দিদি! অন্ততঃ মিনিট পাঁচেকের জন্ম আসুন। নইলে আমার মান-ইজ্জত সব যাবে।—অনুকূল।

চাকর ফিরে এসে অনুকূলকে বললে—আপনি ভিতরে আসুন!

পাশের ঘরেই রমিতা বসে ছিল। অনুকূল ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ভ্রূকুটি করে তির্য্যকদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রমিতা বললে—কী ছেলেমানুষী শুরু করেছো। কতদিন বলেছি যে দুপুরে কাউকে আনবে না। দেড়টার আগে আমি কাজে হাত দিই না—জেনে শুনে কেন নিয়ে আস? দেখা আমি করব না, তাকে বলে দাও অসুখ করেছে।

অনুকূল বুঝতে পারে যে, রমিতা রীতিমত বিরক্ত হয়েছে। অথচ এতবড় শাঁসালো লোককে হাতছাড়া করলে অনুকূলের বড় ক্ষতি হবে। সে ইতস্ততঃ ক'রে বললে—যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি রাগ কর না দিদি। আমরা বাইরে অপেক্ষাই করছি। এখন যদি তোমার অসুখের কথা শোনে, তাহ'লে ও যে রকম লোক, এখনই বিধান রায়কে কিম্বা ডেন্হাম্ হোয়াইটকে ডাকবে। অন্যায় যখন ক'রে ফেলেছি তখন দেড়টা পর্য্যন্ত একরকম কাটিয়ে দিচ্ছি।

এ কথায় রমিতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। বলে ওঠে সে—থাক, ঢের হয়েছে। পাশের ঘরে লোক বসে থাকবে হাঁ করে, আর আমি দেখা করব না—তার চেয়ে অস্বস্তিকর আর কি হতে পারে? তুমি একটি পাকা শয়তান। এবারের মত দেখা করছি, কিন্তু এরপর চাকরকে বলে দেব সে দরজা খুলবে না।

পাশের ঘরে ফিরে গিয়ে সগৌরবে অনুকূল ভারবাণীকে বললে—আরে মশাই, আমার কথা কি ঠেলতে পারে?

ভারবাণী বাঁ চোখের কোণ কুঁচকে অর্থপূর্ণ ভঙ্গি করে বলে—সে আমি জানি মশাই। পেয়ারের কদর।

ভারবাণীর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা স্বরে বললে অনুকূল—আস্তে বলুন, শুনতে পেলেই মাটি। খুব আদবদুরস্ত, ভারী লেখাপড়া জানা-জেনানা, ইজ্জতের ওপর খুব নজর, বুঝলেন! একটু সমঝে কথা বলবেন!

ভারবাণী তাচ্ছিল্যভরে বলে—আরে রাখখো ইয়ার, কত ভারী ভারী ফিরিঙ্গি বিবির সঙ্গে লেনদেন পার করে দিলাম, আমাকে আদব দেখাইও না। কেৎনা রূপেয়া কিম্মৎ—হাজার, দু'হাজার, দশ হাজার? আট্টামে পত্থর দিয়ে নাফা যা হইলো, তাতে লাথ ভি ছাড়তে পারি একো আওরাত কে গদ্দিমে—হাঃ!

অনুকূল প্রমাদ গণল। ঠিক এই সময়ে যদি রমিতা ঘরে ঢুকে পড়ে ত সমূহ বিপদ! রমিতা যদি এই কথার একটুও শোনে তবে অনুকূলের দুরবস্থার চূড়ান্ত হবে। এখন ভালোয় ভালোয় চুক্তিপত্রটা সম্পাদন করিয়ে দিতে পারলেই অনুকূলের হাজারটি টাকা নগদ প্রাপ্তিযোগ। তাছাড়া আর একটি কারণে উপরি হাজার তিনেক টাকা আসবার সম্ভাবনা আছে। এই দুঃসময়ে টাকা পাওয়ার যে কী দাম তা অনুকূল ছাড়া আর কে বুঝবে!

রমিতা এসে নমস্কার করতেই ভারবাণী উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলে—নোমোস্কার।

রমিতা বললে—বসুন। বড় ব্যস্ত আছি। বেশি সময় দেওয়া তো সম্ভব হবে না আজ!

—না, না, সে আপনি ব্যস্ত হবার কিছু না আছে। আমাদের দরকার ত আছেই জরুর। ধরুন, ফিলিম লাইনে এলে আর আপনার সাথে দরকার কার না থাকবে। ও ত হচ্ছে দস্তুর!

বলতে বলতে ভারবাণী বারকয়েক সিক্ত দৃষ্টিতে রমিতাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল।

অনুকূল জের টানে—নতুন বই তুলছেন ভারবাণীজি!

রমিতা জবাব দিল—আমার ত এখন অবসর নেই। কি নাগাদ কাজ শুরু হবে জানাবেন। ভেবে দেখবো।

—আচ্ছা বেশ ত আপনিই বলুন কবে আপনি পারবেন?

—সে ত এখুনি বলা মুশকিল। পরে জানাবো। আপনারা কার বই তুলছেন? কি ধরনের Story?

ভারবাণী বিজ্ঞের হাসি হেসে বলে—সে একটা ইস্টোরি দেখে নিলেই হবে। ওর জন্যে কি আছে!

রমিতা গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়—না, না, তা হয় না। ছবির সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে গল্পের বাঁধুনীর ওপর।

—হাঁ, থোড়া। তবে সঁচ্‌মুচ বল্‌ছি, বাজী হচ্ছেন আপনারা—হিরো আর হিরোইন। গান আর প্লে ভাল হলে গল্পের থোড়াই দরকার হয়। আরে হামি ভি গল্প লিখে দিতে পারি।

রমিতা তীক্ষ্ণ হাসি হেসে জবাব দেয়—লেখাটা তবে আপনারই হোক, আর হিরো হয়ে আপনিই পর্দায় নামুন, খুব জমবে।

ভারবাণী খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে যায় যেন, তবু বলে—হাঁ, হাঁ, আপনি বিশ্বাস করেন—আমার এক দোস্ত ত এই কাজই করে। সে বাংলা লিপি শিখেছে। গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে থাকে বোম্বাই থেকে। এখানকার নতুন বাংলা বই কিনে পড়ে আর পরে পাঁচটা বই থেকে মিলিয়ে একটা গল্প খাড়া করিয়ে ছবি তোলে। তাতে তার নামও হয়েছে, রাইটার উল্লুদের ফাঁকি ভি দিচ্ছে!

রমিতা বললে—গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকতে তার খরচ খুব কম হয় না। এত হাঙ্গামা করে চুরির চেয়ে লেখকের পাওনা টাকা দিলে কিছু ক্ষতি হত না। যাক, আমি আগে গল্প পড়ে দেখে তবে বলব আপনার ছবিতে নামতে পারব কি না।

এমন সময়ে সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল। রমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—মাপ করবেন, আমি ছুটি নিচ্ছি। আর, ত আজ সময় হচ্ছে না। অন্য দিন আসবেন, আগে খবর দেবেন একটা!

ভারবাণী অপ্রসন্ন মুখে কষ্টার্জিত হাসি টেনে বললে—আচ্ছা তবে নোমোস্কার, পরে খবর দিয়ে আসব।

—সেই ভালো। নমস্কার।

রাস্তায় নেমে ভারবাণী অনুকূলকে বিরস ভাবেই বললে—কেমন পেয়ারি বুঝি না। কথাই ত বলতে চায় না, ভারী গরম।

—তা হবে না? বি. এ. পাশ। গান জানে। আর নামডাক কেমন তাও বলো!

—হাঁ, তা নামডাক আছে। লেকিন, তোমার তস্‌বিরমে যেমন দেখেছি তার মতন ত সুরৎ লাগে না। আঃ হাঃ! মাইরী তস্‌বিরটা দিয়ে দু'হাজার নিয়ে নাও নগ্‌দা।

—পাগল! তার চেয়ে আমায় কিনে নাও। জান থাকতে ও ছবি ছাড়তে পারি?

—আচ্ছা ভাই সাচ্‌মুচ্‌ কত টাকা নেবে? চাই হাজার, তিন হাজার—

অনুকূল চুপ করে থাকে। তিন হাজার টাকার বিনিময়ে চিরদিনের মত রমিতার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে? অবশ্য টাকার যে রকম খ্যাঁচ তাতে যে কোনও কাজই করা সম্ভব। কিন্তু ছবি বিক্রী করলেই রমিতার সঙ্গে সব সম্পর্ক চিরদিনের মত নষ্ট হবে। রমিতার বিরূপতা তার জীবনে যে কত বড় ক্ষতি তা অনুকূল জানে।

ভারবাণী বললে—বড় বেকায়দায় পেয়েছ অনুকূল বাবু। আচ্ছা লাও চার হাজার রূপেয়া। ছোড়ো ইয়ার—।

ভারবাণীর চোখে মুখে লালসার লোলুপতা ফুটে ওঠে। অনুকূলের খুব বিশ্রী লাগল। একদিন কোন নির্জন পাহাড়ের ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় প্রাকৃতিক আবেষ্টনীকে চিরন্তন মানবমাধুর্যের সঙ্গে বেঁধে রাখবার জন্য যে শিল্পীর মন বেদনার্ত হয়ে ছিল সে শিল্পী আজ আর অনুকূলের মধ্যে নেই। তবু যে মানুষ আজও অবশিষ্ট রয়েছে সেও চায় না ছবিটাকে ছেড়ে দিতে এমন একটি অমানুষের হাতে।

কয়েক দিন যাবৎ মন্দাকিনীর বাড়াবাড়ি অসুখ চলছে। ওষুধপত্র ও পথ্যের জন্য টাকা চাই। আর কোন পথ নেই। মন্দাকিনীকে দেখবার ত কেউ নেই। অনুকূলের ভরসা ছিল ওই মন্দাকিনীই। সে যখন বিছানায় পড়ল তখন নিরুপায় হয়েই অনুকূল বাড়িতে বাঁধা পড়ে গেল। সিনেমার রাজ্যে কেউ কারও আপন নয়। বউ-এর অসুখও পৃথিবীতে এমন কিছু অভাবনীয় ঘটনা নয়। এরকম গতানুগতিক দরকারের সময়ে কেউই সাহায্য করবে না

অনুকূল জানত। এমনিতেই তার আয়ের চেয়ে খরচ বেশি হয়, সেজন্য বাজারে কিছু ঋণও রয়েছে। তার উপর নূতন করে ধার দেবে কে! কার কাছেই বা চাওয়া যায়—সবাই ত অন্তভক্ষ্য ধনুর্গুণ। যার কাছে হাত বাড়ালে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাকে বলতে অনুকূলের সঙ্কোচ হয়। সে জানে রমিতার কাছে চাইলে টাকা পেতে পারে। কিন্তু কোথায় যেন মর্যাদায় বাধে তার। রমিতা হাজার হলেও মেয়ে। তার কাছে টাকা চাইতে মন সায় দেয় না।

সকালে বিছানায় বসে বসে অনেক চিন্তা করেও কোন হদিশ মেলে নি। বিছানা ছেড়ে ওঠবার সময় প্রাত্যহিক নিয়মে ছবিখানার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে ছিল সে। সেই সময়ে মনে হল, এখানা বেচে দিলে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যায়! তারপর থেকে অনুকূলের মনে স্বস্তি নেই। ডাক্তারের বাড়ি যাবার নাম করে পথে বেরিয়ে পড়ে। তারপর ভারবাণীকে ফোন করে দিয়ে চায়ের দোকানে নিশ্চিন্ত মনে চা-সিগারেট সহযোগে আড্ডা দিল বেলা দশটা পর্যন্ত।

ছবি দেখে ভারবাণী বলে বসলো—লাগাও ফিলিম কোম্পানীর নয়া কেতাব। আভি চলো এ বিবিকে পাস। লে লেও দো চার হাজার। লেকিন কাম হাসিল করনা—কামাল করো ভাই।

অনুকূল তেতে উঠল। মন্দাকিনীর আজ ইন্‌জেক্‌সনের তারিখ। সে কথা ভোলে নি অনুকূল। তবু ভাবলে, একটা দিন এদিক সেদিক করলে কী আর ক্ষতি হবে? হাতে তেমন পয়সা হলে তখন চাই কি বড় বড় ডাক্তারের হাট বসিয়ে দেবে সে বাড়িতে। আগে টাকাটা হাতে পাওয়া দরকার।

এই সব স্বপ্নের পর যখন এমন ভাবে রমিতার বাড়ি থেকে বিফল মনোরথ হয়ে পথে এসে দাঁড়াতে হল তখন অনুকূল মরীয়া। টাকা তার চাই-ই। তবে মাত্র চার হাজার টাকাতে 'আখের' খোয়ানো কোন কাজের কথা নয়। সে হেঁকে বসল—আট হাজার দাও, ছবি নিয়ে যাও। ও ছবি আমার কলিজা। তোমার জন্যে রমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে যাবে। এ ছবি

বেচেছি শুনলে সে আমায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। নইলে তুমি ত আমার দোস্ত, তোমায় মুফত্ দেওয়ার কথা।

—আরে কী আছে ছবিতে। এ ত হুরী পরী নয়, না মাস, না আঁখোঁ কি নজর। আর রঙের তস্‌বির। তস্‌বির ত আওরাত নয় বাবা, যে গায়ে ছুঁয়ে আনন্দ হবে, না কথা কইবে, না ঘুরেফিরে বেড়াবে. না ওর চোখে ঝিলিক্ মারবে! তার জন্যে আট হাজার বিলকুল লোকসান। তবে নজর ধরল তাই চার হাজার খুব বেশি বলেছি, লিয়ে লাও। লেখাপড়া ক'রে দাও, এসব copyright-এর মামলায় কে যাবে বাবা!

—না জী ভারবাণী সে আমি পারব না। আট হাজারের এক পয়সা কমে হয় না। আমি ত ছবিটা বেচতেই চাই না। টাকার খ্যাঁচ—!

—এ ভারী জুলুম কা বাত। চার হাজার কি কম হ'ল?

—জুলুম টুলুম কিছু নয়, তুমি ত কাঁচা ছেলে নও বাবা! এমন 'মাইরী মার্কা' ছবি কোথায় পাবে?

—মাইরী আর ঝামেলা কর না, যাও আর কিছু ধরে নাও। ছবির ত অভাব নেই—আরে ম্যান চার হাজারে মার্বেল ষ্টাচু মিলে যায়।

অনেক দর কষাকষির পরে সাড়ে ছ'হাজারে ছবিখানা বিক্রী করে দিল অনুকূল। সে কোনদিন আশা করে নি এত টাকা একসঙ্গে পাবে। —আর কল্পনাও করে নি এই ছবি নিজে হাতে বিক্রী করবার কথা।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে মন্দাকিনী ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—ডাক্তার কি বললেন,? ইনজেকসন!

সে কথার জবাব না দিয়ে সরাসরি নিজের ঘরে গিয়ে ছবিখানা হাতে তুলে নিয়ে শেষবারের মত নিরীক্ষণ করলে অনুকূল। তার তন্ময় চুম্বনে ছবিটা সিক্ত হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে ছবিখানা মুছে, কাগজে মুড়ে নিয়ে আবার সে বেরিয়ে গেল। এবারও মন্দাকিনী কি যেন বললে, কথাটা অনুকূল স্পষ্ট শুনতে পেল না।

রঞ্জিতা ডাক্তারের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করতে বলেছিল পরিবর্তনকে।

জল খাবারের আয়োজন দেখে ডাক্তার সরকার বললে—রোগী দেখতে এসে খাওয়ার নিয়ম নেই। যদি একান্তই insist করেন তাহলে অল্প কিছু দিন।

—এত আর কি আছে বলুন।

—একটা মানুষের সারা দিনের্তে ২৪০০ ক্যালোরি সারবান খাদ্য খাওয়া দরকার। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তার অর্ধেকও পায় না, সেক্ষেত্রে আমি একাই যদি একবারে এত খাই তবে অপচয় হবে।

—প্রতি পদে এত হিসেব করে চলে কি বাঁচা যায় ডাক্তার বাবু? রমিতা বললে।

—জীবনের প্রতিটি স্পন্দন যেখানে অঙ্কের সূক্ষ্মতম হিসাব মেনে চলছে সেখানে আপনি বেহিসেবী চললেই ত ক্ষতি।

—আমার কাছে এই লোকসানটাই লাভ। যদি স্বাধীনতা না থাকে তবে বেঁচে আছি বুঝব কি করে?

—ভুলে যাচ্ছেন, আপনার প্রতিদিনের ছোটবড় কাজের মধ্যে মনের যে প্রতিফলন সেটাই আত্মপরিচয়। বেঁচে আছি এটা অনুভব করার জন্য অনিয়মের প্রয়োজন হয় না।

—না ডাক্তারবাবু একথা মানতে ইচ্ছে করে না।

—তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি যে অনিয়মকেই নিজের স্বভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। আপনার রচিত গতিতেই নিয়মিতভাবে আপনি চলছেন। আপনি যদি উল্টো করে বই পড়া অভ্যাস করেন তাহলে সেই অভ্যাসের দরুন আপনার কাছে সেটাই সোজা হয়ে দাঁড়াবে—আর অন্যে বলবে উল্টো।

—খুব জটিল ঠেকছে কথাটা।

—ঠিক এই রকম জটিল করেছেন আপনি নিজেকে, তার জন্য আপনিই দায়ী।

—এ কথার অর্থ কী?

—রাগ করবেন না। আমাদের ডাক্তারী-শাস্ত্রের একটা বড় তত্ত্ব হচ্ছে মনঃসমীক্ষণ।

—এ কথা ত ফ্রয়েড, এলিসের কথা। সর্ববাদীসম্মত ভাবে তাদের এই তত্ত্ব ত স্বীকৃত হয় নি।

—না হবার ত কোনো কারণ দেখি না। এঁরা ত কেউ নতুন কথা বলেন নি, প্রাচীন হিব্রুতে বা প্লেটোর লেখাতেও এসব কথা পাওয়া গেছে। তবে এঁরা সেই সব কথাই নতুন ভাবে বলেছেন, আমাদের চোখ ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। এঁরা নতুন করে না দেখালে আমরা সেই অন্ধকারেই থাকতাম। সে সব রেখে এখন ব্যক্তিগত কথাতে ফিরে আসা যাক। আপনার শারীরিক অসুস্থতা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু দীর্ঘকাল এরকম ভাবে শরীরের ওপর অত্যাচার করে গেলে মারাত্মক ব্যাধি হতে বিশেষ দেরিও হবে না। এমনিতেই রাত্রে ঘুম হয় না, ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে ওঠেন। বা দিনের বেলা খুব অস্বস্তি বোধ হওয়া, গা-হাত-পা জ্বালা করা—এসবেরই চিকিৎসা করা চলে। তবে আপনি যদি বিবাহিত জীবনকে স্বীকার করেন তাহলে খুব সহজেই এর স্থায়ী মীমাংসা হয়।

রমিতা উচ্চস্বরে হেসে উঠল, তারপর হাসি একটু সামলে নিয়ে বললে—আবার বিয়ে?

—হ্যাঁ বিয়ে আপনার দরকার। আপনি বলতে পারেন যে, বিবাহ না হলেও আপনার জীবনে অভিজ্ঞতার অভাব নেই। Excuse me, এসব কথা শুনে আমায় অভদ্র মনে করবেন না। তবু বিয়ের আলাদা প্রয়োজন এবং সার্থকতা আছে বইকি।

রমিতা হেসে জবাব দেয়—না, অতটা ছেলেমানুষ নই। আপনি ঠিকই বলছেন, আমার দেহে বহু পুরুষের স্পর্শচিহ্ন আছে। তাতে কুণ্ঠিত নই, বা—

—কিন্তু এটা সুস্থ মনের পরিচয় নয়। পরিণত পরিপূর্ণ মানুষের মনে স্থিতি এবং ধৃতিই বাঞ্ছিত। এভাবে আর বেশিদিন চললে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। একজন অতি আধুনিক অষ্ট্রিয়ান ডাক্তার Schwarz মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় খুব নাম তাঁর, তিনি বলছেন 'To have indiscriminate sexual intercourse is to make the gesture of expressing

emotional relationship when there is none to be expressed: a kind of sexual loquacity'. অর্থাৎ যাদের বাজে কথা বলাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় তারা কিছু বক্তব্য না থাকলেও বকেই যায়—শুধু কথা বলাটাই তাদের কাছে আনন্দ। নিজের কণ্ঠস্বর শুনতেই তারা ভালবাসে। সেটা বদ অভ্যাস—আপনার কথা থেকে অনুমান হচ্ছে, যৌনক্ষেত্রে আপনার এই আতিশয্য দিন দিন অসুস্থতা বাড়িয়ে দেবে। নিজের মানসিক বিকৃতি দিয়ে সমাজ জীবনে যে আধির সঞ্চার করছেন এটা ক্ষতিকর—আপনার পক্ষে ত বটেই, অপরেরও।

—এত নূতন কিছু নয়। যে সমাজ পঙ্গু, যে সমাজের অস্থিতে-মজ্জায় রোগ ধরেছে, সেই সমাজ যাতে তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে তারই চেষ্টা মাত্র। যে সমাজ-ব্যবস্থা আমাকে এই মানসিক অবস্থায় আসতে বাধ্য করেছে তাকে নষ্ট করব বই কি! এটা আমার ব্রত।

—আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না যে সমাজ মুমূর্ষু। আর আপনার একার চেষ্টায় এতবড় সমাজদেহ ভেঙে পড়বে না। তা ছাড়া, বিরাট সমাজদেহে আধিব্যাধি কিছু ত থাকতেই পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কেননা তখন আমাদের হওয়ার ভিত্তিতেই আঘাত লাগে। জানার চেয়ে হওয়ার ভুল কত সর্বনেশে তা বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই, বিজ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করেছি সেই শক্তিই মানুষের হিংসা ও লোভের বাহন হয়ে তার আত্মঘাতকে বিস্তার করছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।" এত বড় একটা কথা হয়ত আপনার ক্ষেত্রে খাটে না—তবে জানেন, আমার বিশ্বাস এই হওয়ার ভুলই আপনারও ভুল। আপনি যদি বক্র ব্রতচারিণী না হয়ে—

—অর্থাৎ সুশীলা বালিকার মত পুরুষের অবজ্ঞা অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করে পোকার মত বেঁচে থাকতাম—কেমন! তা সম্ভব হয় নি। আমার বিবেক সেই অক্ষমতাকে মেনে নিতে রাজি নয়।

—কিন্তু এ ভাবে বিষ ছড়িয়ে আপনার কি লাভ?

—প্রতিশোধ নেওয়া। মরণাপন্নকে মরতে সাহায্য করা! প্রতিষ্ঠাকে প্রমাণ করা।

—কিসের প্রতিশোধ।

—অন্যায়, অত্যাচার, অপমানের প্রতিশোধ।

—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আপনার কাছে এ কথা বলতে বাধা নেই, কারণ আপনি আমার চিকিৎসক। তবে একটা অনুরোধ, এসব শুনে আমার ওপর কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাবেন না, ওটা সস্তার খেলো প্রবঞ্চনা। শুনুন মন দিয়ে, আমার গোটা জীবন ধরে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে। আমার স্বামী যখন বিয়ে করেছিলেন তখন আমি এমন ছিলাম না। তিনি আমার প্রেমে পাগল হয়েই প্রণয়লীলার চরম আবেদন স্বাক্ষর করেছিলেন। নইলে আমার অভাব ছিল না কিছুই, রূপের সাক্ষ্য ত এখনও রয়েছে, গুণ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। বাবা আমায় সঙ্গীতে নৃত্যে উর্বশী করতে চেয়েছিলেন। আর আমি নিজেকে সাহিত্যে—।

ডাক্তার সরকার ভ্রূকুঞ্চিত করে পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ধরাল তারপর বললে—আপনি বিবাহিতা? আপনার স্বামীর নাম কি?

—তারপরই প্রশ্ন করবেন, তাঁর পেশা, নিবাস এই ত? এসব মামুলী সওয়াল-জবাব কেন? আপনারা পুরুষমানুষেরা ব্যবহারে শোভনতার সাধারণ রীতিটুকুও মেনে চলেন না কেন বলুন ত! এমন একটা কড়া তামাকের ধোঁয়া ছাড়ছেন নাকের কাছে যে এখানে বসে থাকতেও অসুবিধে হচ্ছে।

ডাক্তার চুরুটটা নিভাবার চেষ্টায় রত হয়।

রমিতা বাঁকা হাসি হেসে বলে—যাক্, যা বলছিলাম, স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, তাকে অস্বীকার করেছি। তার নাম মিহিরলাল চক্রবর্তী।

রমিতার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডাক্তার বলে—মিহিরলাল চক্রবর্তী। তাই নাকি?

—কেন? আপনি চেনেন তাকে? সেই কুখ্যাত ব্যক্তিটাকে!

—হ্যাঁ, জানি। কিন্তু মিহির ত ভালো ছেলেই ছিল!

—আপনার সঙ্গে সেই ভালো ছেলেটির পরিচয় কত দিনের!

ডাক্তার সরকার বিস্ময়াবিষ্টের মত বলে—তাকে চিনি ছেলেবেলা থেকে ইদানীং তার খুব পয়সা কড়ি হয়েছে সে খবরও শুনেছি। তার বিয়ের সময় ত আমি উপস্থিত ছিলাম।

রমিতা আবেগবিচলিত কণ্ঠে বললে—কিন্তু চুরুটটা নিভিয়ে ফেললেন কেন? আমার মাথা ধরা রোগ এমনিই আছে, মাঝখান থেকে—। না, না, ওটা একটু কষ্ট ক'রে ধরিয়ে নিন। আমার গল্প ফুরোতে সময় লাগবে। আর আপনার চিন্তার অবলম্বন হিসেবে ওই কড়া ধোঁয়াটা বোধ হয় খুব দরকার।

সরকার হেসে বললে—না, থাক। সহবৎ শিক্ষারও প্রয়োজন আছে বই কি! তাহলে আপনি মিহিরের স্ত্রী। কিন্তু কি হলো ব্যাপারটা! মিহিরের স্বভাবে আন্তরিকতাই দেখেছি, কখনও ত দুর্ব্যবহারের কথা শুনি নি। বেশ মনে পড়ছে বন্ধুমহলে খুব চাঞ্চল্য হয়েছিল মিহিরের অপূর্ব রূপসী স্ত্রীকে কেন্দ্র ক'রে। আমার অবশ্য একদিনই আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল—তারপর অনেক বার মিহিরকে বলেছি বটে, বাড়ি গিয়ে তার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করে আসব কিন্তু হয়ে ওঠে নি। তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে প্রায় বছর চারেকের ব্যাপার! আর যুদ্ধের সময়ে মিহির ত মস্ত একটা কী জানি হয়ে গেল—মিলিটারী কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি! সেসব খেয়াল করি নি—মানে আমার আবার সামাজিকতার বোধটাই কম—সে ত দেখতেই পাচ্ছেন।

রমিতার বুকের মধ্যে কী একটা বেদনা যেন গুমরে ওঠে। তবুও জোর করে হেসে বলে—মিহিরের স্ত্রী ছিলাম যে আমি সেই 'আমি'-র নাম ছিল সান্ত্বনা। জানেন ত, আমাদের বিয়ে হয়েছিল রেজেষ্ট্রী করে। কারণ ওরা চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ আর আমরা বৈদ্য। আমার বাবার এ বিয়েতে মোটেই সায় ছিল না। আমি জোর করতে তখন তিনি বলেছিলেন—তুই যদি সুখী হ'স তাতে বাধা দেবো কি করে!

—তারপর ?

—তারপর আর কি ! তার আগেই ত অনেক কিছু হয়ে গেছে। তখনও পর্যন্ত আমি বোকা ছিলাম। শুকনো আদরে গলে গিয়ে নিজের যা কিছু ছিল উজাড় করে দিলাম। মনের রঙমহলে তখন স্বপ্নের ফুল মৌ মৌ করত। সেই রঙীন স্বপ্নের নেশায় গেয়েছিলাম, 'আমরা দু'জনা স্বর্গখেলনা রচিব না ধরণী 'প'। কিন্তু সেই কথা যে বাস্তবে এমন পরিহাস হয়ে দেখা দিতে পারে তা'কে কল্পনা করেছিল! আমরা সারারাত জেগে বসে কাটাতাম ছাদের ওপর। সে আমায় ভালোবেসেছিল। কিন্তু আমার সব কিছু নিয়েও যে তার মন ভরল না। তারপর সে আরও চাইল—আমার কাছেই নয় অন্য অনেক মেয়ের কাছেও !

রমিতার চোখেমুখে আচ্ছন্নতা। ও আপন মনেই বলে—আমায় সে চাইলে সরকারী রাজপথের মত যেমন-তেমন ভাবে ব্যবহার করতে। ক্রমশঃ বুঝলাম, সে আমায় বিয়ে করে মহাবিপদে পড়ল। অর্থাৎ সংসারে তার আর কোন আশ্রয় রইল না। ওদের বাড়ির কেউ আমাদের বিয়েকে সমর্থন করল না। অতএব কলকাতার কাছেই একখানা ঘরে আমাদের বাসা হ'ল। সেটা আমাদের পৃথিবীর সর্বস্ব। সাধ ছিল ছোট্ট সংসারটা গুছিয়ে গড়ে তুলি। নিজের খুশিমত ঘরকন্না সাজাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম সংসারটা শুধুই প্রণয়ের হাওয়ায় চলে না। উনি দিনরাত বই মুখে করে বসে থাকেন আর মাঝে মাঝে হাহুতাশ করে বলেন, 'তাই ত কি উপায় সানু !' প্রথম প্রথম আমি মিষ্টি করেই বলতাম, 'উপায় একটা কিছু হবেই। অত ভেবো না।'...তার ফলে মিহির ভাবনা-চিন্তাও ছেড়ে দিয়ে স্রেফ বিদ্যার্জন করতে ব্যস্ত রইল।...এরকম নিশ্চিন্ত মানুষকে খোঁচানো ছাড়া উপায় বা কি। অবশেষে একদিন আবার বলি—'হাতপা গুটিয়ে বসে থাকলে যে শুকিয়ে মরতে হবে !' নড়েচড়ে বসে বললে—'হ্যাঁ, ভেবে দেখি কি করা যায়।'...ভাবনা বেড়েই চলে। অগত্যা একদিন নিজের গহনাগুলো দিয়ে বললাম—'ঢের হয়েছে। ভাবনার দৌড় দেখে মনে হচ্ছে এর আর শেষ নেই। তার চেয়ে এইগুলো দিয়ে যদি কিছু করতে পারো

ছাখো।' পুরুষ মানুষ, পৌরুষ থাকা উচিত, তাই একবার কুণ্ঠিত ভাবে বলল —'তোমার গায়ের সোনা নিয়ে ব্যবস্থা? না, না, থাক।' ধমক দিয়ে বলি, 'থাক, খুব খাতির পেয়েছি। কিন্তু আর তাতে পেট ভরছে না।' এগুলো বেচে একটা কিছু পত্তন করো, সুদিন এলে আবার না হয় আসলের ওপর চড়া হারে সুদ ধরে দিও।' মিহিরলাল ত কারবারী হল। বললে—'কিন্তু এসব আমার লাইন নয়, শুধু তোমার মুখ-চেয়ে এই সব ছোট কাজে নামতে হচ্ছে।' সেই সময়ে বোধহয় আমার ওপর তার একটু তাচ্ছিল্যও এসেছিল। আত্মীয় স্বজন এবং বাড়ি ঘর থেকে এভাবে ছেঁটে দেওয়ার জন্যেও বটে, আবার আরামের আশ্রয়ের বদলে খেটেখুটে পয়সার ধান্দায় ফিরতে হচ্ছে বলেও বটে —তার মেজাজটা কেমন রুক্ষ হয়ে উঠল। যেন সবই আমার অপরাধ! আমারও মনে সংশয় হত। মনে হত, আমায় বিয়ে করেই মিহিরের দুরবস্থার শেষ নেই। তাই তাকে খুশি করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে থাকতাম। ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আমি আর কিছুই গ্রাহ্য করি নি সে সময়ে। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হল না। অবিশ্যি এও হ'তে পারে যে খুব বেশি আদর যত্নের ফলেই বেশি ক'রে অবজ্ঞা করতে শুরু করল। ওর মন তখন কোথায় থাকত বুঝি নি। নিত্যদিন যা নয় তাই বলে মেজাজ দেখাত আর যা খুশি তাই করত। সয়ে গেছি সব। অনেক দুঃখ কষ্ট হজম করেছি মুখ বুজে। ইভ্যাকুয়েশনের সময় সবাই যখন কলকাতা ছেড়ে পালালো, ওরই জন্যে রইলাম কলকাতায়। চারিদিকের খালি বাড়িগুলো যেন গিলতে আসত। উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত মন, কি জানি কখন কি হবে—ও কেন বাড়ি ফিরতে দেরি করছে, সেই ভাবনা। রাত্রি এগারোটা, বারোটা বাজত—বাইরে ব্ল্যাক আউট, বাড়িতে একা আমি। সেই সময়ে কিনা একদিন ও এনে হাজির করল ওর সব মিলিটারী মক্কেলদের। তারা কেউ পাঞ্জাবী, কেউ বা ট্যাঁশ, কেউ গুজরাটী। আমায় হুকুম করলে 'এঁদের সব রীতিমত খাতির করতে হবে।' কারণ এঁরা সবাই মিলিটারী কনট্রাক্টের মাতব্বর, এঁদের তোয়াজ করতে পারলে কলকাতায় বাড়ি-গাড়ির ভাবনা থাকবে না।

রমিতার কথায় ছেদ পড়ল। ফোনে কে ডাকছে। রমিতা উঠে গিয়ে

সেটা নামিয়ে রেখে এলো টেবিলের ওপর। আপন মনেই বললে—সব সময়েই দরকার! পারব না সাড়া দিতে। থাক পড়ে ওটা।

ডাক্তার সরকার বলল—ও-ভাবে ফোনটাকে জব্দ করলেন কেন?

প্রভঞ্জনের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমিতা জবাব দিল—দিনরাত কথার জাল বুনতে পারি নে। আচ্ছা, আপনাকে আট্‌কে রাখছি না ত কাজের ক্ষতি করিয়ে।

হঠাৎ রমিতা যেন সচেতন হয়ে উঠল।

প্রভঞ্জন ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—কাজ অনেক আছে। কিন্তু আপনার কথাটা শোনাও ত দরকার। আচ্ছা তার আগে যদি আমি গোটা দু'য়েক ফোন সেরে নিই। অসুবিধে হবে?

রমিতা ব্যস্ত হয়ে বলে—না, না, এখন আর আট্‌কে রাখব না, আপনি বরং কাজ সেরে ঘুরে আসুন। আমার জন্যে কাজের ক্ষতি করবেন আপনি ডাক্তার হয়ে এটা ঠিক নয়।

প্রভঞ্জন টেলিফোনের কাছাকাছি গিয়ে অবিচল কণ্ঠে জবাব দিলে—ব্যস্ত হবেন না। একটা কেস্ শেষ না করে চলে যাওয়া উচিত নয়। আপনার কথাগুলোও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

প্রভঞ্জন টেলিফোন করছে রমিতার দিকে পিছন ফিরে।

রমিতা নীরব। ওর চোখের সামনে দূরগত অতীতের এক-একটি ছবি ভেসে ওঠে।…সেই দিনটিই সান্ত্বনার জীবনের চরম পরীক্ষার দিন। মিহির উন্মত্ত অবস্থায় গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরল। সঙ্গে খাকী পোশাক পরা দুটি লোক আর একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। স্খলিত জড়িত কণ্ঠ, ট্যাক্সি থামার শব্দ, সব মিলিয়ে রমিতা বুঝতে পেরেছিল মিহির ফিরেছে। দরজা খুলে দিয়ে সান্ত্বনা বিস্ময়ে নিশ্চল গতিতে দাঁড়িয়ে থাকে। মিহির রক্তবর্ণ চোখদুটির ঘোরালো চাহনী ওর মুখের ওপর ক্ষণকালের জন্য নিবদ্ধ করে বলে—হাঁ করে কি দেখছ!'… সান্ত্বনা পথ আগলে রেখেই জবাব দিয়েছিল—'এরা সব কারা?'…মিহির হেসে উত্তর দেয়—'Let me 'introduce' all of you to my darling Mrs. Chakravorty. And Santana, here is

our queen of hearts Catherine',…এই পর্যন্ত শুনেই সান্ত্বনা ওদের পথ ছেড়ে দিয়ে ভেতরে চলে এসেছিল। তারপর ঘরে ঢুকে মিহির ওর হাত চেপে ধরল—'তুমি ওভাবে চলে এলে, আমায় অপমান করে?'…শুরু হ'ল তাণ্ডব প্রলয়। সান্ত্বনা পাথরের মত নীরব, নিরুত্তর। মিহির আরও গলা চড়িয়ে বলে—'আমায় অপমান করলে তুমি! Unpardonable impertinence!'…সেকথারও জবাব না পেয়ে মিহির টলতে টলতে এগিয়ে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে চীৎকার করে বললে—'Let me be frank. I am not going to tolerate your sort of bitch.'…সান্ত্বনা দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল—'Brute!'…তারপর, মিহির ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানী দিয়ে বলে—'You must behave! you—you! r…r'…সান্ত্বনা আর সহ্য করতে পারে নি, ডুক্‌রে কেঁদে মিহিরের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলেছিল—'আমায় মেরে ফ্যালো। এসব কি যা-তা কাণ্ড শুরু করেছো। আগে আমায় মরতে দাও, তারপর নর্দমায় গড়াগড়ি দিও। ভদ্রলোকের বাড়িতে এসব কী কাণ্ড!'…মিহির সরে দাঁড়িয়ে হেসে উঠল—'ভদ্রলোক! Yes! What of that? I must have my own way. কোনো ভদ্রলোক উপোস করে মরলে আর একটি ভদ্রলোক কি তার হাঁড়িতে চাল জোগাতে আসবে? একদিন যখন একটি ভদ্রলোক আর একটি ভদ্র মেয়েকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বিবাহ করল তখন তোমার পৃথিবীর ভদ্রসমাজ কেন তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বলতে পারো! তারপর তারা দু'জনে যখন শুকিয়ে মরছিল ভদ্রজীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তখন কোনো ভদ্রলোক খবর নিতে এসেছিল কি! Enough of this ভদ্র, nonsense! বুঝে নিয়েছি lifeকে। ওদের সমাজ-ব্যবস্থা বিলকুল বরবাদ। Here is my own self. Damn it. তুমি আমার সঙ্গে তালে তালে চলো or leave me free. Just now, you must come to take my friends in friendly way. চলো এখন ওদের সঙ্গে গল্প করবে। আমার কথা শুনতেই হবে তোমাকে। সমাজও ভদ্রতার বিনিময়ে বিপুল অর্থসম্পদ অপেক্ষা করছে। জানো, a margin of twenty thousand chips. বর্তমান পৃথিবীর চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ?

This voluptuous world, and you with your inviting youth —বিশ হাজার টাকা—হাতের কাছে লাফাচ্ছে।'…তারপর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে এসেছিল মিহিরের, সে বলেছিল,—'সান্থ, পাঁকেই পদ্মফুল ফোটে—পদ্মের জীবনে পাঁকটা অপরিহার্য। একদিন আমরা নিজেদের মনের পরিচ্ছন্নতা দিয়ে এসব পাঁক মুছে ফেলে সুন্দর জীবনটাই হাতে পাবো। আজকের এ কষ্ট সুখের দিনে মনে করতে কত ভালো লাগবে! এটা বোঝো না কেন?'

সান্ত্বনা বলেছিল—'কিন্তু পাঁকটাকেই যে পদ্ম বলে ভুল করছ তুমি।'

মিহির অধীরভাবে তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—'সান্ত্বনা! একদিন যে তোমাকে জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গ করে সমাজ-সংসার, অতীত-ভবিষ্যৎ, আশা-স্বপ্ন সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে এলো তাকেই তুমি সন্দেহ করছ, তাকে তোমার অবিশ্বাস? আমি কি তোমায় ভালোবাসি না? শোনো, আজ ছেলেমানুষীর সময় নয়। আমি ত এদের ফুর্তির জন্তে বাড়িতে ডাকি নি। কাজের খাতিরে অনেক সইতে হয়। এই যে নোংরা কাজ, সে-ও তোমারই জন্তে। তোমার জন্তে টাকা আনব! এতে তুমি যদি অসহযোগ করো তবে আমার আশা কোথায়, কি আশ্বাস?'

অনেক তর্কের পর সান্ত্বনা অতিথিদের মহলে গিয়েছিল। মিহিরকে ষোলো আনা বিশ্বাস করেই সে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরের দৃশ্য ভয়াবহ! মিহির খুশি হয়ে সেই সর্বজাতীয় অপরিচিতদের সামনে সান্ত্বনাকে জড়িয়ে ধরল— সান্ত্বনার রুচিতে আঘাত লেগেছিল তবুও সান্ত্বনা কিছু বলে নি। তারপর গ্লাস আর বোতলের শব্দ, ছিপি খোলার আওয়াজ…। কেমন একটা আচ্ছন্নতার ঘোর লেগেছিল সেই গভীর রাত্রে। সান্ত্বনা দেখল মিহির সেই ফিরিঙ্গী মেয়েটার কোমর ধরে নাচছে। তখন সান্ত্বনা কেমন পাগল হয়ে গেল। পরক্ষণে আরও প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কা—পাঞ্জাবীটি একগাল দাড়ি নিয়ে সান্ত্বনার দিকে ভিজে ভিজে চোখে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে…। সেই জোড়া কঠিন সাঁড়াশীর মত হাত দুটো বজ্রবেষ্টনে রমিতাকে যেন আবদ্ধ করেছে।…

দিতে ব্যগ্র—তার কি হবে?' তুমি তখন বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে বলেছিলে—পিতৃপুরুষের মুখচেয়ে তাকে ত্যাগ করতেই হবে। ধর্ম তোমায় রক্ষা করবেন।'...আর আজ মেয়ে-জামাই-এর স্বার্থে ধর্ম নেই? তোমার ধর্ম এত স্বার্থপর কেন?

চমৎকারিণীর চোখে আর অশ্রু নেই। তাঁর মুখে একটা শুষ্ক আবেগের কাঠিন্য ফুটে ওঠে; তিনি বলেন—তর্ক করতে চাই না বাবা। যা বলেছি মেনে নিতে পারবে কিনা শুধু সেইটুকু জানতে চাই! তারপর আমি আমার ব্যবস্থা করব।

—ভয় দেখিয়ো না মা! অন্যায় করা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমায় দিয়ে হবে না।

—তবে এ সংসারে আমার অন্ন উঠল আজ থেকে।

—সংসার কার? বরং বলো, আমাকেই তাড়িয়ে দিতে চাও।

অকস্মাৎ চমৎকারিণী ছেলের হাত চেপে ধরলেন।

—খোকা, তুই অমন করে আঘাত দিস নে মায়ের প্রাণে! কথা ফিরিয়ে নে। ফিরিয়ে নে কথা। শেষ জীবনটা শান্তিতে মরতে দে খোকা! তোকে ব্যথা দিয়ে আমি কি সুখে আছি। মায়া বড় কঠিন রে! একবারটি মায়ের দুর্বলতাকে মানিয়ে নে। এভাবে আমাকে ছোট করলে মুখ দেখাবো কি করে?

প্রভঞ্জন মায়ের দিকে তাকাতে পারে না, অন্য দিকে চেয়ে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু তার হাতের আঙুলে পড়ল। তার স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন গভীর রাত্রির বেহাগ সুর ধ্বনিত করে বলল—বেশ তাই হবে! কিন্তু মা, এরপর আমারও নিজেকে সোজা রাখা শক্ত হবে—তখন কিন্তু দোষ দিও না।

এই কয়েক মুহূর্তে প্রভঞ্জনের মনোজগতে যে ওলট পালট ঘটে গেল, তাকে বৃহৎ যুগান্তর বললে ছোট করা হয়—এ যেন ব্যক্তিত্বের রূপান্তর।

দিবানিদ্রার পরে বৈকালিক চায়ের কাপ হাতে করে প্রভঞ্জনের ঘরে ঢুকে জয়ন্ত জানালার ওপর কাপটা রেখে যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তখন

প্রভঞ্জনের কপালে দীর্ঘ কয়েকটি কুঞ্চনরেখা প্রকট হয়ে উঠেছিল। কোনো কথা বলে নি, একটা কঠিন হাসি হেসে সে পুনরায় বই-এর মধ্যে ডুবিয়ে দিল নিজেকে।

জয়ন্ত বলল—শরীর ভালো আছে ত দাদা! চেহারাটা কেমন খসে গিয়েছে মনে হয়।

—হুঁ। বিধাতা বোধ হয় সবাইকে ভালো রাখতে পারেন না, কি বলো? টেবলের ওপর বইখানা রেখে প্রভঞ্জন ফিরে তাকিয়ে বলল।

জয়ন্ত একটু অপ্রতিভ হয়ে যায়, অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সে বলে—দাদা, আপনি যেন বিধাতারও ভুল ধরছেন। আজকাল বুঝি মনঃসমীক্ষণ শক্তি খুব এগিয়ে গিয়েছে!

—তাতে আর সন্দেহ কি! তবে এ শাস্ত্রে ডাক্তারদের চেয়েও বড় এক বিজ্ঞানী দল এগিয়ে গেছে—তাদের মানসিক সংজ্ঞা জুয়াচোর, জালিয়াৎ এবং সামাজিক পরিচয় ভগ্নিপতি, জামাই—মানে পরম আত্মীয়!

এতখানি ধাক্কা সামলানো যে কোনো মানুষের পক্ষেই শক্ত—বিশেষ করে জয়ন্তর মত লোকের চায়ের কাপ হাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় আরও অসম্ভব। সে স্বভাবসঙ্গতভাবে জবাব দিল—খবরদার, মুখ সামলে—!

—বাঃ, চমৎকার! এরপর কি গলায় হাত দেবে?

—আপনি অপমান করছেন তা জানেন?

—তাই নাকি? সে আবার কি বস্তু হে?

—তার মানে?

—চুরি করবার সময় মনে থাকে না?

—চুরি? চুরি কাকে বলেন! সংসারে চলতে গেলে টাকার দরকার হয়ই—সেই দরকারের জন্তে যদি টাকা রোজগার করি তবে সেটা চুরি হতে পারে না।—আমি যদি চোর হই আপনি তাহলে দুশ্চরিত্র।

প্রভঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তোমার কাছ থেকে চরিত্রের সার্টিফিকেট কেউ চায় নি। বিষদাঁত ভাঙবার ওষুধ আমার হাতে। এ ভাবে আমাকে চটিয়ে দিলে তোমারই ক্ষতি।

পরমুহূর্তে আলো যেন নিভে গেল, সে নম্রস্বরে বলল—দাদা, আপনি অকারণে রাগ করছেন। আপনার সাহায্য ছাড়া যে বাঁচতে পারি না তা নয়, তাতে আপনারই নাম খারাপ হবে। আমি ত আজ সকালেই মাকে বার বার বারণ করলাম, জামাই যাতে মানমর্যাদা নষ্ট হয় এমন কাজ তাঁকে দিয়ে করানো সত্যি উচিত হবে না। কিন্তু মেয়েরা চিরকালই অবুঝ, বিশেষ ক'রে মেয়েরা যেখানে মা। তিনি কিছুতেই কথা শুনলেন না, আমায় উল্টে ধমকে দিলেন।

—চুপ করো!

গর্জন করে উঠল প্রভঞ্জন।

জয়ন্ত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসে প্রবাহিত প্রভঞ্জনের রিক্ত মর্মবেদনা যেন ঘরখানার স্নায়ুবদ্ধ বায়ুস্তর আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবে।

আজ আর পোশাক বদলাবার কথাও তার মনে হয় না। সে যে অবস্থায় ছিল সেইভাবেই বেরিয়ে পড়ল।

ডাক্তারখানায় গিয়েও সে স্থির হয়ে বসতে পারে না। অসহায় শূন্যতায় বিভ্রান্ত প্রভঞ্জন। এতদিন যেটাকে সত্য বলে আশ্রয় করেছিল সেটাও বিবর্তনের পাকচক্রে পদাহত হল? না, তা নয়, আজ তার স্বপ্ন শেষ।

ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বাজছে। প্রভঞ্জন আর কিছু শুনতে চায় না। তবু অভ্যাসবশে রিসিভার উঠিয়ে নিলে—হ্যালো, ডাক্তার সরকার কথা বলছি! আপনি?

—আমি পরিবর্তন মজুমদার! এখুনি আসুন! বিকেল বেলা সান্ত্বনার কেমন নেতিয়ে পড়া ভাব দেখে মনে হয়েছিল বুঝি ঘুমোচ্ছে, কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারছি না কেন এমন হল।

—আচ্ছা যাচ্ছি এখুনি।

প্রভঞ্জনের কণ্ঠের ব্যগ্রতা ওপারের রিসিভারে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

চমৎকারিণী মেয়েকে নিজের ঘরে ডেকে জানিয়ে দিলেন জয়ন্ত যেন

গুরুজনের সামনে যায় না। কথাটা শুনে পার্বতীর মুখ আঁধার হয়ে গেল। এটা তার মা দেখেও যেন দেখতে পেলেন না। তাঁর এরকম অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অন্য কোন পন্থা খুঁজে না পেয়ে পার্বতীর বিষণ্ণতা চতুর্গুণ বেড়ে গেল। এবং ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই নীলিমাকে দেখতে পেয়ে তার পিঠে কয়েকটা চড় চাপড় বসিয়ে দিল পার্বতী। নীলিমা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে যথোচিত চীৎকারে বাড়ি মাথায় ক'রে তুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

তবুও চমৎকারিণী একটি কথা বললেন না।

জয়ন্ত খালি পেয়ালাটা রাখতে রাখতে পার্বতীকে বলল—তোমার দাদা একেবারে চেঙ্গিস খাঁ! তা তুমি তাঁর বহিন—অনুগ্রহ করে কি সিনেমায় যাবে

—আমার ত রঙ লাগে নি!

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পার্বতী জয়ন্তর দিকে তাকায়।

জয়ন্ত কিছুমাত্র দমে না—তা যদি বলো ত লেগেছে! এই ত চোখ দুটো কেমন আগুন রঙে রঙীন!

—আগুন শুধু চোখে নয়, সর্বাঙ্গে!

সিগারেট ধরাতে ধরাতে জয়ন্ত জবাব দেয়—আমাকেই চেয়েছিলে, শান্তি ত চাও নি! আমি হচ্ছি জীবন, যেখানে গতি আছে, বৈচিত্র্য আছে, লাভ আর ক্ষতি আছে—কিন্তু শান্তি নেই! শান্তি মানেই ত মৃত্যু! সে শান্তি এখানে থাকুক, এই বাড়িতে।

—উঃ তোমার এই জীবন—জীবন আর কত কাল শুনবো! অন্য কথা নেই কিছু! জানো তোমার জন্যে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই!

—সেই জন্যেই ত বলছি সিনেমাতে চল! তোমার সেই ইডিয়ট দাদা নিজের মেজাজ নিয়েই থাকুক, আমরা দুজনা ভেসে চলে যাই।

—আমি মাকে বলতে পারব না।

—আমি আছি তোমায় রক্ষা করতে। আমি বলছি।

—তুমি বড় বোকা! দাদা তোমার জন্যে একে ওকে সুপারিশ করে বেড়াচ্ছে আর তুমি সেই সময়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছো শুনলে মা খুব খুশি হবেন! কি বুদ্ধি!

—ও্মা হীরারাণী, তা কেন! মাকে বলবে এবার এসে অবধি একদিনও কালীঘাটের ঠাকরুণকে দেখতে যাও নি তাই সন্ধ্যের আরতি দেখতে যাবে।

—খবরদার, ও কথা শুনলে মা চটে যাবেন। জানো তো, উনি এইসব লোক দেখানো ভক্তির চঙ দুচোখে দেখতে পারেন না। যা হয় আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি কেবল লিলিকে একটু তোয়াজ করো। শচীন নীলাম্বরকে পয়সা দিলেই ওরা বাড়িতে থাকবে, কিন্তু লিলিকে শুধু শুধু দায়লাম। ইস, একটু আগে যদি সিনেমার কথা বলতে!

অনুতাপ একটু হয় বই কি পার্বতীর! পার্বতী তার দাদাকে দেখছে ছেলেবেলা থেকে—কিন্তু এরকম বিচলিত হ'তে কখন দেখে নি। প্রভঞ্জন গম্ভীর স্বল্পভাষী, আবার যখন হাসে প্রাণখুলে হাসে। সে যা সংকল্প করে তার নড়চড় হয় না। দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু ক'রে ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে তার কল্পনা এবং বাস্তব এক সূত্রে বাঁধা।...আজ সেই প্রভঞ্জনের অটল সংকল্প বিচলিত হতে দেখে পার্বতী বিজয়িনী হয়েও ষোলো আনা সুখী নয়। কোথায় যেন একটা বেদনার কাঁটা ফুটছে ওর মনে। তবু জয়ন্তকে অপ্রসন্ন করবার মত সাহস পার্বতীর হয় না। ঠিক সাহসের অভাবই কি? না, এ বাড়ির এই থমথমে আবহাওয়ায় ওর মনটাও হাঁপিয়ে উঠেছে তাই—তা ছাড়া দীর্ঘদিনের উদ্বেগের পর আজকের এই মুক্তির আভাসও যেন মধুর।...দাদার নির্ভীতিকে পার্বতী শ্রদ্ধা করে—কিন্তু এক্ষেত্রে ওর মনে হয় যেন প্রভঞ্জন একটু বেশি বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল। ও আজ সকালে যে কথাটা বলবে ঠিক ক'রে রেখেছিল এখন আবার সেই যুক্তি দিয়ে নিজের বিষণ্ণতা কাটাল, ও বললে নিজেকে—যা করবার অন্য লোকে করবে! যারা হাজারটা অন্যায় করছে তারা না হয় আরও একটা বেশি করবে,—দাদার তাতে কি এসে যাচ্ছে!... সে নিজে হাতে কিছুই করবে না।

পার্বতী এই সব ভেবে মনটা হালকা ক'রে নিল।

জয়ন্ত ডাকল—লিলি মা!

লিলির কান্নার বেগ যেন আরও বেড়ে যায়।

পার্বতী লিলিকে কোলে নিয়ে এসে জয়ন্তর হাতে দিয়ে, মায়ের কাছে গেল।

ধর্মতলা দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে প্রভঞ্জনের মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগের কথা। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ধর্মতলা এবং এসপ্লানেডের ট্রাম-বাসগুলো বেশ ফাঁকাই চলেছে। মানুষে মানুষে একটা অবিশ্বাসের বেড়া তুলে দিয়েছে। দিনে দিনেই যে যার কাজ সেরে নিজের নিরাপদ নীড়ে আশ্রয় করে। এরা সবাই নিজের মনগড়া চিহ্ন দিয়ে রেখেছে মানুষের গায়ে—ধুতি আর লুঙ্গী! আশ্চর্য, দীর্ঘকাল একই আকাশের নীচে পাশাপাশি বসবাস করেও এই পার্থক্য! অথচ যারা সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে এলো, যারা তোমার আমার কেউ নয় তাদের আমি কিছু বলি না, তারা নিরাপদে তোমার আমার পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়—চোখ রাঙায়। ১৯৪২-এর কথা বাদ দাও, সেই সময়ে কিছুদিন ওদের একটু বিপদে পড়তে হয়েছিল। অবশ্য তার ফলেই ত ওদের ভাঁওতায় পড়ে তুমি আর আমি আলাদা হয়ে গেলাম। তুমি থাকো পার্কসার্কাসে আর আমি শ্যামবাজারে। ঘন ঘন সান্ধ্যআইনের বহরে দিনরাত্রি সন্ত্রস্ত। ছোরা, বোমা, গুলী, ব্রেনগান, স্টেনগান, এ্যাসিড, গ্রেপ্তার ...শহরের বুকে প্রতিমুহূর্তে ঝড় বইছে। আর্মার্ড কার চলে, খাকী পোশাকে ফৌজ ঘুরে বেড়ায় বন্দুক বাগিয়ে—পথে লোক নেই! কর্পোরেশনের বাতিগুলো নির্জন রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ এ গলি থেকে একটা ছায়া মূর্তি বেরিয়ে চুপি চুপি ও গলিতে ঢুকে পড়ল—কোথা থেকে পেট্রল পুলিসের গাড়ি এসে ছায়ামূর্তিকে ধরল। পকেটে কিছু পয়সা কড়ি পেলে থানা পর্যন্ত আসামীকে নিয়ে গেল না ওরা—, নতুবা আসামীকে হাজতে পুরে দিল। পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখা গেল, কোন এলাকায় কতগুলি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, ক'জনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে, কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে, আর সান্ধ্যআইনের কবলে পড়ে কতগুলির কি সাজা হয়েছে। এরা নাম নয়, কোন ব্যক্তি নয়—হিসেবের অঙ্ক হয়ে এরা সকালে চায়ের সঙ্গে খবর সরবরাহের অঙ্গ।

কতদিন—এই সব কারফিউ, এলাকা দিয়ে প্রভঞ্জন একলা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এসেছে। তখন পথ ছিল নির্জন। আজ আর সেই অনাস্থা অবিশ্বাসের ভাব নেই। ১৯৪৭-এর আগস্ট পেরিয়ে গেছে। এখন একদল লোক বলছে আমরা স্বাধীন হয়েছি আর এক দল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাদের এ দৃষ্টিকে ভাষায় রূপান্তরিত করলে শুনতে পাওয়া যায়—তোমরা কেমন স্বাধীনতা পেয়েছো একবার দেখাও না ভাই!

চৌরঙ্গী আর পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে এসে গাড়ি আটকে রইল বেশ কিছুক্ষণ। নিয়ন ল্যাম্পের আলোয় সজ্জিত ফুটপাথ ধরে চলেছে সান্ধ্য বিলাসীরা। দু'একটি পথিক কর্মক্লান্ত দেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রভঞ্জন সম্মুখে তাকিয়ে থাকে। সারি দিয়ে প্রতীক্ষমান গাড়িগুলোর ইঞ্জিনের মিলিত স্পন্দনের শব্দ, সবাই চলেছে। উত্তর হতে দক্ষিণে চলেছে, চলেছে পূর্ব হতে পশ্চিমে, নতুন ঝকঝকে ক্রাইসলার গাড়ি চলেছে, ডেমলার, ডি সটোর তরল গতিপ্রবাহের পাশে সেকেলে ক্রহাম গাড়িও রয়েছে একটা। সহসা মনে পড়ল রমিতার কথা আর তার পাশে পার্বতীর চেহারাটা। ওদিকে পথের মধ্যে পাহারার মত দাঁড়ানো পথ নির্দেশক দণ্ডের গায়ে হলদে আলো জ্বলে উঠল। সেই মুহূর্তে আইনে-আবদ্ধ সবগুলো গাড়ি গর্জন করে উঠল। সবুজ আলো জ্বলতেই সারি দেওয়া গাড়িগুলো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ছুটতে শুরু করল। চলতে চলতে মাঝপথে বাধা পাওয়া যেন এদের সবারই কাছে এক বিড়ম্বনা বিশেষ। মানুষেরই প্রয়োজনে মানুষ কতকগুলো আইনকানুন দিয়ে নিজের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করার অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছে। নিয়ম মেনে চলার অভ্যাসে তারা ভুলে গেছে—এ নিয়ম তারই গড়া। যারা এ নিয়মকে অগ্রাহ্য করতে যায় তারা শৃঙ্খলার পথে বিঘ্ন এনে নিজেকে এবং অপরকে বিপন্ন করে, আর তার জন্য শাস্তি তাকে পেতে হয়। ...এতক্ষণ ধ'রে এইভাবে এত অসংলগ্ন খণ্ডচিন্তায় নিজের মন ব্যাপৃত ছিল প্রভঞ্জনের খেয়াল হয় নি, যে মুহূর্তে বদ্ধগতি মুক্তি পেল সেই মুহূর্তেই সে গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে নিজের মনের গতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল।

প্রভঞ্জনকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পরিবর্তন—আসুন, আসুন। আপনি

যে আসতে পারবেন আশাই করি নি, তাই ডক্টর দেবকে একবার ডেকেছিলাম, তিনি দেখেশুনে বলে গেলেন—খুব সাবধানে থাকতে হবে ! ইয়ে—

—আমি আসতে পারব না ভেবেছিলেন, না আমার চিকিৎসা সম্পর্কেই আপনার আস্থার অভাব ? অবিশ্যি তেমন বুঝলে আমিই বলব যে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করুন। সে যাক এখন তাহলে কি আমি ফিরে যেতে পারি ?

প্রভঞ্জনের কণ্ঠস্বর একটু বক্র।

পরিবর্তন দিশাহারা হয়ে বলে—না, না সে কী কথা ! সান্ত্বনার কাছে ত একদফা ধমক খেয়েছি—এর ওপর যদি ফিরে যান তবে আর রক্ষে নেই। চলুন, ওঘরে চলুন !

—হঠাৎ কি বাড়াবাড়ি হ'ল ?

প্রভঞ্জনের কথা শেষ হওয়ার আগেই পরিবর্তন জবাব দেয়—মানে, বুঝেছেন ত বুড়ো হয়েছি। আর দেববাবু সেকালের ধন্বন্তরী। ভাবলাম আপনি যদি ঠিক সময়ে না পৌছোন, তাই—

পরিবর্তন হঠাৎ প্রভঞ্জনের হাত চেপে ধরে বলল —আপনি যেন আসতে সময় পাবেন না বলেছিলেন, এটা ওকে বুঝিয়ে দেবেন ! বুঝলেন—

অন্ধকার ঘরে জানালা দিয়ে যেটুকু রাত্রির আলো এসে পড়েছে তাতে একপাশের টেবলে পাতা শুভ্র একখণ্ড কাপড় ফর্সা দেখাচ্ছে, ঘরের আর সব কেমন আবছা অস্পষ্ট মনে হয়। পরিবর্তন মৃদু কণ্ঠে বলে—সান্তু, ডাক্তারবাবু এসেছেন। বাতিটা জ্বালব ?

—উঁহু, চোখে লাগে। আলোতে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে।

ঘরের পরিবেশে প্রভঞ্জনের দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে এল। এখন অন্তত রমিতার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিছানার রঙীন চাদরটা কেমন সাদাটে দেখায়। প্রভঞ্জন প্রশ্ন করে,—কেমন আছেন ?

রমিতা ক্ষীণকণ্ঠে বলে—সময় ছিল না আপনার তবু জোর করে ডেকে এনেছি, বিরক্ত হয়েছেন ত ! কি করব বলুন, আর কারুর চিকিৎসা ভাল লাগে না। বাবা যে কেন বোঝেন না ! আর সত্যি বলতে কি, আপনার ওপর ওঁর তেমন ভরসা নেই—আপনি কম কথা বলেন, আশ্বাস দেন না

আশ্চর্য ইনি না! এটাই আপনার অক্ষমতা বলে উনি ধরে নিয়েছেন। তা ছাড়া অভিজ্ঞতার চিহ্ন হচ্ছে সাদা চুল, তাও আপনার নেই।

পরিবর্তন অস্বস্তি বোধ করেন। পাশের ঘরে তার অনেক কাজ, অতএব পরিবর্তন স'রে পড়লেন।

প্রভঞ্জন রমিতার কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে বলে—সবই ত শুনলাম। কেমন আছেন এখন বলুন ত?

—এখন বেশ ভালো।

—তা বুঝতে পারছি, কপালে ঘামও ত হচ্ছে না। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন? তার আগে কোনো অস্বস্তি টের পান নি? মানে, কি রকম মনে হচ্ছিল?

কপালের ওপর প্রভঞ্জনের হাতখানা তখনও ছিল। রমিতার পেলবস্পর্শ হাত ওর কঠিন কয়েকটি অঙ্গুলিকে স্পর্শ করে যেন সম্মোহিত করে রেখেছিল। ঠাণ্ডা নরম ধবধবে ওর মুঠোর ঘামে প্রভঞ্জনের বন্দী হাতখানা ভিজে উঠেছে! দীর্ঘকাল পরে যুগান্তর পারের কবরের তলা থেকে একটা জীবন-কঙ্কাল যেন এগিয়ে আসছে, আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। প্রভঞ্জন চমকে উঠল। যাকে সে দেখেছিল, বেশ মনে পড়েছে—এমনি একটা রাত্রির স্তব্ধতায়, একটি আরও নমনীয় স্নেহময় স্পর্শে কাতর হয়ে গুমরে উঠেছিল যে প্রাণ, এ তারই ছায়া-কঙ্কাল। সচেতন হাতখানা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু বন্ধন যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠল। আয়ত সুন্দর চোখের মুখর অভিব্যক্তি অন্ধকারের পটভূমিকায় সাদা বকের মত শুভ্র হয়ে ধরা দিল। প্রভঞ্জন ব্যাকুল আর্ত কণ্ঠে বলল—না, না, ছেড়ে দিন! ছাড়ুন। উঃ! কি ভুল করছেন রমিতা দেবী!

—পারব না! একলা থাকতে পারব না আর। তুমি ত জানো প্রতি পলে জ্বালা! নিজের সঙ্গে আর লড়াই করতে পারছি না।

একটু চাপ দিয়েই প্রভঞ্জন হাতখানা মুক্ত করে নিল। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল সে—একা কে নয় বলো! পথ ত একারই জন্য—

—আর পথ নয়। ঘরে যাবার জন্যে মন পাগল।

—ঘর ত নির্জন! পথে তবু আর পাঁচজনের দেখা পাবার আশা থাকে। কিন্তু ঘর থেকে যে আর সবাইকেই দূরে রাখা হয়।···আমিও এই ভুল করতে বসেছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের টানে পথের পাঁচজনের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ হ'ল —ঘর নির্বাসিত। খুব কষ্ট হ'ত। ঘর ছাড়া জীবন নিরর্থক মনে হয়েছিল! কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের সুখদুঃখ আর জীবনমরণের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে বুঝলাম—জীবন দর্শনই জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন।

রমিতা সোজা হয়ে উঠে বসে বলল—মহারাজ, তোমার কাছে সান্ত্বনা ভিক্ষে করি নি। ওতে মন ওঠে না। তুমি না বলেছিলে, আমার এ মনকে গৃহস্থ করতে হবে—তবে আজ কেন পিছিয়ে যাচ্ছ! তখন যদি ভরসা না দিতে তাহলে এ দাবির সাহস হ'ত না আমার। অবলম্বন কে চেয়েছে? আশ্রয়ও চাই নে—জীবনকে অনুভূতি দিয়ে বাঁধতে চাই।

অনেক রুক্ষ কঠিন কথাই বলতে পারত প্রভঞ্জন, কিন্তু আজ যেন এইসব শক্ত কথার ঘা দিয়ে এ পরিবেশটুকু নষ্ট করতে সাহস হয় না। প্রভঞ্জন শুধু বললে—আমরা চিকিৎসক। আধিব্যাধি বিশ্লেষণের অধিকার আছে। এর বেশি ত কিছু—

—অনেক বেশি অধিকার তোমার আছে। অমন মুখোশ পরে থেকো না, দোহাই! আমি ত তোমায় কেড়ে নিতে চাই না, বন্দী করতেও চাই না —শুধু দেখতে চাই মুখোশ খুললে তোমার আসল মানুষের রূপটা কি! এমনি ভাবে মানুষের মনকে খুন ক'রো না নিজের হাতে।

—শরীর আরও খারাপ হবে যে। শান্ত হও—

—বেশ হোক। আমি মরে গেলে তাতেই বা তোমার কি। উঃ তুমি কি পাষাণ! না, না তোমার ত দোষ নয়— আমিই যে অন্তঃসারশূন্য।

—আমি মানুষ নই রমিতা—শিরাধমনী আর শ্বেতকণিকা, লোহিতকণিকার সমষ্টি, পেশী আর হাড়ের কাঠামো ছাড়া আর কিছু নই আমি! মানুষটাকে কয়েক বছর আগে পথের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।—এখন ডাক্তার।

—তবু যে ভুলতে পারছি না, তোমার এই দুটো চোখেই পিপাসা দেখছি। সে কী ভুল? না, না! ভুল নয়। উঃ, কেমন কষ্ট হচ্ছে। বাতাস নেই? ধরো—

বলতে বলতে রমিতা প্রভঞ্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। প্রভঞ্জন বুঝতে পেরেছিল রমিতার ফিট হয়েছে। ধরে ওকে শুইয়ে দিল। তাড়াতাড়ি আলোটা বাড়িয়ে ডাকল—পরিবর্তন বাবু, পরিবর্তন বাবু।

পরিবর্তন সাড়া দিলেন—এই যে যাই ডাক্তার বাবু।

প্রভঞ্জন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় বিশেষ কিছু করতে গেলে রোগীর কষ্টই বাড়ে তবু প্রভঞ্জন ভাববার চেষ্টা করে, কি ভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে রমিতার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা যায়। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হয় তার। পরিবর্তনের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে সে। পরিবর্তন বলল—ঠিক এই রকম হয়েছিল বিকেলে। বলেন ত ডাক্তার দেবকে একবার ডাকি—তিনি হাজার হলেও বহুদর্শী।

আহত আত্মাভিমানে দৃপ্তকণ্ঠে প্রভঞ্জন জবাব দেয়—দরকার নেই।

হতাশার নিরুপায় ভঙ্গিতে পরিবর্তন বলে—ভালো! কিন্তু প্রভঞ্জন বাবু আপনার ওপর একটু আস্থা ছিল এই যে, দুরবস্থার সুযোগটা অন্তত আপনি নেবেন না—এখন দেখছি সবাই সমান।

—তার মানে?

—না, কিছু নয়।

এরপর পরিবর্তনের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক কোমল হয়ে আসে—সত্যি জানেন না আপনারা, সান্ত্ব আমার কি মিষ্টি মেয়েই ছিল। ওর চোখে ছিল মায়া, মনে মাধুর্য! ও আমার এমন মেয়ে ছিল না—তাই ত বড় কষ্টেও ওকে দুনিয়ার ছাইগাদায় ফেলে দিতে পারি নি। না হলে এই বুড়ো বয়সে এর মধ্যে পড়ে থাকতে পারি! এখনও ও কাঁদে—কাঁদে বলেই ভরসা হয় আবার একদিন এই ভুলের পালা শেষ ক'রে ফিরে আসবে ঘরে। শঙ্কর, শঙ্কর—! 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। শক্তির মহিমা আছে।

প্রভঞ্জন স্টেথোস্কোপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তার দৃষ্টি রমিতার আড়ষ্ট স্থির মুখের ওপর।

রমিতার দেহ যখন ঈষৎ নড়ে উঠল তখন সে সম্বিত ফিরে পেল। প্রভঞ্জন দেখল পরিবর্তন পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল অবস্থায় দণ্ডায়মান।

কি এক অব্যক্ত নমনীয়তায় প্রভঞ্জনের মনটা কোমল হয়ে আসে। সে মিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রমিতা চোখ মেলে তাকাল, ওর চাহনি কেমন অপরিচিত। কিন্তু রমুহূর্তে প্রভঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ওর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি খেলে গেল।

রমিতা বললে—ডাক্তার বাবু! আপনি খুব কষ্ট করছেন আমার জন্যে—

সম্পূর্ণ অন্য মানুষ—এ যেন অভিনেত্রী রমিতা মজুমদার। কিছুক্ষণ পূর্বে ান্ধকারে যে নারী আপনার আকুল অন্তরবেদনাকে উৎসারিত করেছিল স যেন আর কেউ! একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে প্রভঞ্জন বলে—না, ষ্ট আর কি!

—ক'টা বাজলো?

এ প্রশ্ন প্রভঞ্জনেরও প্রশ্নের প্রতিধ্বনি! সেও অলক্ষ্যে বললে—ক'টা াজলো? তারপর ঘড়ি দেখে বললে—দশটা সাঁইত্রিশ!

—তাহলে আর আটকে রাখা ঠিক নয়। এতক্ষণ মিথ্যে নষ্ট হল াপনার।

তারপর পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে রমিতা বললে—বাবা! ওঁর প্রণামীটা দিয়ে দাও—একশ'। কত কাজের ক্ষতি করে এসেছেন—!

নিতান্ত সাধারণ কথা অথচ আজ এগুলো যেন প্রভঞ্জনকে মর্মান্তিক াঘাত করে। অথচ মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারছে না সে। প্রভঞ্জন াড়ষ্ট ভাবে দু'হাত তুলে নমস্কার করে বেরিয়ে যাবার সময় পরিবর্তনকে লেলে—আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, কয়েকটা ওষুধ দিতে হবে াত্রের জন্যে।

—আমিই যাচ্ছি!

—না, না, তাহলে বাড়িতে থাকবে কে?

—আর কে-ই বা যাবে? কেউ ত নেই।

—আচ্ছা, আমিই পাঠাবো। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

শেষের এই অযাচিত উপকারটুকু করবার সুযোগ পেয়ে প্রভঞ্জন নিজেকে কিছুটা উপকৃত বলেই মনে করে। তবুও একটা আলোড়ন অনুভব করে সে।

তার বুকের মধ্যে হাতুড়ির প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে কঠিন একটা কিছু ভাঙতে চেষ্টা করছে কে।

আগামী কাল ক্লার্জিম্যান হলে ডাক্তার সরকারকে অভিনন্দন জানানো হবে। উদগ্র উৎসাহে একদল ছাত্র সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে—শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সমাবেশ সাধনই তাদের সংকল্প। তারা জানে, ডাক্তার সরকার অসাধারণ মনীষার অধিকারী এবং সত্যকার সমাজসেবাব্রতী। ক্লার্জিম্যান হল তেমন প্রশস্ত নয়—হয়ত শেষ পর্যন্ত তারা অভ্যাগতদের সকলকে বসবার জায়গা দিতে পারবে না, কিন্তু সেকথা এখন ভাববার সময় তাদের কই।

প্রভঞ্জনকে একটা অভিভাষণ পাঠ করতে হবে। এটাই তার তরফের একমাত্র কর্তব্য। সে সম্পর্কেও ছেলেরা বার কয়েক আনাগোনা করেছে, তারা বলেছে অভিভাষণের অগ্রিম কয়েকটা নকল সব কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে, যাতে ডাক্তার সরকারের অমূল্য বাণীর সবটাই দেশবাসীর সমক্ষে প্রচারিত হয়। তরুণ মনের এই অদম্য আগ্রহের উজ্জ্বলতা যেন প্রভঞ্জন সরকারের মনকেও নূতন করে উজ্জীবিত করেছে। এদের চোখের রঙীন স্বপ্ন, মনের নবীন অভিব্যক্তি যেন পৃথিবীকে দেখবার নতুন দৃষ্টি এনে দেয়। আশার দৃপ্ত বর্তিকায় এদের দৃষ্টি নিঃসঙ্কোচ।

যখন প্রভঞ্জন রমিতার চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সেই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ বার চারেক তার চেম্বার, ল্যাবরেটরী আর বাড়িতে ছেলেরা ছুটোছুটি করেছে, হাসপাতালে ফোন করেছে। অবশেষে হতাশ হয়ে তারা জানিয়ে গেছে যে রাত সাড়ে এগারটার সময় তারা ডাক্তার সরকারের অভিভাষণ নিতে আসবে। কাল সকালের মধ্যে ছাপার কাজ শুরু না হলে যথাসময়ে অভিভাষণ-লিপি বিতরণ করা যাবে না। খবরের কাগজওয়ালাদের তরফ থেকে যে সব রিপোর্টার আসবে তারা কেবল চা আর খাবার খেয়ে গোটা কয়েক কথার ভুল অর্থ বুঝে যা খুশি তাই লিখে নিয়ে যাবে, সেটা ছাত্ররা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। খবরের কাগজের ওই সবজান্তাদের হাত থেকে ডাক্তার সরকারকে ছাত্ররা বাঁচাতে চায়। তাই তারা নিজেদের তরফ

থেকে পাকা ব্যবস্থা রাখতে তৎপর। সম্পাদক মহাশয়দের আনানোর আয়োজনও হয়েছে কর্তাতে। মোটকথা, প্রভঞ্জনের অজান্তে তাকে নিয়ে একটা হুলুস্থুল হৈচৈ করবার উদ্যোগ চলেছে।

বাড়ি ফিরে খবর পেয়ে প্রভঞ্জনের চক্ষুস্থির হয়ে গেল। তার ধারণা ছিল যেমন আর পাঁচজন ডাক্তার গবেষণা করবার জন্ত সরকারী অথবা বেসরকারী অর্থসাহায্য পেয়ে বিদেশ যাত্রার সময় একটা ঘরোয়া অভিনন্দন পেয়ে থাকেন, তার বেলাও সেই গোছেরই একটা কিছু হবে। কিন্তু আজ আর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে, ডাক্তার পি. সরকারকে ছাত্ররা অল্পে রেহাই দেবে না। প্রভঞ্জনের একটা সুনাম হয়েছে একথা সে জানে, আজ বুঝল যে সে জনপ্রিয়ও বটে। তার এ জনপ্রিয়তা কবে হ'ল এবং কেন হ'ল, তা সে বুঝতে পারে নি।

এখন বসে বসে বিনীত ভদ্র ভাষায় সর্বসাধারণের মনোহরণকারী ফাঁকা কথা সাজাতে ভালো লাগছে না।

সকালে পার্বতীর বিষাক্ত ইঙ্গিত দিয়ে যে দিনের সূচনা হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি এতটা বিস্ময়কর এবং অভাবনীয় হবে তা কে জানত! পার্বতীর কণ্ঠের সেই তিক্ততা, মায়ের কঠিন নির্দেশ, জয়ন্তর অপমানকর উক্তি, রমিতার অপ্রত্যাশিত আবেগসিক্ত আচরণ—তারপর এখন এই অভিভাষণ লেখার তাগিদ!...অন্ততঃ আর সবকিছু থেকে কিছুক্ষণের জন্ত মুক্তি পাওয়া যাবে, এটা কম সান্ত্বনা নয় প্রভঞ্জনের বাত্যাবিক্ষুব্ধ মনের কাছে।

খুব সংক্ষেপে সে আহারাদি সমাপ্ত করে কাগজ কলম নিয়ে নতুন করে লিখতে বসল—এর আগে, সকালবেলা যা একটু লেখা হয়েছিল সেটুকু ছিঁড়ে ফেলল টুক্‌রো টুক্‌রো করে।

অল্প কথায় নিজের বক্তব্য স্পষ্ট ভাবে শেষ করাই তার মতে বিবেচকের কাজ। সে যা লিখলে তা মোটামুটি এই:

"আজ আপনাদের তরফ থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হচ্ছে বিদেশে—বিশেষ একটি শ্রেণীর রোগ সম্বন্ধে যে সর্বনূতন তথ্য আবিষ্কার হয়েছে সেগুলো জেনে আসবার জন্ত। আমি যৌনব্যাধির কথা বলছি। আজ আর একথা

অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই যে, যৌনব্যাধি একটা সমস্যা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য পৃথিবীর সর্বাধিক সভ্যসমাজেও এ সমস্যা নিতান্ত সামান্য নয়। তাই বলে আমাদের দেশে এর গুরুত্ব উপেক্ষা করা চলে না। আমাদের সমাজের বড় সমস্যা, রোগ গোপন করার অভ্যাস।

"বিদেশে না গিয়েও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এদেশের অসুখের চিকিৎসার সঙ্গে এইসব রোগের চিকিৎসাকে আরও প্রচুর পরিমাণে সম্প্রসারিত করা দরকার। অর্থাৎ যাতে খুব সহজে হাতের কাছে এইসব বিশ্রী ধরনের অসুখের চিকিৎসার সুযোগ আমাদের দেশের লোকে পায়, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এদেশে বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের রক্ত পরীক্ষার কোনো প্রথা নেই অথচ আজকাল এই অযত্নের ফলে অনেক পরিবারে জটিল সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে পারিবারিক জীবনের অশান্তি বড় সাংঘাতিক সমস্যা।

"আমাদের দেশের লোকে এদিকে একটু সজাগ হচ্ছে, এটা আশার কথা। কিন্তু এখনও এইসব অবাঞ্ছিত ব্যাধির বিরুদ্ধে তেমন ব্যাপক ব্যবস্থা রেওয়াজ নেই।

"যদি ঠিক মতো মানুষের মধ্যে এই ধারণা আসে যে, নানারকম অসংযত যৌনাচারের ফলে এই রোগেরা জাতিকে পঙ্গু করতে বসেছে তাহলে, এবং প্রত্যেক রোগী যদি যথাযথ চিকিৎসায় নিজেকে রোগমুক্ত করবার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলেই বাঁচোয়া। ব্যাধি শুধুই ব্যাধি। তা অপরাধ বলে ধরাটা ভুল।

"বাংলা দেশের একটা আনুপূর্বিক যৌনব্যাধির তালিকা দিলে দুরবস্থার খানিকটা বুঝতে পারবেন। খানিকটা বলছি, তার কারণ আমার বিশ্বাস, এই শ্রেণীর রোগাক্রান্তের শতকরা ষাটজনের ওপর লোক বিনা চিকিৎসায় অথবা বাজে টোটকা কিম্বা সস্তার 'অতিগোপনীয় রোগের অব্যর্থ ঔষধ: বিফলে মূল্য ফেরৎ' মার্কা ক্ষতিকর চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করে। পশ্চিম বাংলায় মোট তেরোটি এই রোগের সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। তার মধ্যে দশটি কলকাতায় এবং বাকী তিনটি ২৪ পরগণা, দার্জিলিং এবং হুগলী জেলায়।

১৯৪৮ সালে মোট ২,২৫,২৪৪ জন রোগী এই সব কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। ১৯৪৭ সালে ১,৭৬,০৬৩ জন রোগী এসেছিল চিকিৎসার ব্যবস্থার আশায়। ১৯৪৮ সালে রোগীদের মধ্যে নূতন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৩৫,৩৮১ জন, বাকী সব পুরনো রোগী। নতুন যারা চিকিৎসার জন্য এসেছেন তাদের মধ্যে সাড়ে ন'হাজার হচ্চেন মেয়ে। এই মেয়েদের মধ্যে ৬৩৯৩ জন গৃহস্থ, ১৪৭৪ জন বেশ্যা, ৬৬৩ জন ঝি, ৫২৩ জন কামীন্, ১৫৮ জন ভিখারিণী, ১৪২ জন ছাত্রী এবং ৯১ জন টেলিফোনে অথবা অন্যত্র চাকরী করেন। পুরুষদের মধ্যে ৯৯০১ জন শ্রমিক, ৪৪১০ জন ব্যবসায়ী, ৩৮৫৫ জন কেরানী এবং দোকান কর্মচারী, ৩৫৬২ জন চাকর, ১২৪৬ জন ছাত্র।

"এই তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমাজের সব স্তরেই এই যৌনব্যাধির কিছু না কিছু পদচিহ্ন পড়েছে। এই রোগের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে তার মূল কারণ অনুসন্ধান আর এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। তার মানে এ নয় যে, প্রতিষেধক উপায় আবিষ্কার করলে অবাধে নরনারীর যৌন সম্মেলনের সুবিধা হবে। সাধারণ নিয়মে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি অতিসাধারণ নিয়ম মেনে চলবার কথা, সেই নিয়মকে গোপনেই হোক আর প্রকাশ্যেই হোক লঙ্ঘন করলে তাকে তার মূল্য দিতেই হয়। সমাজ সংরক্ষণের জন্য যা করা দরকার সেটা কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

"একদিকে খাদ্যাভাবে, ক্ষয়রোগে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ লোক মরছে আর পঁচিশ লক্ষ লোক ওই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তার ওপর এই যৌনব্যাধির সমস্যা। আরো একটি সমস্যা যা সমাজ জীবনকে উৎপীড়ন করছে—তা হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ। মানুষ নানা উপায়ে তার নিজেদের দায়িত্বের বোঝা ভারী করতে প্রস্তুত নয়। যারা শিক্ষিত তারা বৈজ্ঞানিক উপায় গ্রহণের দিকে ঝুঁকেছে, আর যারা অশিক্ষিত তারাও চেষ্টা করছে জন্মনিয়ন্ত্রণের।

"এতে করে বোঝা যাচ্ছে যে, দেশের সমাজদেহে একটা আমূল পরিবর্তন চলেছে। এই সময়ে প্রত্যেকটি মানুষের এগিয়ে আসা দরকার নতুন পথকে সহজ, সুন্দর এবং বিজ্ঞানসম্মত করার কাজে সহায়তার জন্য।

"আমার আশা হয় আগামী সেই দিন বেশী দূরে নয় যখন এই পরিবর্তনের আলোড়ন মিলিয়ে গিয়ে সমাজের নূতন রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

"আপনারা আমার এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলে গ্রহণ করিলেই আনন্দিত হবো।"

লিখিতে লিখিতে প্রভঞ্জনের মাথা ঝিম্‌ঝিম করছে। লেখা শেষ করে তাকিয়ে দেখল ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই সাড়ে দশটা বেজে আর তারপর একটুও এগোয় নি। দম দেওয়া হয় নি।

আলোটা নিভিয়ে শ্রান্ত দেহে বিছানার আশ্রয় নিয়ে মনে হল—দীর্ঘকাল পরে সে বাড়ি ফিরেছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারের দিকে জাগ্রত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। ঘুম নেই—চোখে ঘুম নেই, পৃথিবীর বুক থেকে কে যেন ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে! কোথায় দূরের কোন ঘড়িতে একটা আধঘণ্টার সঙ্কেত ধ্বনিত হ'ল।···কাল সকালে উঠেই জয়ন্তর জন্য তদবির করতে যেতে হবে। ছাত্ররা কই রাত্রে আর এলো না!···ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—তারা ত ফোন করেছিল, লিখতে লিখতে উঠে গিয়ে প্রভঞ্জন নিজেই ত তাদের আসতে বারণ করে দিয়েছে। কাল ভোরবেলা তারা আসবে। তা আসুক, প্রভঞ্জন মোটামুটি তার বক্তব্যগুলো একরকম গুছিয়ে লিখতে পেরেছে বলেই তার বিশ্বাস। কিন্তু এতেও মনে কোনো তৃপ্তি নেই। নিজেকে কেন এত তুচ্ছ, এত ক্ষুদ্র, এত অজ্ঞ মনে হচ্ছে প্রভঞ্জনের! তার ধারণা হচ্ছে, সে কিছুই জানে না, যে জানার অধিকার নিয়ে একজন মানুষ আর পাঁচজনকে পরিচালিত করতে পারে সে জ্ঞান তার কই! এই ক'বছরে সে অনেক রোগীর চিকিৎসা করেছে, আরোগ্যও হয়েছে বহু লোক তার হাতে—অভিজ্ঞতাও অল্প হয় নি। তবু এটা ঠিক, যে বিজ্ঞানের সহায়তায় সে চিকিৎসক খ্যাতি লাভ করেছে তা আজও নির্ভুল বা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে নি। চিকিৎসা-বিজ্ঞান অগ্রগতির পথে চলেছে, সাধনা করছেন অনেক মনস্বী, আবিষ্কার হচ্ছে অনেক নতুন তত্ত্ব এবং তথ্য—প্রভঞ্জন যথাসাধ্য আধুনিকতম বিজ্ঞান সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবু আজ এ অজ্ঞতাবোধ, এ অসহায় মূঢ়তা তাকে পেয়ে বসেছে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার মনের সামনে জেগে ওঠে অতৃপ্তি

অবজ্ঞা—ফাউষ্টের একটা রহস্যময় ছবি, তার ওষ্ঠে তীব্র আত্ম-অবজ্ঞার অভিব্যক্তি!

Master and Doctor are my titles,
For ten years now, without repose,
I have held my erudite recitals
And led my pupils by the nose.
And round we go, on crooked ways or straight,
And will I know that ignorance is our fate,
And this I hate."

বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে আনন্দ আর উৎসাহের পরিবর্তে এ কী দুঃখ বেদনার যন্ত্রণা তাকে পেয়ে বসল! এই যে নিজেকে ছোট করে দেখা, এতে মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা মুছে যায়, বেঁচে থাকাটাও কি শেষকালে তার কাছে নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে?···নিজের মধ্যে কে যেন কথা কয়ে উঠল—হ্যাঁ পারে বই কি! আদি মানবের মনেও এ জিজ্ঞাসা ছিল। তবে সে জিজ্ঞাসার রূপ ছিল অন্য, সেখানে মানুষ কল্পনা করে নিতে পেরেছিল পরাশক্তিসম্পন্ন এক বিধাতাকে, তার দিকে আকুল অন্তর সমর্পণ করে বলেছিল—আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে চলো। মানুষ আলোর দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করছে। এ কে জানে এর শেষ আছে কি না! হয়ত এই প্রশ্ন মানুষের অন্তরের জিজ্ঞাসাকে জ্বালিয়ে রাখবার বীজমন্ত্র! জিজ্ঞাসাই ত মানুষের মনুষ্যত্ব! প্রশ্নের অবসান বুঝি বা মনুষ্যত্বের শেষ সীমা।

এই ছাড়াও অন্য প্রশ্ন তার মনকে নাড়া দিতে চেষ্টা করে—কিন্তু প্রভঞ্জন দৃঢ়ভাবে নিজেকে সে দিক থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। অবশেষে বার বার ব্যর্থ হয়ে সে বিছানার ওপর উঠে বসল। তারপর অন্ধকারেই কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খানিকটা খেয়ে বাকীটা চোখেমুখে আর কানের পাশে ছিটিয়ে দিল। সে যখন পুনরায় বিছানায় এসে বসল তখন তার কাঁধের পাশ বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছে।

গভীর অন্ধকার তার মনে একটা আতঙ্ক সঞ্চার করে—একটা ছায়া যেন

এন থেকে বেরিয়ে আসে বাইরে ওই জানালার সামনে, যেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেইখানে। প্রভঞ্জন ইচ্ছে করেই সেদিকে তাকায় না। ও ছায়া ত তার অপরিচিত নয়। না দেখেও সে বুঝতে পারে একটা দৃষ্টি স্পর্শ করেছে তাকে! কে, ডরোথী? না রমিতা!

ডাক্তারকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পরিবর্তন মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—সান্ত্ব, একটা কথা বলব মা।

ক্লান্ত দৃষ্টিতে রমিতা পিতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পরিবর্তন বলে, তুই একটু ঘুমো। এখন থাক পরেই বলব।

—না, বাবা! তুমি কি বলছিলে বলো, ঘুম হবে না।

যে কথাটা পূর্ব মুহূর্তে বলবার জন্য পরিবর্তন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সে কথাটা যেন তখন তাঁর পক্ষে বলতে পারা খুব শক্ত! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—ডাক্তার সরকার খুব চমৎকার মানুষ!

—এই কথা!

—না, —লোকটি মহৎ!

—আমার কাছে অন্তত তার মহত্বের বিজ্ঞাপন দরকার হচ্ছে না।

—মানে ওরকম লোকের মনে আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

—আঘাত আবার কে দিল?

—ঠিক আঘাত নয়—মানে—

—বুঝলাম!

পরিবর্তন এবার উঠে পায়চারী করতে করতে বললেন, আসল কথাটা তবে বলি, শোনো মা সান্ত্বনা! তোমার খেলার নেশাটা আর ওই মানুষটির ওপর চালান দিয়ো না।

যে কৌতূহলটা রমিতাকে চঞ্চল করে তুলেছিল এ কয়টি কথায় সেটুকু নিবৃত্ত হবার নয়। কিন্তু একে ঠিক সাধারণ কথা হিসেবেও ধরা চলে না। দীর্ঘ দিন হ'ল পরিবর্তন মেয়েকে তার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোনো কথা বলেন

না। আজ হঠাৎ এ রকম গুরুতর ব্যাপারে পরিবর্তন মতামত জারি করছে এটা রমিতার কাছে আশাতীত।

অনেকক্ষণ পরে পরিবর্তন আবার বললেন: হয়ত অসঙ্গত আলোচনায় এসে পড়লাম—তবু বলি যে, প্রভঞ্জনকে তুমি এভাবে টেনো না! ওর মধ্যে যে মেরুদণ্ডযুক্ত মানুষ আছে তাকে বাঁধতে গেলে যে নিষ্ঠার প্রয়োজন তা তোমার নেই। মা অনেক ত দেখালে, দেখলেও ঢের—কিন্তু কি পেয়েছ বল তো?

—বাবা, আমার শরীর খুব খারাপ, তা হোক তুমি বলে যাও! আমারও বলবার কথা আছে, সেটা শুনবে শেষে!

—আমি আর কিছুই বলতে চাই না! বলছি যে প্রভঞ্জনকে বাঁধতে চেষ্টা করো না।

—যদি এমন হয় যে, আমিই বাঁধা পড়ে গিয়েছি।

—সান্ত্বনা তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে আমি চিনি।

—তোমার মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম; কিন্তু এখন আমার নিজের একটা সত্তা গড়ে উঠেছে। তাকে অস্বীকার করবে কে! বাবা, আমি যে দিন মিহিরের জুতোসুদ্ধ লাথির চিহ্ন বুকে নিয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন তুমি ত সংকল্প করেছিলে আমার কোনো কাজেই বাধা দেবে না! তুমি আমায় স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিলে। তবে আজ কেন বাধা দিতে চাও? আর বাঁদর নাচ দেখে বেড়াতে পারছি না। তুমি কাশী চলে যাও! আমি প্রভঞ্জনের সঙ্গে ভেসে বেড়াব।

—উঃ, কী অভিশাপ। আমি তোমার স্বাধীনতাকে সম্মান দিতে আজও প্রস্তুত আছি কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করি নি, করতে পারব না। তবুও—

—অভিশাপ নয় বাবা মুক্তি নাও।

—মুক্তিই ত অভিশাপ রে! যদি পারতাম তবে কি চোখের ওপর এ সয়েও এখানে থাকতাম? পারি না, তোকে একলা রেখে শান্তিতে থাকতে পারি না। তার প্রতিশোধ কি এমন করে সুদে-আসলে নিবি?

—না, এবারে বাইরের পাট চুকিয়ে দিয়ে বাসা বাঁধবো বাবা! আর নয়।

—কিন্তু সে কি পাবে? যাকে তুমি খাঁচায় পুরবে—তার কি দানাপানি

—কেন? আমার মন? মন ত আমার আর কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে পারে নি।

—কেউ নয়?

—না, কেউ নয়!

—মন ছাড়া আর কি দিবি তাকে?

—সব। কিন্তু বাবা, আমায় তুমি আটকে রেখো না, আমি ওঁর সঙ্গে সমুদ্রে ভাসব।

পরিবর্তনের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল—শঙ্কর, শঙ্কর।

অসহায় প্রতিধ্বনি দেওয়ালের চারদিকে ব্যর্থবিস্তারে ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল।

পরিবর্তন বলেন—কিন্তু সে যদি তোমাকে না নেয়? সে চিরকুমার। তার চোখেমুখে বলিষ্ঠ ব্রহ্মচারীর রুক্ষতা দেখেছ!

মুখ ফুটে বলতে পারল না রমিতা; মনে মনে যে কথাটা বার কয়েক বলল—সেটাই ত আমায় পাগল করেছে। অপরাজিত পৌরুষ আমার ধ্রুবতারা!

কলিংবেলটা বেজে উঠল। পরিবর্তন ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন এবং মিনিট তিনেক পরে একটা ওযুধের শিশি এবং একটি মোড়ক হাতে করে ফিরলেন।

টেব্‌লের ওপর সেগুলি রেখে মোড়ক থেকে একটি পুরিয়া বার করে, গ্লাসে জল ঢেলে নিয়ে মেয়ের মুখের কাছে ধ'রে বলেন—হাঁ করো।

রমিতা প্রশ্ন করে—এটাও তেতো নাকি?

—কি করে বলবো? এইমাত্র ত প্রভঞ্জন লোক দিয়ে পাঠিয়েছেন, নতুন ওষুধ।

ওষুধ এবং জল নিঃশেষ করে বিকৃত মুখখানা যতদূর সম্ভব প্রশান্ত করে রমিতা বলে—দেখলে ত, এবার বিশ্বাস হচ্ছে!

বিস্মিত দৃষ্টিতে পরিবর্তন বলে—কি!

—উনি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তা বুঝতে পারছ!

—কেন?

—বাঃ, এই যে ওষুধ পাঠিয়েছেন।

পরিবর্তন অবজ্ঞাভরে ওষুধের শূন্য পুরিয়াটাকে আঙুলের চাপ দিয়ে ছোট্ট করে পাকাতে পাকাতে বলেন—এটা ডাক্তারের কর্তব্য করেছে সে!

রমিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল।

বেরিয়ে যাবার সময় পরিবর্তন ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকারে রমিতার ঘুম নেমে আসা ওষ্ঠের সীমান্তে যে তৃপ্তির হাসি ভেসে উঠেছিল—তা দেখবার জন্য কেউ ছিল না তার কাছে। অনেক দিন আগে বোধহয় এমন হাসি সর্বক্ষণ লেগে থাকত ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখে।

…জাহাজ চলেছে! এই অচেনা মুখের মেলাতে একটিই পরিচিত—অতি পরিচিত মানুষ। তা হোক, বিশ্বময় আর সব কিছু যেমন খুশি তেমনই থাক না কেন, রমিতার তাতে কিছু এসে যায় না। এখন ওরা জাহাজে যাচ্ছে, কই লোকেরা যে গল্প করে জাহাজে উঠলেই বমি হয়, শরীর খারাপ করে রমিতার ত সে সব কিছু হচ্ছে না! একটু অবাক হয়ে রমিতা প্রশ্ন করে, তার জবাবে প্রভঞ্জন বলে—ভয় নেই, আর কিছু হবে না। চারদিন ত কেটে গেল।

রমিতা বলে—বাঃ বেশ ত! আর কোনো ভাবনা নেই। একবার আমেরিকায় যাবো। হলিউড! তুমি কিন্তু আপত্তি করতে পারবে না।

—আমায় আগে যেতে হবে লণ্ডনে বেকার স্ট্রীটে ডাঃ স্মিথের ক্লিনিকে। তোমরা যে বড্ডই বলো টেভিস্টক ক্লিনিকে তোমার একটা টেস্ট করিয়ে নেওয়া ভালো।

সে কথায় রমিতা হেসে উঠল।…

ঘুম ভেঙে গেল। এ কী, বালিশটা ঘামে ভিজে গিয়েছে। ঘুমজড়ানো চোখে চারিদিকে তাকিয়ে রমিতার মনে হয় সকাল হতে আর দেরি নেই। মনে পড়ল স্বপ্নের কথা—হ্যাঁ টেভিস্টক ক্লিনিকের কথা প্রভঞ্জন গল্প করেছিল একদিন। সেখানে মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই সব কিছু চিকিৎসা হয়। স্বপ্ন দেখছিল রমিতা!

সামনের কয়েকটা দিন রমিতা সাবধানে থেকে শরীরটা সুস্থ করে নেবে। তারপর আর কোনো ভাবনা নেই। কোনো সংশয়ের ছায়াকে ও আমল দিতে চায় না। একটা আশা ও আশ্বাসের প্রবাহে সব সন্দেহের পরিসমাপ্তি করতে চায় রমিতার তৃষাদগ্ধ মন। গুন্ গুন্ করে ও গেয়ে উঠল :

"জ্বালো নবজীবনের
নির্মল দীপিকা,
মর্তের চোখে ধরো
স্বর্গের লিপিকা !"

শহর জেগেছে অনেক সকালে, কিন্তু আপিস পাড়ার হানাবাড়িগুলো এখনও তেমন মুখর হয়ে ওঠে নি কেরানীর জুতাঘর্ষণে। কলকাতা শহরের রাজপথগুলো গাড়িঘোড়া এবং মানুষের ভিড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সারি সারি দোকানপত্র নতুন দিনের প্রথম উদ্যমে চঞ্চল। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ-এর সম্মুখে দীর্ঘ একটি অবিচ্ছিন্ন মানুষের সারি। তাদের মধ্যে শুভ্র-মলিন বেশবাসের বৈচিত্র্য আর অবোধ্য গুঞ্জন। পদাতিক যাত্রীরা হাতে রুমাল বাঁধা কৌটোয় যথাসম্ভব আহার্য সঞ্চয় নিয়ে আপিসের দিকে ক্ষিপ্রবেগে চলমান। বেলা নটা।

সাহেবপাড়া—না, ঠিক সাহেবপাড়া না বলে এ অঞ্চলকে মিশ্র [illegible] বলা উচিত। ললিতার মা সাত সকালে উঠে ডাক্তার দাদাকে [illegible] পাবার আশায় ছুটেছিল, কিন্তু প্রভঞ্জন নাকি অন্ধকার থাকতে থাকতেই বাড়ি হ'তে বেরিয়েছে। অগত্যা অপ্রসন্ন মনে বাসিপাট সেরে দিয়ে, মোটামুটি বাসনপত্র মেজে অবশেষে নিধুকে মাছ ক'টা কুটে দেবার কথা ব'লে ললিতার মা যখন প্রভঞ্জনের ডাক্তারখানায় এসে পৌছলো—বেলা তখন প্রায় নটা। তার হাতে মাত্র একটি টাকা সম্বল : চমৎকারিণীর কাছে প্রচুর ধার নেওয়া হয়ে গেছে, অন্যত্রও আর কেউ ধার দিতে চায় না। এখন একমাত্র ভরসা প্রভঞ্জন। প্রভঞ্জনের কাছে মুখ ফুটে চাইতে মন সায় দেয় না—আর কারণ, ললিতার মা বেশ ভালো করেই জানে যে, এই মানুষটির ঋণ পরিশোধ করবার

কোন পথ নেই, বিনাবাক্যব্যয়ে প্রভঞ্জন সময়ে অসময়ে পাঁচ-দশ টাকা চাইবামাত্রই দিয়ে থাকে। এমনিতে ললিতার মা মানুষকে ঠকিয়ে, কাজে-ফাঁকি দিয়ে আপন স্বার্থটুকু বজায় রেখে চলতে খুবই পটু—কিন্তু যে মানুষকে ফাঁকি দেবার সুযোগ নেই, যার বিন্দুমাত্র উপকারে সে আসতে পারবে না, যাকে ঠকাবার কোনো অছিলাই মিলবে না—তার কাছে হাত পাততে ওর কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। ও হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যারা নিজের যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে জগৎকে নিজের মত করে বোঝাবার চেষ্টা করে! ললিতার মায়ের নিজস্ব একটা দার্শনিক দৃষ্টি আছে। ওর ধারণা, মানুষকে মানুষ ঠকায়, তাতে বুদ্ধির খেলা আছে—আদানপ্রদানের বিনিময় যেখানে চলে সেখানে প্রতিপক্ষকে বঞ্চিত করায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভের গৌরব আছে। যেখানে বুদ্ধির খেলাটাই বড় কথা সেখানে পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু একটি মানুষের ভালোমানুষীর সুযোগে নিজেদের দিনযাত্রা নিরঙ্কুশ রাখার প্রতিদানে কণামাত্রও প্রত্যর্পণ করার সুযোগ মিলছে না, এটা কম সমস্যার কথা নয়। ললিতার মায়ের শাস্ত্রে বলে, 'এ জীবনে যার ঋণ শুধতে পারলি না, তার ধার শোধ করবার জন্যে আবার তোকে জন্ম নিতে হবে।' অবশ্য পাপ ত জীবনে ও কম করে নি, পুনর্জন্ম না চাইলেও ওকে আবার ফিরে আসতে হবে পাপক্ষয় করবার জন্যে। কিন্তু তাই বলে ডাক্তার দাদাকেও আর এক জন্ম টেনে আনবে এই ধার শোধ নেবার জন্যে? সেটা ঠিক সঙ্গত বলে মনে হয় না ওর। কারণ ও জানে ডাক্তার দাদা মানুষের দেহে দেবতা বিশেষ। তবু, এই বিপদের সময়ে আর কোনো উপায় ছিল না, তাই ললিতার মা এই আপিসপাড়ায় ডাক্তার দাদার আপিসে দেখা করতে এসেছে।

কমপাউণ্ডারের অনুমতির অপেক্ষা না করে ললিতার মা ডাক্তারের Consultation-room-এ ঢুকে পড়ল।

ঘরে আর কেউ ছিল না, ডাক্তার সরকার টেলিফোনে কথা বলছে। ফোনের ধাতবযন্ত্রে ধাক্কা খেয়ে তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর শোনাচ্ছে। ললিতার মা চুপ করে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল।

—না, না তুমি সেখানেই দেখা করো। তুমি ওর অনেক কালের বন্ধু!

আমি ত ওর চিকিৎসক মাত্র।...এঁ্যা, কি বললে? ছাখো পরমেশ, আমি ছেলেমানুষ নই, আর সেও তেমন মেয়ে নয়, তবে অন্য ক্ষেত্রে কি হ'ত তা বলতে পারি না।...তোমার ধৈর্য এবং সহনশীলতাকে শুধু প্রশংসা করতে চাই না। হ্যাঁ, আমি বলি কি, তুমি রোজ রোজ আমার কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে খুশি থাকতে পারো না, তার চেয়ে আগে যেমন রমিতার বাড়ি যাওয়া আসা করতে তেমনি করো।... এঁ্যা, পরীক্ষা? তোমার ও পরীক্ষা দেওয়াটা একটা খেলা মাত্র। পাশ করতে চাও? Seriously! যদি বলো তবে আমি গিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারি, অবশ্য তার দরকার নেই! আমি জানি সব।...কি? জানি না বলছ! আমি যদি বলি যে, সাধারণ যে কোন্ ডাক্তারের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নও তুমি, তাহলে ভুল হবে না। থাক। ওসব কথা, আমায় বলো দেখি—তুমি রমিতার জন্য দূর থেকে এত কৌতূহলী কেন?...এঁ্যা কি বললে, তোমাকে পছন্দ করে না? এঁ্যা! হ্যালো হ্যালো—পরমেশ! পরমেশ—।" রিসিভারটা নামিয়ে রেখে প্রভঞ্জন নিজের মনেই বলে—'কেটে দিল? না, পরমেশ ছেড়ে দিল! অদ্ভুত ছেলে!

ললিতার মায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল প্রভঞ্জন। পরমুহূর্তে স্মিতহাস্য সহকারে বললে—বলো, কি ফরমাস।

পায়ের ধুলো নিয়ে জিভ কেটে প্রৌঢ়া উত্তর দিল—দোহাই দাদা, এমনিতেই পাপে তলিয়ে আছি, তার ওপর তুমি ওসব বলে অপরাধী কর না।

—বেশ, তাড়াতাড়ি কথা শেষ করো। বাইরে অনেক লোক বসে রয়েছে এখনো কাউকে দেখি নি।

—দাদা তোমার দয়া জীবনে ভুলতে পারব না, প্রাণ দিয়েও শুধতে পারব না।

প্রভঞ্জন ধমক দিয়ে উঠল—কাজের কথা শেষ করো। তোমার ত মেয়ের প্রসব হবার কথা ছিল না? হ্যাঁ সে কেমন আছে?

ললিতার মা সংক্ষেপে সমস্ত কথাই বলল।

প্রভঞ্জন বিচলিতভাবে চোখের চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল—সবাই বিধাতা-পুরুষ! তখন বারণ করলাম ওসব কাজে যেয়ো না,

পরে ভুগতে হবে, তা শুনলে না। এখন আমার কাছে কি জন্যে এসেছ শুনি? আছগাছড়া শেকড়-বাকড় দিয়ে ত মেয়েটাকে শেষ করে এনেছ।

—কি করব দাদা, গরীব। বুঝি ত সবই! বত্রিশ নাড়ীর যোগ, উপড়ে ছিঁড়ে ফেলতে কারই বা সাধ! তবে কি জানো, পোড়া পেটের জন্যে পরের দোরে মেগে বেড়াচ্ছি এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত, তার ওপর আবার মেয়েটারও সেই হাল করব এই কাঁচা বয়েসে!

প্রভঞ্জন মাটিতে পা ঠুকে বলে—ননসেন্স!

করুণ হাসিতে প্রৌঢ়ার মুখখানা ভরে গেল—দাদা, বিধাতার মার—কথায় বলে, ভগবান সাপ সৃষ্টি করেছেন, তার ফণাও দিয়েছেন, আর সেই ফণা দিয়ে সে যদি ছোবল মারে, তবে সে দোষ কি তার? তেমনি নিয়ম মানুষের বেলাও দাদা! বয়সের ধম্ম একটা আছে ত!

কোনো সদুত্তর দিতে পারে না প্রভঞ্জন। তবু চুপ করে থাকা খারাপ দেখায়, তাই সে বলল—কিন্তু এমন ভাবে নিজেদের সর্বনাশ আর কত করবে শুনি! এখন না হয় ওষুধ দিলাম, তাতে আপাতত কিছুটা ফল ফলল, কিন্তু ললিতার মা তুমি বুঝছ না, মেয়েটার দেহ ত জখম হয়ে গেল চিরকালের মত।

—সব বুঝি দাদা, কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না। আমাদের বাবাঠাকুর-তলার বস্তীতে সাড়ে পাঁচশ মাথা। এইত সেদিনও দেখেছি, একজন খেটে-খুটে পয়সা আনত আর দশজন বসে খেত। সে কাল আর নেই, এখন দশ-জনই খেটে পয়সা আনছে তবুও পুরোপেট কেউ খেতে পায় না। কি উপায় বলো? ভদ্রঘরের অন্য ব্যবস্থা, আর আমাদের গরীবের সেই শেকড়বাকড় আর দেবতার কাছে মানত করা, ধন্না দেওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই ডাক্তার দাদা!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রভঞ্জন অসহায় ভাবে বলে—এখনও অনেক দেরি! মানুষের মন সুস্থ স্বাভাবিক পথে ফিরতে অনেক দেরি! যে দেশের পঞ্চাশ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের অভাবের খেসারৎ দিতে হয় বিদেশের কাছে একশ তেত্রিশ কোটি ডলার, সে দেশের মানুষ সহজভাবে বাঁচবে কি করে।...একথাটা প্রভঞ্জন বলল সম্পূর্ণ স্বগতভাবে। পরমুহূর্তে ললিতার মায়ের দিকে তাকিয়ে

সে বলে—তুমি এতদিন মেয়েটাকে এভাবে ফেলে রেখে খুব অন্যায় করেছ। আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল। চলো, দেখা দরকার।

—অনেক দিন আগে তোমাকে বলেছিনু ত দাদা, তা তখন খুব রাগ করেছিলে। আমার ছোটলোকের মরণ, ভাবনু দাদাকে না-আনালেই হ'ল। কিন্তু এখন আর দিশে পাচ্ছি নে, তাই এলুম তোমার চরণাশ্রয়ে কিন্তু তুমি সেখানে যেতে চেয়ো নি দাদাবাবু। তাঁকে শা'নগরে এক জায়গায় রেখেছি। এমনি না হয় ওষুধ কিছু দাও।

—না, না, সে হয় না। তোমার ইচ্ছে মত সব কাজ চলে না। ঠিকানা রেখে যাও, আমাকে যেতে হবে।

এর পর আর ললিতার মায়ের কোন আপত্তিই টিকবে না—সেটুকু বোঝিবার মত বুদ্ধি তার আছে। কিন্তু যে কাজে এখানে আসা সেটাই এখনও বলা হয় নি। একটু ইতস্তত করে মাথা চুলকে বলল—ডাক্তার দাদা, গোটা কতক টাকা যে বড্ড দরকার।

—কত ?

—যা হয়—দশ, পনেরো! একটু বেশি পেলে অবিশ্যি ভালো হ'ত।

—হুঁ!

কুড়িটি টাকা আঁচলে বেঁধে পুনরায় প্রভঞ্জনের পায়ের ধূলো নিয়ে চলে যাবার সময় ললিতার মা বললে—দাদা, তোমার আর সে নরক দর্শনে কাজ নেই। এই বয়েস পর্যন্ত অনেক পার করলুম। আর কিছু নয়, নাড়িতে টান পড়েছে, সব টাটিয়ে রয়েছে। সেইটুকু শুকোবার ওষুধ যদি দাও! তুমি দেবতা, তোমার আর ওখেনে গিয়ে কাজ নেই। যদি রাগ না করো তো বলি, আমাদের টোট্‌কাও কিছু মন্দ নয়!

প্রভঞ্জন উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল—হয়েছে, তুমি খুব ডাক্তার! আমি কিন্তু আজই যে কোনো সময়ে তোমার মেয়েকে দেখতে যাবো। ডাক্তারীটা তোমাদের কাছেই নতুন করে শিখতে হবে দেখছি।

এ কথার পর ললিতার মা নিরুপায় হয়ে পুনরায় প্রভঞ্জনের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—অপরাধ নিয়ো না দাদা! মুখ্যুর মরণ দশা, কি বলতে কি বলিছি!

প্রভঞ্জনের ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ললিতার মা অসহায়ভাবে ট্রাম-বাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। উঃ, কী শাস্তি! ওই সব সাজগোজ করা "বাবু-বাবু" চেহারা নিয়ে বাছারা কী কষ্টে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। আহা বাছাদের কী কষ্ট! আহা যদি একটা গাড়ির সঙ্গে আর একটার ধাক্কা লাগে? কথাটা মনে হতেই ললিতার মায়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কী অলুক্ষণে কথা, কেন মনে হয়—ছি-ছি! মাথার ওপরে রোদ লাগছে, খুব চড়া রোদ! ললিতার মা নিরুপায় ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছে। ওই ভিড়ের মধ্যে কোথায় উঠবে ললিতার মা, কেমন করে যাবে! একখানা দোতলা বাস ওর সামনে এসে দাঁড়াল। কণ্ডাক্টর তার যান্ত্রিক কণ্ঠে হাঁকলে—আইয়ে মাইজী! কালীঘাট!—বাবু জেরা যানে দিজিয়ে! বাঁয়া তরফ লেডি সীট ছোড়িয়ে!—অদ্ভুত উপায়ে ললিতার মা বাসের মধ্যে প্রবেশ করল এবং আশ্চর্য ভাবে বসবার জায়গা পেল। বসতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল বটে, তার আশপাশে বাবু-ভদ্দর লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে দেখে কেমন একটু লজ্জা লাগে ললিতার মায়ের! উঃ কী ভিড়! ঠিক ওর পাশে বসেছিল একটি অল্পবয়সী মেয়ে, তার বাম বাহুর মধ্য দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগের বন্ধনীটা সাদা কাপড়ের ওপর পারিপাট্য সহকারে লতিয়ে পড়েছে। আড়চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বিচার করতে করতে ললিতার মা নিজের ভাগ্যের উপর প্রসন্ন না হয়ে পারে না। সত্যি আমার ললিতার চেহারার দিকে দু'দণ্ড চেয়ে থাকলে চোখ দুটো আরাম পায়। এই ত সব বিবিদের চেহারার ছিরি—এদের পাশে ললিতাকে রাজরাণী মনে হয়।

এই আপাতপ্রসন্নতার পরেই মেয়ের রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখখানি ভেসে উঠল ললিতার মায়ের চোখের সামনে। মেয়েটা শুকিয়ে একটুকু হয়ে গেছে, কিচ্ছু খেতে পারে না। আঘাত পাওয়া পাখীর মত করুণ দেখায় ওর চোখ দুটি! তবু ললিতার মা নিজের ওপর রাগ করতে পারে না।

বাস থেকে নেমে আদি গঙ্গার ধার দিয়ে ললিতার মা ব্যস্তভাবে মেয়েকে দেখতে চলল। কেওড়াতলার ঘাট ডান হাতে ফেলে একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকের গলি। গলিতে প্রবেশ করবার আগে ও রোজই একবার গঙ্গার

ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কাটায়। মাঝিরা রান্না করছে নৌকোর ওপর। ওপারে এক বাড়ির ছাদে কোন বৌ কাপড় মেলছে। শ্মশানের উৎকট মড়া-পোড়া গন্ধটা এখন আর তেমন বিশ্রী বোধ হয় না। ললিতার মা সংকীর্ণ জলরেখার কোলে অন্যমনস্কভাবে নেমে এল। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ে ডান হাতে করে জল ছিটিয়ে দিল নিজের মাথায়। আপন মনেই বলল —মা, তোর চরণে ঠাঁই দিস মা।

ওর দু'চোখ ভরে উঠল শান্তির স্নিগ্ধ অশ্রুতে।

আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল ললিতার মা, মনটা এখন অনেক হাল্কা।

গলির মুখে শ্রীপতিকে দেখেই তার মায়ের বুকের মধ্যেটা ছ্যাৎ করে উঠল। মুখভাব যথাসম্ভব সহজ রেখে তার মা প্রশ্ন করে—হ্যাঁরে এখানে কি করতিছিস।

শ্রীপতিও মায়ের সামনাসামনি পড়ে গিয়ে বেকুবের মত চুপ করে ছিল।

আবার তার মা জিজ্ঞাসা করল—কোথায় এইছিলি ?

শ্রীপতি মাথা উঁচু করে জবাব দিল—দিদির কাছে! তুই আমাকে মিথ্যে বলেছিলি কেন ?

অন্য সময় হলে ললিতার মা ছেলেকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট চীৎকার করে এবং যথাসম্ভব প্রহার করে তবে নিরস্ত হ'ত, কিন্তু আজ গোলমাল হাঙ্গামা আর ভালো লাগছে না।

মায়ের এবম্বিধ নীরবতায় শ্রীপতির বিস্ময়ের সীমা রইল না। চরম বিপদকে প্রতিহত করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই শ্রীপতি বীরত্বসহকারে যে সত্য কথাটা মায়ের কাছে ঘোষণা করল, সেটা এত সহজে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় সে একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল বই কি।

অতএব শ্রীপতি দ্বিপ্রহরের রোদের মত নিঃসঙ্কোচে মায়ের দিকে তাকিয়ে আরও গোটাকয়েক কথা না বলে পারলে না। সে বললে—তোর মতলবে চলে ওদের কিছু ভালো হয় নি। দিদিকে তুই মারবার মতলব করেছিস—আর আমাকে ত বিড়িওয়ালা বানিয়ে তুলেছিস।

ললিতার মা শান্ত কণ্ঠে বলে—মাঝ পথে দাঁড়িয়ে 'লেক্চার' ঝাড়চিস কেন?

ললিতার মায়ের কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু দৃষ্টি প্রখর, তার সন্দেহ হচ্ছে শ্রীপতি সকাল বেলাতেই 'নেশাভাঁশা' করেছে।

শ্রীপতি মায়ের কথা কানে তুলবে না সংকল্প করেছে। তার ইচ্ছে ছিল দিদির সঙ্গে গোপনে পরামর্শ ক'রে অতিসত্বর নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা চরম নিষ্পত্তি করা—কিন্তু ললিতার শারীরিক দুর্বলতার জন্যই যে অসুবিধা।

ললিতার মা বলল—রোজগারপাতি ছেড়ে দিয়ে বুঝি এই সবই হচ্ছে? বলি, ডানহাত মুখে তুলতে হয় রোজ তিন বেলা, তা মনে আছে ত? অত মেজাজ কাকে দেখাচ্ছিস! হুঁঃ, আমি বলি ভালো—কিন্তু এ হচ্ছে সেই, তেঁতুলের হাড় টক, মাস টক, পাতা টক, হাওয়াটাও টক! তোমরা বাছা সেই টকের ঝাড়। নিজের হাড়মাস কালি ক'রে মানুষ ক'রে এখন আমি চোর। তা চোর ত চোর বাবা! এ নিয়ে যেন আর ত্রিভুবন জড়িয়ে বেড়াস না। চুপ করে থাক, ঘরের কথা বাইরে বার করিস না বুঝলি!

—কেন? যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে চলো তেমনি এখন আমি রটিয়ে দিই।

তারপর নিজের বাহাদুরীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীপতি বলে—না, সে সব কিছু না! নফরদাদার কাছে সব খবর পেয়ে একদিন তার সঙ্গেই ত—

—এ্যাঁ, নফরও জানে নাকি? সর্বনাশ—!

আতঙ্কে হতাশায় ললিতার মায়ের হাত-পা শিথিল হয়ে এল।

শ্রীপতি মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে বলে—নফরদা ত এখানে আসে। চল মা, দিদির ওখানে গিয়ে সব কথা হবে। একটা পরামর্শ আছে।

ললিতার মায়ের যে সখী তার সহায়তা করেছে, তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছে আজ। সখীর এই বিষণ্ণতার হেতু ললিতার মায়ের অবিদিত নয়। সে শ্রীপতিকে বলল—ঘরে গিয়ে বস, আমি সইকে দুটো কথা বলে যাচ্ছি।

সখীর হাতে দশ টাকার নোট গুঁজে দিতে সে খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু অবশিষ্ট নোটখানার দিকে দৃষ্টি পড়তে তার চোখ দুটো পুনরায় বক্র হয়ে মুখের হাসিও মিলিয়ে গেল।

ললিতার মা সখীকে আজ ভুলতে পারছেন না। সে আপন মনেই বলে—

ইচ্ছে ত ছিল ফটিকজল, সবটাই দিয়ে নিশ্চিন্দি হই, কিন্তু ও বেলা যদি ডাক্তার আসে, তার পেছনে যে এক কাঁড়ি খরচা।

পরুষ কণ্ঠে জবাব এল—কেন, আবার ডাক্তার কেন? ফুবরেজ-বদ্দি বুঝি সব মরে উজাড় হয়েছে। তোমাদের আবার সব হালফ্যাসানের চাল দেখে গা কেমন করে। তা ভাই ডাক্তার ম্যাজিষ্টার বড়মানষি যা করবে করো, এই গরীবের দিকেও নজর রেখো। তুমি বলে তাই ফটিকজল, নইলে আমি নগদ ছাড়া এক-পা চলি না জানো। আর ভাই, আমার কি সাধ যায় না তোমার মেয়ের জন্য কিছু করতে? কিন্তু ভগবান মেরে রেখেছে। তেমন তেমন বয়সে মেয়েমানুষে সব রকমেই রোজগার করে, আমার ত জানো সবই, সেই যে তিনি সগ্‌গে গেলেন আমার সুখও সেই সঙ্গে। পরপুরুষের দিকে মুখ তুলে তাকাই নি—কোনো ড্যাকরাকে ছায়াও মাড়াতে দিই নি। পরকালের হিসেব কড়ায় গণ্ডায় মিলিয়ে দিতে পারব। হ্যাঁ তা খুব পারব।

তারপর স্বর্গতঃ পতিদেবতার উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করে চোখের জল মুছে সখী বলল—এখন তুমিই বলো ফটিকজল, ব্যবসা করি নি, অধম্ম করি নি, পয়সা হবে কেমন করে; এই যা দু' পাঁচজন আসে যায়, ঘরভাড়া বলে হাত তুলে দেয়, তাই গোবিন্দের চরণ ছুঁইয়ে পোড়া পেটে দিই! তা ভাই আজ-কালের মধ্যে তুমি বাকীটা শোধ করে দিও, নইলে এসব ভুলতে পারব না।

দীর্ঘনিশ্বাস এবং হাসি গোপন করে ললিতার মা মেয়ের কাছে এসে বসল। পরমুহূর্তে শ্রীপতি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বলল—শোন মা, তুমি কিন্তু আপত্তি করো না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ললিতার মা ছেলের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে।

শ্রীপতি একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল—এই ছাখ। দিদির শরীরটা একটু সারলে, দিদিকে ফিলিমের প্লেতে নামিয়ে দেবো।

—সে আবার কি রে?

—সিনেমা জান তো? ওই যে টকি গো!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব জানি, ছবিতে হাত-পা নেড়ে কথা বলে, গান করে। সেই যে চণ্ডীদাস হয়েছিল—একটা ধোপানীর সঙ্গে পীরিতির হয়ে। তা

কেষ্টসুদামা হয়েছিল। আমাকে আর সিনেমা দেখাতে হবে না—তুই ত দেড়দিনের বোষ্টম রে বাপু! হ্যাঁ সিনেমাতে কি হল!

—জানো বিড়ি বাঁধা ছেড়ে দিয়েছি। ওসব ছোটলোকের কাজ। টালিগঞ্জে সিনেমার ছবি ওঠে।—সেখানে গেলেই কাজ—আর কাজ মানেই নগদ পাঁচ টাকা। মনে কর আমাকে যা বলতে শিখিয়ে দিল তাই বলেছিলাম, কিম্বা একদল লোক যাচ্ছে তাদের সঙ্গে চীৎকার করতে করতে চলতে হবে চললাম—ব্যস, পাঁচ টাকা! এর মধ্যে চার পাঁচ দিন সে কাজ করেছি মা।

ললিতার মা সন্দিগ্ধভাবে বলে—সত্যি নাকি রে! তা সে টাকা কি হল?

শ্রীপতি সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল—মানে, প্রথম দিকে দালালকে ঘুষ দিতে হয়। নইলে ঢুকতেই দেয় না। দালালী নেয় শালারা তিন টাকা। আর দু'টাকার মধ্যে এদিক-ওদিক বাদ দিয়ে যা ছিল তোমাকে দিয়েছি। এর মধ্যেই ভেতরের মাতব্বর মণিবাবুর কাছে দিদির কথা বলেছি। তিনি দিদিকে একদিন নিয়ে যাবার কথা বলেছেন। উঃ, সিনেমায় নামলে কি খাতির, আর কী নাম! যেমন পয়সা তেমনি মজা। যখন এদিকে মাথা দিয়েছি মা তুমি ভেবো না—দিদিরও রমলির মত গাড়ি হবে বাড়ি হবে—আর হাকিম দারোগারা সব খাতির যা করবে!

ললিতার মা ছেলের কথায় যেন আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় ধরতে পেরেছে এমনই খুশি হয়ে উঠল। সত্যি!... কিন্তু পরক্ষণে মেয়ের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। শ্রীপতির চোখে মুখে যে আশার স্বপ্ন ফুটেছে সেটা যে কত অবাস্তব, মেয়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে ললিতার মা।

শ্রীপতি থামতেই চায় না। মাকে যে এত সহজে বিশ্বাস করানো যাবে না তা সে জানে, তাই প্রলুব্ধ করবার জন্যে বলে চলল—জানো, শহরময় দিদির ছবি সেঁটে দেবে, দেওয়ালের গায়ে। এই ত যাক না আর ক'টা দিন, আমি যে ছবিতে নেমেছি সেখানা দেখতেই পাবে। আর দিদির ত চেহারা আছে! বড় বড় ছবি দেবে—এই যে রমলির ছবি কত দেখতে চাও।

-রম্‌লি রম্‌লি করছিস্, তুই তাকে চিনিস বুঝি? কোন্ বস্তীর মেয়ে সে?

ললিতার মা ছেলেকে পরখ করবার জন্য জিজ্ঞাসা করে।

শ্রীপতি বলল—অবিশ্যি রম্‌লি তার নাম নয়—নাম হচ্ছে রমিতা দেবী। আর সে খুব উঁচু ঘরের মেয়ে! আমি একবার দেখেছি!

—কি বললি, রমিতা! সে আবার কেমনতরো নাম রে! এমনি সব আজকাল হয়েছে নামের ছিরি। ডাক্তার দাদার এক রুগী আছে তার নামও ত এই—খুব সোন্দর। ডাক্তার দাদার সঙ্গে খুব ইয়েও!

বিজ্ঞ ভাবে ঘাড় নেড়ে শ্রীপতি বল্লে—কত দাদার সঙ্গে ওঁর ইয়ে তার ঠিক আছে? কলকাতা শহর মাতিয়ে রেখেছে। আরে এই ত ছাখো উপায় হয়ে গেল।

তারপর ললিতার হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে শ্রীপতি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—দিদি মায় দিয়া, রমিতা দেবীর কাছে একবার ওই ডাক্তার দাদার 'থুরু'তে গেলে তোর আথের জমাট! উঃ, কী কাণ্ড হবে তুই ভাবতে পারিস।

তার মা ধমক দিয়ে উঠল—থাম পাগল ছেলে।

কিন্তু মায়ের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি আর বাধা মানে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নফর চন্দ্র এল শা'নগরের বাসায়। বাড়িওয়ালীর মুখে সারাদিনের কাহিনী শুনে সে একটু চিন্তান্বিত ভাবে বললে—ডাক্তারে কি বলল?

—আমি ত অতশত জানি নে, তোমার ইস্তিরি জানেন বাপু!

ঘরে ঢুকে প্রদীপটা উস্কে দিয়ে নফর ললিতার শিয়রে গিয়ে বসল।

নফরকে ললিতা প্রশ্ন করে, ক্ষীণ ওর কণ্ঠস্বর—কি এক ক্লান্তিকর দুশ্চিন্তায় ও যেন জর্জর: ও বলল—এত দেরী যে?

নফর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—না ত! ঠিক সময়েই এসেছি। ছোট দিনের বেলা কি না, তাই রাত মনে হচ্ছে। হ্যাঁ গো ডাক্তার এসেছিল?

ললিতা আস্তে আস্তে উঠে বসল। নফর বাধা দিতে চেষ্টা করে—আবার নড়াচড়া কেন, বেশ ত শুয়েছিলে!

—আর শুয়ে থাকতে পারছি না। এখান থেকে নিয়ে চলো।

—ও বাবা! তোমার যা মা একখানি! নইলে আজ তোমার এ অবস্থা হয়! কবেই ত বলেছিলাম, চলো পালাই!

ললিতা হেসে উঠল। হাসলে আজও ওর ওই পাণ্ডুর মুখে আশ্চর্য মাধুর্য ফুটে ওঠে। কিন্তু ও বড় দুর্বল। তাই হাসির প্রান্তে অবসাদের ছোঁয়া লেগে থাকে। ললিতা বললে—বিয়ে-করা বৌ নিয়ে পালানো!

—তোমার ত ওই এক কথা!

ললিতা ব্যাকুল ভাবে স্বামীর একটি হাত নিজের মুঠোয় ধরে বলল—না, আর নয়। আজই চলো। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

নফর অবাক হয়ে গেল। সহস্র অনুরোধ অনুনয় করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতেই সে অভ্যস্ত, হঠাৎ এ কী হ'ল!

ললিতা পুনরায় বললে—কি, চুপ করে আছ যে!

—নিয়ে যেতে ত কোনো আপত্তি হচ্ছেনা! কিন্তু বাড়িউলি? তোমার মায়ের ফটিকজল!

—সে ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও। সারাদিন ধ'রে ডাইনীকে বুঝিয়েছি। ও নিমরাজি। আসলে অর্থপিশাচ। তা ছাড়া,—না থাক।

—কি বলই না!

—সে ঠিক হয়ে যাবে। ওকে একটু ভাল করে বলো! কিছু টাকা ধরে দিলেই রাজি হবে ডাইনি।

যে কথাটা নফরের কাছে বলতে গিয়েও ললিতা শেষ পর্যন্ত গোপন করল সেটা আর কিছুই নয় সিনেমা প্রসঙ্গ! শ্রীপতি অবশ্য কদিনই 'ফিলিম'-ফিলিম' করে দিদিকে অনেক কথা বলছে। কিন্তু আজ যখন বিশদভাবে আলোচনাটা হ'ল তখন ললিতার মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। কি জানি কেন, একটা অদৃশ্য আকর্ষণী অনুভব করছে ললিতা ওই দিকে—ওই দিগন্তের রূপোলী মায়া যেন ওকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে চায়! কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভীতিও

সেই সঙ্গে ওকে পেয়ে বসেছে। অনেক ভেবেচিন্তে ললিতার মনে হয়— বাড়িটা আর মায়ের কাছ থেকে দূরে না পালালে ও আর বাঁচতে পারবে না। ওর জীবনে কোনো আশায় ফানুস মনের আকাশে উড়ে বেড়ায়নি। ও চায় শান্ত নিবিড় গৃহকোণ, নিজস্ব নীড়-রচনা! ওর নিজস্ব ছোট পৃথিবীটা মায়া দিয়ে ঘিরে রাখবার সাধ ওর অসহায় সত্তায় লতায়িত হয়ে উঠেছে কৈশোর থেকে, অথচ প্রতিপদে ভাঙনের ধাক্কায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ওর মায়ের বিপরীত গতির ধারামুখে।

নফর উৎসাহিত হয়ে উঠল—বেশ, কবে যাবে বলো!

—কবেটবে নয়, আজই।

—আজই? কিন্তু আমার সঙ্গে ত টাকা নেই, বুড়িকে কি দিই!

—আমার কানের ফুল দুটো ওকে দিয়ে যাবো, আর বলবো পরে টাকা দিয়ে ওটা ফেরৎ নেবো!

—কিন্তু এখনই নড়াচড়া ঠিক হবে কি? আজ সবে ডাক্তারে দেখে গেল।

—তুমি থামো তো দেখি! আমার সব অসুখ সেরে যাবে তোমার কাছে থাকতে পেলেই।

বাড়িওয়ালী ললিতার যাওয়ার কথা বলতেই দন্তবিহীন মুখে অদ্ভুত হাসি হেসে বললে—আমিও ত তাই বলি। তোমার ইস্ত্রি-পরিবার, তুমি নিয়ে যাবে —তাতে আর বলার কি আছে। তবে হ্যাঁ, একটু সাবধানে রেখো। সেবাযত্ন করো! আর ললিতের মতন বৌ পেয়েছ এ যে কতবড় ভাগ্যি! আমি ত অবাক, গোবরে পদ্মফুল, ওই মায়ের এই ছা কি করে হলো তাই ভাবি। তা তুমি নিয়ে যাও সে-ই ভালো—কথায় বলে, বৌকে কাছছাড়া করলে আর তার মর্যাদা থাকে না। একটা কথা বলি শোনো সে নফরবাবু— আর যেন এমন বেমক্কা পোয়াতী না হয়। মা ষষ্ঠীকে বলো, আর যেন তিনি আশীর্বাদ না করেন। ইস, মেয়েটার কি হাল করেছ!

নফরচন্দ্র বললে—আপনি এখনকার মত এই কানের ফুল দুটো রাখুন, পরে টাকা দিয়ে ওটা ফেরত নেবো।

ঈশ্বরের উদ্দেশে হাত তুলে প্রণাম করে বৃদ্ধা বললে—আমরা মানুষ চিনতে

চিরটা বুড়ো হয়ে থেকোনা বাছা! যখন বলেছো পঞ্চাশ টাকা নেবে, তখন কি আর নাই বা নিলে সে টাকা? তা যখন ফুল দুটো নেহাতই রাখতে চাও, রেখে যাও। সুখে থাকো।

পরক্ষণে ললিতার মায়ের কথা মনে পড়তেই হেসে উঠল বুড়ি। আপন মনেই বলতে লাগল—কাল এসে ফটিকজল আমায় নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়বে। তা করুক, আমিও ছ্যাঙ্কেড়িয়ে দেবো শুনিয়ে। অত কিসের! মেয়ের বিয়ে দিয়েছিস তাকে ঘরকন্না করতে দে। তা নয়! তোর দরকার কি, খোদার ওপর খোদকারীর! বুড়ো হয়েছিস এখন মায়ের নাম করো, পরকালের কাজ করো। চোখ বুজে পারের কথা চিন্তে কর—তা নয়!

অল্পক্ষণের মধ্যেই ললিতাকে নিয়ে নফরচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করল। যাবার সময় ললিতা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বৃদ্ধা তার চিবুক স্পর্শ করে বলল—অনন্তেবতী থাকো মা! সোয়ামীর বাড়-বাড়ন্ত হোক। আর কি বলব, আগেকার কালের মতন গোলাভরা ধান থাকলে বলতাম, বছর বছর ছেলে হোক: এখন সে কথা মনেও ঠাঁই দিতে ভরসা হয় না। ভগমানের কাছে মনে মনে বলি, যেন আমার দোরে আর না আসতে হয় তোমাকে। আচ্ছা মা রাত হয়ে যাচ্ছে, এখন তাহ'লে এস! কাল তোমার মা আমার কপালে পিণ্ডি দেবে, তা দিক গে। তোমরা ত সুখে ঘর করো।

শূন্য বাড়িখানা বৃদ্ধার কাছে একান্ত অভ্যস্ত। আর কেউ যদি না থাকে তবে সে নিজের মনেই কল্পিত দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে কথা কয়। কাজেই নির্জনতায় তার কোনো অসুবিধে হয় না। ললিতারা চলে যাবার পরও সে বার কয়েক আপন মনে বলল—তা এতে আমার আপত্তিই বা থাকবে কেন? সোয়ামী-ইস্ত্রীর মাঝখানে বেড়া তুলে দেওয়া মহাপাপ। বেশ করেছি।... আহা, সুখে থাক। সধবা থাকতে থাকতে ড্যাং-ডেঙিয়ে চলে যাক যমের বাড়ি! বেশ মেয়ে।...আচ্ছা, কানের ফুলটার কত ওজন? সোনার ত? মরণ আমার, বুড়ো বয়সে ছোঁড়ার মিষ্টি কথায় ঠকলাম না ত?

আলোর সামনে অলঙ্কারটা এনে পরখ করতে বসল বুড়ি।

অপরাহ্ণের লম্বিত ছায়া দূরের পথকে অপূর্ব মায়ালোকে রূপান্তরিত করেছে—সেই দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রমিতা। শরীর আজ অনেকটা সুস্থ। ইচ্ছে করছে মাঠের দিকে একটু বেরুবার, কিন্তু ঠিক একাএকা যাবার মত উৎসাহ নেই। তাই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে অস্তাকাশের লালরঙের দিকে।···ওই দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায়, একদা পাহাড়ী বনের ওপারে রক্তিম সূর্যাস্ত দেখেছিল ও! কি যেন নাম—বুরুডিপাস! কবে কারা পাথরের বুকে ডিনামাইটের বজ্রাঘাতে ধ্বসিয়ে দিয়েছে পাহাড়কে, সে ব্যথা আজও প্রকৃতি ভুলতে পারে নি। সেই ক্ষতবিক্ষত দেহের ওপর পশ্চিম দিগন্তে নিরন্তর শৃঙ্গের মাথা ডিঙিয়ে যে ক্লান্ত রোদ্ এসে পড়েছিল তারও রং লাল। সে যে ঠিক কেমন লাল তা বলে বোঝান যায় না। নীচের দিকে যে নদীর শীর্ণ ধারা দেখা যায়—অনেক নীচে সেই নদী বয়ে যাচ্ছে, তার বুকে পাহাড়ের ছায়া ঢলে পড়েছে। সেখানে যে সন্ধ্যা নেমেছে তার গভীর রহস্য কালো জলের বুকে লুকানো আছে, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শুধু তার কাজল রংটুকু মাত্র দেখতে পেয়েছিল রমিতা। সেদিনের সেই উচ্ছলা রমিতাকে বিস্মিত করেছিল আশ্চর্য পাহাড়ী কন্যা মেরী। মেরীকে দেখলে বৈশাখের কৃষ্ণচূড়া গাছের কথাই মনে পড়ে। মেরী! তাকে রমিতা ভুলতে পারে নি আজও। বাসাডেরা গ্রামের সাঁওতালী শিল্পী মেরীকে শহরের বদ্ধ হাওয়ায় এনে অনুকূল শুকিয়ে মারল। আজ যদি একবার মেরীর দেখা পেত রমিতা তাহলে জেনে নিত কি যাদু জানত মেরী! যে যাদুমন্ত্রে জীবনের তীব্র তৃষ্ণার্ত মুহূর্তগুলি স্বপ্নের মায়াজাল বুনে কাটিয়ে দিতে পেরেছিল, যে যাদুর স্পর্শ অনুকূলের তরল মনেও গভীর রেখাপাত করে যেতে পেরেছে, সেই কুহকমন্ত্রটি রমিতাকে কি মেরী শিখিয়ে দিতে পারে না! অপরাহ্ণের দীর্ঘ ছায়ায় রমিতা দেখতে পেয়েছে—শুধুই একটা মনগড়া প্রতিশোধের ফানুষ ফুলিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাখা যায় না আর। ফাঁকা ঘরখানার অসীম রিক্ত ব্যর্থতাকে ঘুচিয়ে ফেলার জন্য পূর্ণতর কিছু পাওয়া ওকে পেতেই হবে।···

টেলিফোন বেজে উঠে মনটা বিক্ষিপ্ত করল। রমিতা প্রশ্ন করল—হ্যাঁ, বলুন!

—হ্যালো! পি. কে···নম্বর?

—না! আপনার ভুল হয়েছে।

মিনিট দুই পরে 'ক্রি-রি-রি-রিং' ফোনটা বাজল। সেই কণ্ঠস্বর! রমিতার কণ্ঠে বিরক্তি নেই, আছে ক্লান্তি! ও বললে—আপনার আবার ভুল হয়েছে।

অপর পার থেকে জবাব এল—আমার ভুল নয়। আমি ত ঠিকই চাইছি। অপারেটারের ভুলের জন্য আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। Kindly ছেড়ে দিন।

রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে রমিতা শুনতে পেল, অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর। স্বগতভাবেই লোকটি বলছে—এরা সব করে কি? আধ ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি করে যদি বা কানেকসন দিল—তাও এক মেয়েকে জুটিয়ে দিল!

ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ফুটে উঠল রমিতার।···ভুল আমার নয়, আমি ত ঠিকই চাইছি।···এমনি কত ভুলই হয় ত ভুল নয়—শুধু যোগসূত্রের ভুলে পরিণতি পরিবর্তিত হয়। মিহিরের কথা মনে পড়ল। সেখানেও কি এমনি কোনো যোগসূত্রের ভুল ছিল? মিহিরের কথাটা ভুলতে চেষ্টা করে রমিতা। মনের মধ্যে এঁকে তুলল প্রভঞ্জনের গম্ভীর মূর্তি। অনেক চেষ্টা করেও সেদিনের সন্ধ্যায় দেখা প্রভঞ্জনের নমনীয় ছবিটা মনে আনতে পারল না রমিতা। প্রভঞ্জনের সেই দুর্লভ কান্তমূর্তিটা যেন স্বপ্নের মায়ার মত মুছে গেছে, রয়েছে কেবল রমণীয় স্মৃতিটুকু।

পোস্ট আপিসের পোশাক পরা একটি লোক সাইকেল থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, রমিতার দিকে দৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও যেন সে ওকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পাচ্ছে না। অবশেষে সঙ্কোচ কাটিয়ে লোকটি জিগেস করল—দেখুন!

রমিতারই চিঠি। একটা কাজ পেয়ে রমিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

খামখানা ছিঁড়ে চিঠি বার করতে করতে রমিতা যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে তখন ব্যস্তভাবে পরিবর্তন নীচে নামছিল। মেয়েকে দেখে বলল—তুমি বড়

অবাধ্য হয়ে উঠছ দাদু! ডাক্তারের নিষেধ, তবু দৌড়-ঝাঁপ ছাড়বে না তুমি?

একটু হেসে রমিতা বললে—একটুকুতে কিছু হবে না বাবা!

অনুকূল চিঠি লিখেছে। সুন্দর হাতের লেখা অনুকূলের।

'দিদি! আমার জন্যে কোনো চিন্তা করো না। নিরুপায় হয়েই পালিয়ে এসেছি। তুমি হয়ত আরও চটে গেছো।' যাক সে সব কথা! বেশ আরামে আছি—ধানবাদের কাছাকাছি একটা কয়লার খাদের কাছে, সুন্দর জায়গা এটা। খাদে বিস্তর সাঁওতাল কুলী-কামীন কাজ করে। এদের স্বাস্থ্য সুন্দর। ভয় নেই—স্বাস্থ্যের লোভে এখানে আসি নি। পয়সা উপায়ের ফন্দী নিয়ে বেরিয়েছি। গতকাল সেই উপার্জিত অর্থ থেকে পঁচাত্তর টাকা তোমায় পাঠিয়েছি—কালই হয়ত পাবে সে টাকা।

'আমার এই নতুন জীবনের কথা শুনলে অনেকেরই হিংসে হতে পারে। জলহাওয়া ভালো। খাদের সামনে চটের ওপর লতাপাতা আঁকা তিনখানা পর্দা ঝুলিয়ে কুলীদের ফটো তোলা হচ্ছে। দোকানের নাম দিয়েছি 'দি গ্র্যাণ্ড মেরী ষ্টুডিও', একজনের ছবি পাঁচ সিকে, দু'জনের ছবি একত্রে দুটাকা। সকালে ফটো তুলে গেলে বিকেল বেলা ছবি সরবরাহ করা হয়।

'বললে বিশ্বাস করবে না, বিনামূল্যে অনেক মেয়ের ফটো তুলে দিয়েছি, এবং তারা অন্যভাবে দাম মিটিয়ে দিতে চেয়েছে, তবু নিই নি। আমার সততা দেখে আমি নিজে অবাক হচ্ছি।

'বেশ লাগছে এ জায়গাটা।

'তুমি মনে কর না যে, লোক ঠকানো ব্যবসা করছি। যে পয়সায় ওরা মহুয়ার মদ কিম্বা পচাই খেতো সেই পয়সা এদিকে খরচ করছে। কলকাতার অনেক কেরানির চেয়ে আজকাল এদের অবস্থা ভালো হয়েছে। যেমন খাটতে পারে, তেমনি পয়সা হাতে পড়লে উড়িয়ে দিতেও এরা হর্ষবর্ধন।

'ম্যানেজার, ঠিকাদার, ডাক্তার, সর্দার সকলের সঙ্গেই বেশ আলাপ জমে উঠেছে। সবাই এখানে থাকতে বলছে। তাই মনে করছি শীগগিরই

এখানকার শেকড় কাটবো। পথে ঘাটে আত্মীয় পাতিয়ে পথকে ছোট করবার দুর্বুদ্ধি আর নেই। ইচ্ছে আছে বছরখানেকের মধ্যে তোমার কাছে টাকাটা পাঠিয়ে দেবো। তোমার ছবি বিক্রী করে যা পেয়েছিলাম—মানে যে টাকা দিয়ে মেরীর শেষ অবস্থায় চিকিৎসা করাতে পেরেছিলাম সেই টাকা। তুমি কিছু মনে করো না, মেরীর চিকিৎসার ঋণ রাখতে পারব না—সেই দুঃসময়ে তোমাকে না জানিয়ে তোমার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছিলাম তার পূর্ণ মূল্য দিতে পারি এমন সাধ্যি আমার নেই, তবে ভারবাণীর কাছ থেকে যে টাকাটা পেয়েছিলাম সেটা অন্ততঃ শোধ করবই। ভয় নেই, এর প্রতিটি কপর্দক আমি ফটো বিক্রী ক'রে রোজগার করব। কোলিয়ারী আর কারখানার লোকেরা ছবির কদর বুঝতে শিখছে। এখন কিছুদিন এই অঞ্চলেই থাকব। প্রতি সপ্তাহেই কিছু কিছু টাকা পাঠাবো। বসন্ত কালে জামসেদপুর, সেখান থেকে যাবো ঘাটশীলা—আর একবার বাসাডেরা যেতে হবে। টাকাটা তুমি নিতে আপত্তি ক'র না। কৃতজ্ঞ হবার এটুকু সুযোগ মেরীর সম্মানে আমাকে দিও, মিনতি করে বলছি।'

নিবিষ্ট মনে রমিতা চিঠিখানা দ্বিতীয়বার পড়ল।

সব ছেড়ে অনুকূল চলে গেল! দি গ্র্যাণ্ড মেরী স্টুডিওতে অনুকূল সাঁওতাল কুলীদের ছবি তুলতে চটের উপর রং-করা পর্দা ঝুলিয়ে দোকান খুলে বসেছে। রমিতা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রতি পদে যে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, সেই অনুকূল শুধু স্মৃতিকে এমন ভাবে সম্বল করতে পারে বলে মনে হয় না। হয়ত এ তার শ্মশানবৈরাগ্য। পরক্ষণে রমিতা নিজের সন্দিগ্ধতায় অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। অহেতুক মানুষের সততাকে ছোট করতে চাওয়া ত নিজের মনের সঙ্কীর্ণতা। কে জানে মেরীর যাদুমন্ত্র অন্তরীক্ষ থেকে অনুকূলের ভাগ্যকে আপন পথে পরিচালিত করছে কিনা।

চিঠিখানা টেবলের ওপর রেখে রমিতা জানালার ধারে এসে দাঁড়াতেই ঝি খবর দিল—ডাক্তারবাবু এসেছেন।

বিস্মিতভাবে রমিতা প্রশ্ন করে—কখন এলেন? আমি ত এখানেই আছি।

বলতে বলতে রমিতা লঘু ক্ষিপ্র গতিতে পাশের ঘরে গেল।

রমিতাকে দেখে প্রভঞ্জন চুরুটটা নেভাতে চেষ্টা করে।

রমিতা বলল ওটা কি হচ্ছে? না, চুরুট নিভিয়ে ফেললে ভালো হবে না কিন্তু।

প্রভঞ্জন ভারী গলায় কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল—ধোঁয়া গিলতে কষ্ট হয় সত্যি বলছি আপনার অনুরোধে চুরুট খেতে গেলে অশ্বস্তি হবে।

—এতক্ষণ আসা হয়েছে, খবর পাই নি কেন?

—আমি ত ক্রেপ্স-এর ভারি জুতো পরেই এসেছি। নিঃশব্দে কারও ঘরে ঢুকে পড়া আমার অভ্যেস নয়।

—পরের ঘরে চুপি চুপি হানা দেওয়া যেন আমারই স্বভাব!

—তা জানি না। তবে আবেদন নিবেদন নিজের অবসরমত দেখেন এটা ত ঠিক।

—অর্থাৎ?

রমিতা প্রভঞ্জনের দেশলাই থেকে একটা কাঠি বার করে জ্বালিয়ে সেই কাঠিটার দিকে তাকিয়েই একথা বলল। প্রভঞ্জনের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টির স্পর্শ অনুভব করছে রমিতা। কিন্তু প্রভঞ্জনের মুখের দিকে সরাসরি চাইতে পারছে না। কাঠিটা পুড়তে পুড়তে রমিতার আঙুলের ডগায় আগুনের ঈষৎ উত্তাপ লাগে, শিখাটা ওর নখের কাছে এসে জ্বলতে জ্বলতে শেষে নিভে গেল। ইচ্ছে করে হাত পোড়ানোর জ্বালাটা মন্দ লাগছে না। প্রভঞ্জন আঙুলের আঘাত দিয়ে পোড়া কাঠিটা রমিতার হাত থেকে ফেলে দিল।

এবারে প্রভঞ্জনের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমিতা হেসে উঠল—উঃ আঙুল ত নয় লোহা! টোকা মারলেন নখের ওপর, আর গোটা দেহটা ঝিন্‌ঝিনিয়ে উঠল।

প্রভঞ্জন বলল—আপনাদের ইলেক্‌ট্রিকের লাইন খারাপ হয়ে গেছে নাকি! সব অন্ধকার!

রমিতা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল—আবার আলো কি হবে! এইত আমি ঘর আলো করে বসে আছি।

—কুয়াশার চেয়ে অন্ধকারই ভালো—অন্ধকারকে স্বচ্ছন্দে অন্ধকার বলেই মনে করা যায়, কিন্তু কুয়াশাকে আলো বলে ভুল হয় অনেক ক্ষেত্রে। তাই নয় কি? আপনার কি মনে হয়!

—আমার জীবনকে আপনি 'আলো আড়াল করা' সর্বনাশা কুয়াশা বললেন? আমি কি এতই হাল্কা!

তবুও রমিতার আলো জ্বালবার উদ্যম দেখা গেল না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রমিতা বলে—আপনার তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির মত কথাগুলো ভয়ঙ্কর, কিন্তু চুপ করে থাকাটা মারাত্মক।

প্রভঞ্জন মন্থর ভঙ্গিতে বললে—আজ কদিনই পরমেশ আমাকে ফোন করছে।

—ও, তাই নাকি? পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত বুঝি সে! তা আপনাকে কি জন্যে ফোন?

—আপনার খবর জিগ্যেস করে।

—আমাকে ডাকলেই ত পারে, আপনাকে আবার বিরক্ত করা কেন! মাঝে মাঝে ওর অভিমান যে কেন হয় বুঝি না।

—আপনি যেন আবার এসব কথা বলতে যাবেন না তাকে। তার ধারণ হয়েছে যে, তার এ বাড়িতে আসাটা আপনি ঠিক চান না।

—দেখুন ত কাণ্ড! তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নতুন নয়। সে আসছে না, পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত আছে, আমি এই জানি। এর মধ্যে তাই আর খোঁজ খবর নিই নি। কিন্তু ওর মনে যে এত প্যাঁচ খেলছে তা কে জানতো!

—আমার যা ধারণা সেটা শুনুন আগে।

—যা বলবেন তা আন্দাজ করতে পেরেছি। তবু শোনা যাক।

—না, না, বেচারীকে আর কষ্ট দেওয়া আপনার উচিত নয়। হাত পেতে কাঙালের মত কিছু চাইল না ব'লে, তাকে চিরকাল বঞ্চিত রাখা ব রকমের অবিচার।

—চাওয়া পাওয়ার কথাই ওঠে না। মানুষ পথ দিয়ে চলে, তাই ব' পথ তার বাসা নয়। চলবার জন্যই পথের প্রয়োজন—সেকথা পথও হয়তো

জানে, পথিক তা জানেই। পরমেশও তেমনি পথের বন্ধু, কিন্তু সে আমার জীবনের লক্ষ্য কোনো দিনই নয়।

—কেন নয়, বলতে পারেন ?

—নয় বলেই নয়। আমি কেন আপনি নয়, আকাশ কেন বাতাস নয়—এ সব প্রশ্নের কেউ উত্তর দিতে পারে কি ?

একটু চুপ ক'রে থেকে রমিতা বলল—এমন একটা শান্ত ঝিম-ঝিমে ঘন সন্ধ্যায়, এত কাছাকাছি বসে কি আর কোনো ভালো কথা কইতে পারো না তুমি ?

কার্পেটের উপর প্রভঞ্জনের ভারী পা দুটো জুতোশুদ্ধ থস্ থস্ শব্দ করে থেমে গেল। চুরুটের রাঙা আগুনটা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রচণ্ড টানে।

—আমার ভালো কথা তোমার ভালো কথা হবে না! কারণ আমি তুমি নই।

—আমাকে কি এই ভাবে একা-একাই চলতে হবে ? তোমার কাছে যে অনেক ভরসা চেয়ে এসেছি।

—দেখ রমিতা, আমাকে বাঁধতে চেষ্টা করো না, দুঃখই পাবে। আমার জগতটা কাজের চাপে, লোকের ভিড়ে, শত সমস্যার মিছিল। তা থেকে তোমার জন্যে নির্জন সন্ধ্যাটি ছিনিয়ে এনেছি—এর বেশী আমার সাধ্য নেই কিছু। তোমার আমার পথ এক নয়।

রমিতার নরম করতলের স্পর্শে প্রভঞ্জনের আবেগের উৎস যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

রমিতা বলল—আর কিছু চাই না—

প্রভঞ্জনের গম্ভীর কম্পিত কণ্ঠস্বরে আষাঢ়ের বর্ষণসম্ভারবিষাদের গভীরতা মন্দ্রিত হয়—আমার কিছু বলবার আছে, আগে শোনো।

রমিতার হীরের আংটিটা অন্ধকারে জল্ জল্ করছে—বাঁ হাত দিয়ে কাঁধের পাশের চুলগুলো পেছন দিকে সরিয়ে দেবার সময় চকিতে সেই হীরের দ্যুতি এসে প্রভঞ্জনের ব্যগ্র চাহনিকে উগ্রতর করে ফুটিয়ে তুলল যেন। ও বলল—বলো আজ তুমি আমায় যে—

—আমার জীবনে তুমি এলে সঙ্কটের মত স্মরণীয় হয়ে, তা জানো ?

কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত পার হয়। ওপাশের দেয়াল ঘড়িটায় অনেকগুলো বেজে যাওয়ার সঙ্কেত।

রমিতা বললে—তুমি আমার ভাঙা মনকে প্লাবনের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনবার শক্তি দিয়েছ। কিন্তু আজ সেই থেমে যাওয়া নৌকার ভার তুমি নাও।

আলো নেই—প্রভঞ্জনের মুখের চুরুটের আভাটুকুও ছাই-ঢাকা পড়েছে। প্রভঞ্জনের হাতখানা সরে গেল। রমিতার শিথিল নিঃসঙ্গ-মুষ্টি টেবলের ওপর পড়ে যায়।

প্রভঞ্জনের জীবনের একটা দিক এমনই অন্ধকার—এরাজ্যে ঘনপুঞ্জ অন্ধকার দীর্ঘ যুগের। এখানে কোনো গোপন অভিসারের ইতিহাস দাগ রেখে যায় নি। একদা আকাশে আকাশে যে নীল চোখের চকিত কটাক্ষ পুষ্পসজ্জায় ফুটে উঠেছিল, তার কোনো রেণুরেশ, তার কোনো রঙিন ইশারা, স্মৃতিরেশ যেন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না আজ। তবু—তবু সে ডরোথীর অসম্মান করতে পারবে না। ডরোথীর কাছে কোথায় যেন অপরাধ সঞ্চিত হয়ে উঠছে, নিজের অর্ধচেতন মনের বোবা প্রতিবাদের যন্ত্রণা তার কর্ম-কোলাহলমুখর মুহূর্তগুলিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছে। এ থেকে মুক্তি পেতেই হবে। প্রভঞ্জন আপন সঙ্কল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের উদ্বেলিত অনুভূতি-প্রবণতাকে বিচার করতে চায়।

—ভাখো রমিতা, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, তুমি আমার জড় মনকে সঞ্জীবিত করেছো। আমার সে ঋণ—সে ঋণ আমি শোধ করতে পারব না! তোমার মনের আগুনে বিদ্যুৎ জেগেছে এই আমার রুদ্ধ মনে।

—একথা বলছো কেন ?

আবছায়ার মত রমিতার মূর্তি যেন এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে দিনের আলোর চেয়েও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল—কণ্ঠের আকুতি দিয়ে আদি মানবী সকল বাস্তবকে অতিক্রম করে স্বরূপে মূর্ত হয়ে উঠল।

—তোমার কাছে ধরা দিতে আসি নি—তাতে আমার সংকীর্ণতাই দেখতে পাবে।

—তুমি ছোট কি বড় তা জানতে চাই নে। আমার নিজের মনে তোমার যে-পরিচয় আছে তাই আমার সব। সত্য হয়ে ওঠো এইটুকু আমার পরম কামনা।

তবে বলি শোনো, অনেক ভেবেছি! তোমারও একটা অবলম্বন দরকার। সেই অবলম্বন হিসেবে তুমি পরমেশকে গ্রহণ করো—তার সমবেদনা, তার সহানুভূতি তোমার জীবনকে ছায়ার মত ঘিরে রেখেছে। তা দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু আমার বিশ্বাস পরমেশ তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

—না—না—না!

প্রভঞ্জন অকম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকে—সে তোমাকে ছায়ার মত ঘিরে রেখেছে। তাই তুমি আজ তাকে বাদ দিয়ে অনায়াসেই দূরের রোদটাকে আরামে দেখতে পাও। আমার এ কথা উড়িয়ে দিয়ো না। আমাকেও একজন কয়েকটি মুহূর্তে 'ছায়ামূর্তি অনুচর' করে ঘিরে ছিল—তাকে যত দূর থেকে দেখছি, তত ঘন করে বুঝতে পারছি তার শক্তি, তার মায়া। এতদিন অন্ধভাবে তাকে অনুভব করেছি কিন্তু বুঝতে পারি নি। তুমি আমার এই চেতনা এনে দিলে!

—না, না এভাবে আরও অন্ধকারে ঠেলে দিও না আমায়।

রমিতার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, ব্যাকুলভাবে ওর ডান হাতখানা প্রভঞ্জনের নাগাল পাবার জন্য অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে লাগল। প্রভঞ্জনের কঠিন লোমশ মণিবন্ধ রমিতার উত্তপ্ত স্পর্শের কোনো প্রতিবাদ করতে পারল না!

অনেকক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রভঞ্জন বলল—তবু ভালো ক'রে ভেবে দেখো। পরমেশের ভালোবাসা গভীর।

অন্ধকারে দুজনেই নীরবে বসে থাকে। রমিতা কোনো জবাব দিল না।

চমৎকারিণী দেবী প্রভঞ্জনের খাবার সময় সামনেই বসেছিলেন। অন্যদিন এত রাত্তিরে প্রভঞ্জন বাড়ী ফিরলে তিনি হয়ত একটু অনুযোগ করতেন, আজ কোনো কথাই বললেন নি।

ঘাড় হেঁট করে খেতে খেতে প্রভঞ্জন বেশ বুঝতে পারে যে মায়ের দৃষ্টি তার ওপর ন্যস্ত। একটা কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে দু'চারটে কথা বলে এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটাবার কথাই ভাবছিল সে, এমন সময় মা বললেন—তা, বিয়ে করবে ত করেই ফ্যালো না!

রুটির টুকরো মুখে গুঁজে দিয়ে বিস্মিতভাবে প্রভঞ্জন মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন—আমার জন্যে চক্ষুলজ্জার ত কোনো দরকার দেখি নে! আমায় ত জয়ন্ত নিয়ে যেতেই চায়। এই বুড়োবয়সে বিশ্বনাথের আশ্রয়ই হিন্দুঘরের বিধবাদের শেষ সম্বল, আমারও তা-ই হবে। পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, কি দরকার বাবা! ভাবনা ছিল পার্বতীদের জন্যে, তোমার দয়ায় ত যাহোক তাদের হিল্লে হয়ে গেল। এখন তোমার যা মনের অবস্থা তাতে ও মেয়েটিকে বিয়ে করাই ভালো। পাঁচজনে পাঁচরকম বলে। আর আমিও বেশ বুঝতে পারছি ত!

—কি বুঝছ?

বলছিলাম যে চোখ বুজে লুকিয়ে চলার চেয়ে তাকিয়ে চলো!

—মনে হচ্ছে যেন তুমি রমিতাকে ইঙ্গিত করছ।

—আমার মুখ দিয়ে ওই নামটা উচ্চারণ করতে চাও কেন! আমার দিন ফুরিয়েছে, ছুটি দাও।

—তা বেশ ত,আমি যেদিন জাহাজে উঠব সেদিন তুমিও না হয় কাশী যেয়ো!

—ততদিন আর তর সইবে না। মা অন্নপূর্ণার ডাক শুনতে পাচ্ছি। এমনিতে ত মায়ার বাঁধন কাটতে পারছিলাম না, তাই তিনি কৃপা করে ছেলে-মেয়ে-জামাইদের কীর্তিকলাপের ঘা মেরে ছিঁড়ে দিতে চাচ্ছেন বাঁধনটা। তাঁর কৃপায় চোখ খুলে গিয়েছে।

পাছে মায়ের চোখের কোণ সিক্ত দেখে দুর্বল হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় প্রভঞ্জনও আর মাথা তুলল না। সে বললে—এতই যখন করলে, তখন হাতে করে বিয়েটা দিয়েই যেয়ো। শান্তি পাবে।

চমৎকারিণী উঠে চলে গেলেন।

পরক্ষণে প্রভঞ্জন নিজের এই নিষ্ঠুর রসিকতায় নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে, অর্ধভুক্ত আহার্যগুলির দিকে দৃকপাত না করেই পিঁড়ি ছেড়ে উঠে পড়ল।

হাতমুখ ধোওয়ার সময়ই প্রভঞ্জনের মনটা নরম হয়ে এল। সত্যি এভাবে মাকে আঘাত করা তার সমীচীন হয় নি। অথচ এখন আর চমৎকারিণীর কাছে গিয়ে কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। সে জানে, সামান্য মাত্র ছোঁয়া পেলেই চমৎকারিণীর এই বাহ্যিক কঠিনতা ভেঙে পড়বে কান্নার বন্যায়। সারাদিনের বিশেষ করে সন্ধ্যার ঘাত-প্রতিঘাতে তার মন এত পরিশ্রান্ত যে এখন আর এতটুকু কথা বলা ত দূরের কথা ঘাড়ের ওপর মাথাটা সোজা রাখাই প্রভঞ্জনের পক্ষে শক্ত মনে হচ্ছে। দিনান্তের শেষ প্রণামটা করবার জন্য মায়ের ঘরের সামনে এসে যখন সে দেখল দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখন আর ডাকাডাকি না ক'রে সে নিঃশব্দে ফিরে এসে নিজের বিছানায় আশ্রয় নিল। তারই চোখের সামনে পৃথিবীটা ঘোলাটে ঝাপসা দেখাচ্ছে। একটা বিরাট দ্বন্দ্ব তার মনকে বিকল করে দিচ্ছে কি?

চমৎকারিণী ছেলের নাক-ডাকার শব্দ পেয়ে আস্তে আস্তে যখন খাবার ঘরে ফিরে গিয়ে দেখলেন প্রভঞ্জন কিছুই খায় নি, তখন তাঁর অনুতাপ-পরিতাপের অবধি রইল না। আপন মনে বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন—মা নই, ডাইনী—ডাইনী! উঃ এতদিন ধরে আমি একে স্নেহ বলে গর্ব করেছি! ছি, ছি এই স্নেহ! হিংসের জ্বালায় ছেলেটাকে সুখী হতে দিলাম না?

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় চমৎকারিণী শিউরে উঠলেন। তাঁর মনের মধ্যে থেকে এসব কথা যেন আর কেউ বলছে। একটা উজ্জ্বল শান্ত দৃষ্টির মত আলো তাঁর মনের দিগন্তে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এইভাবে নির্মোহ হয়ে কখনও নিজেকে দেখতে পান নি চমৎকারিণী।…

রমিতা বিছানায় ছটফট করছে। রাত্রে ঘুম না হওয়া তার অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিল এক কালে—কিন্তু ইদানীং ও বেশ আরামেই ঘুমোতো, ঘুমিয়ে আরাম পেতো। আজ প্রভঞ্জন যখন জানিয়ে দিল যে রমিতার কাছে সে ধরা পড়ে গেছে কিন্তু বাঁধা পড়তে পারবে না, তখন থেকেই মনটা কেমন ভারী

হয়ে উঠেছে। একদিকে অসীম সান্ত্বনা—প্রভঞ্জনের মনের গভীরে রমিতাও যে উদ্বেল তরঙ্গ তুলতে পেরেছে, সেটা সামান্য নয়। কিন্তু অন্য কথাটা কম নয়,—সেটা প্রভঞ্জনের সংস্কার। প্রভঞ্জন বৈজ্ঞানিক। সে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে পরমেশকেই রমিতার জীবনের সঙ্গী হিসেবে তেকে নেওয়া উচিত। যুক্তির দিক দিয়ে রমিতা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভঞ্জনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। কিন্তু যুক্তির বাইরে যে মন সক্রিয়, সেখানে প্রভঞ্জনকেও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

নিজেরই মনে রমিতা প্রভঞ্জনকে সামনে দাঁড় করিয়ে তর্ক জুড়ে দিল। তর্ক করতে করতে অবশেষে ক্লান্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তন্দ্রাতুর মনে ও দেখতে পেল, বিহারের অসমতল প্রান্তরে একটি পথিক—অনুকূল। তার ছায়া পড়েছে পিছনে, মানুষটি চলেছে সম্মুখের উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে। অনুকূলের পিঠে 'ডিসপোজাল' থেকে কেনা একটি ঝুলি। ঝুলির ওপর লেখা 'গ্র্যাণ্ড মেরী স্টুডিও'।...মেরী! মেরীর সেই শ্যামল স্বাস্থ্য-মাধুর্যে মুখর যৌবন, চোখের সরল চাহনি। সেই মেরীর জীবনে ও এলিয়াসের স্থান অধিকার করল অনুকূল।...সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাবলেশ-হীন মুখচ্ছবি এসে দাঁড়াল—সে পরমেশ।

রমিতা প্রশ্ন করে—পরমেশ, তুমি? তুমি কেন!

—আমাকে যে ডাকলে তুমি।

রমিতা প্রতিবাদ করল!—না, না, তোমাকে ডাকি নি!

—'ও!' সেই ভাবলেশহীন মুখখানা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

পরক্ষণে রমিতা চীৎকার করে ডাকল—পরমেশ, দাঁড়াও শোনো!

আবার সেই রকম ভাবেই এসে দাঁড়ালো পরমেশ, বলল—কি?

—তুমি আমায় ভালোবাসো?

—কেন?

—জানতে ইচ্ছে করে।

পরমেশ জবাব দিল—জানবার কি আছে?

রমিতা বললে—আমি ঠিক করে ফেলেছি।

পরমেশ বললে—কবে গাড়ি চাপাচ্ছ ?

—না, যাবো না। সুইসাইড্ করব।

তোমার যা প্রাণের মায়া, পারবে না। জীবনকে তুমি বড্ড ভালবাসো। অবিশ্যি আমিও খুবই ভালবাসি নিজেকে, নইলে—!

—নইলে কি ?

—নইলে এত দিন বিয়ে থা করে বেশ আনন্দে থাকা যেতো।

রমিতা উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল—প্রভঞ্জন কিছু বলেছে তোমায় ?

বিস্মিত পরমেশ উত্তর দিল—কই না ত! কি আবার বলবে সে!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রমিতা নিশ্চিন্ত হ'ল।

তারপর বললে—তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো পরমেশ। আমি কিছুই দিতে পারি নি। আজ ইচ্ছে করছে তোমাকে কিছু দিই।

পরমেশ হেসে উঠল। পরক্ষণে স্তব্ধ হয়ে গেল তার হাসি।

পরমেশ বললে—সত্যিই যদি কিছু দিতে চাও, তবে দয়া করে এইটুকু ভরসা দাও, যে কিছু দেবে না তুমি।

—না, সে কি পারি, তুমি আমার দুর্দিনের আকাশে ধ্রুবতারা।

নারীর চিরন্তন জিজ্ঞাসা রমিতাকে কৌতূহলী করে তুলল! ওর চটুল চপলতা নাচিয়ে তুলল ওর মনকে। ও একটা হাত পরমেশের কণ্ঠলগ্ন করে দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলল—আমি তোমায় ভালোবাসি।

ওষ্ঠপ্রান্তে ওর বাঁকা হাসি, দীর্ঘ পক্ষ্মপাতে আবেশের মদিরা—নিজের অভিনয়দক্ষতায় রমিতা নিজেই বিস্মিত হয়।

কিন্তু পরমেশের মুখেচোখে যে বিস্ময়নিবিড় সৌন্দর্য ফুটে উঠল, সে রূপময় বিবশতা জীবনে খুব কমই দেখেছে রমিতা। হ্যাঁ, আবছা মনে পড়ছে যেন, একদিন মিহিরের চোখে-মুখেও এই অভিব্যক্তি দেখেছিল ও।…

প্রচণ্ড একটা শব্দে রমিতা জেগে উঠল। এত গোলমাল কিসের!

পরিবর্তন ডাকছে—খুকী! খুকী! সাড়!

ও সাড়া দিল—কি, কি হ'ল বাবা! এত গোলমাল হচ্ছে কেন ?

—অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ছিস কেন রে খুকী!

আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল রমিতা—সত্যিই খাটের বাজু ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। আর মাথার কাছে টি-পয়ের ওপর যতগুলি ওষুধপত্র ছিল এবং জলের কুঁজো, গ্লাস... পর্যন্ত মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। রমিতা অপ্রতিভভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

পরিবর্তন মেয়ের অপ্রতিভ ভাব দেখে একটু হেসে বলল—তোর ঘরে যেন লড়াই হচ্ছে—রাতদুপুরে কাঁচের শিশি ভাঙার শব্দে চমকে উঠলাম, বলি যাই দেখে আসি কি ব্যাপার!

কুন্ঠিতভাবে রমিতা বলল—তাই ত, কেন এমন হ'ল!

পাছে রমিতা মনে কষ্ট পায় সেজন্য পরিবর্তন বলল—ওঃ, ঘুমের ঘোরে মানুষ কী না করে! যাক, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়। জল দেবো? একটু জল খাবি!

—না, না। বাবা, শোও গিয়ে।

পরিবর্তন চলে গেল—দরজার ওপারে তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ স্পষ্টই রমিতার কানে এসে বাজল।

সে রাত্রে রমিতা আর বালিশে মাথা ঠেকায় নি। বসে বসে বাইরের শূন্য রহস্যের দিকে তাকিয়েই ওর বাকী রাতটুকু কাটল। আস্তে আস্তে ঘন শূন্যতায় একটু একটু ফিকে আলোর আভা জেগে উঠল। ফর্সা হল চারদিক। পরিবর্তনের প্রাতঃকালীন স্তববন্দনার ধ্বনি অখণ্ড স্তব্ধতাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে গম্ভীর তরঙ্গ তুলল।

রমিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রভঞ্জনের সংকল্পে মনে মনে সম্মতি জানাল। রিক্ততারও একটা অদ্ভুত আনন্দানুভূতি আছে—রমিতার মনেও ভোরের মিষ্টি বাতাসের সঙ্গে মিশে তেমনি একটা হাল্কা হাওয়া দিচ্ছে।

শ্রান্ত কণ্ঠে বলল রমিতা—জয় হোক—তোমারই জয়!

ক্লান্তিতে হাত-পা শির শির করছে।

কড়িকাঠের পাশে একটা টিকটিকি জড়সড়ো হয়ে আটকে রয়েছে—সেই দিকে ওর দৃষ্টি আবদ্ধ। মনটা ব্যস্ত প্রভঞ্জনকে নিয়ে। মন বলছে—সত্যি

দেবার মত কিছু নেই আমার। অনেক বেলায় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবু, আমার এই শুকনোপাতা-ছড়ানো মনের পথ দিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ; আমাকে যে আদেশ দিয়ে, তাই আমি বহন করব। এই ব্রতই আমার শেষ সম্বল। পরমেশাকেই আমি আশ্রয় বলে গ্রহণ করব! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

রমিতার চোখের শুকনো পাতায় অশ্রু-পুঞ্জ যেন তুষারের মত জমাট বেঁধে গেছে—নইলে ঝরে পড়ত।

বেলা এগারোটা। ট্যাংরার একটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন বস্তী। বস্তী বললে আগেকার কালে যে শ্রেণীর আবাস এবং বাসিন্দার ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠত এটি সে পর্যায়ের নয়। মার্চেন্ট আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি হরেন বাবু থেকে শুরু ক'রে কারখানার মিস্ত্রী নন্দ দাস পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই বস্তীর কৌলিন্য বজায় রাখে। নকুর এবং ললিতার এককামরা ঘরের ছোট্ট বারান্দার পাশের ঘরখানায় অনিলা'দি, আর তার বিধবা মা থাকেন। অনিলা হাসপাতালে চাকরি নিয়েছে। অনিলার কাকা এবং ছোট ভাই এখনও পাকিস্থানেই রয়েছে। আপাততঃ মেয়েদের স্থানান্তরিত করে তারা নিশ্চিন্ত-ভাবে ভিটেমাটি বজায় রাখছে। আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে আবার মেয়েদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। ইতিমধ্যে অনিলা নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য হাসপাতালে নার্সের চাকরি নিয়েছে, সেই সঙ্গে মিডওয়াইফারীও পড়ছে। অনিলার মামারা হরেনবাবুর দেশের লোক তাই অনেক তদবির ক'রে নামমাত্র একশ' টাকা সেলামী দিয়ে, পনেরো টাকা ভাড়ায় এই ঘরখানি সংগ্রহ করা ওদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সে-ও ত দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। অনিলা এ পাড়ায় এখন সুপরিচিতা। অনিলার সবচেয়ে বড় পরিচয় পরের বিপদে-আপদে অনায়াসে সেবাশুশ্রূষা করে ও।

ওর ঘরের সামনে অনেকগুলি মেয়ে এসে জমেছে। একজন বলল—কতটা হাঁটতে হবে ভাই অনিলা!

অনিলা ঘর থেকে বেরিয়ে তালা লাগিয়ে মায়ের হাতে চাবীটা দিয়ে

বলল—তুমি আর এসবের মধ্যে না গেলেই পারতে মা। একটা হাঙ্গামা হ'লে তখন তোমাকে নিয়েই মুশকিল বাধবে।

অন্যান্য মেয়েরাও সায় দিয়ে বললে—থাক, আপনার গিয়ে কাজ নেই মাসিমা।

অনিলার মা ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—নিজের প্রাণটাই বড় হ'ল? ছেলেটা রইল আর এক দেশে তারপর মেয়েটার যদি বিপদের মুখে পড়ে একটা ভালো মন্দ কিছু হয় তবে আমার বেঁচে থাকার কি কাম বলো মা!

পাশের ঘর থেকে ললিতা বেরিয়ে এল এদের মিলিত কোলাহলের শব্দে। মেয়েদের দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—ও মা, তোমরা দল পাকিয়ে কোথায় যাচ্ছ গো অনিলাদি!

অনিলাকে কথা বলবার ফুরসৎ না দিয়ে একটি কাল্কো শীর্ণ মেয়ে এগিয়ে এসে হাত নেড়ে বললে—একেই বলি পড়শী! নাকে সরষের তেল লাগিয়ে ঘুমোচ্ছিলে?

ললিতার অপ্রতিভ মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে অনিলা বললে—আমাদের হাসপাতালে ধর্মঘট কিনা, তাই এরা সবাই যাচ্ছে।

কে একজন বললে—তোমার অত বড় অসুখের সময় দু'হাতে সেবা করল অনিলাদিরা মায়ে-ঝিয়ে, আর তুমি এত বড় বিপদের খবর রাখো না?

অনিলা বাধা দিল—তুই থাম বকুল, ও বেচারী সাদাসিধে মানুষ, তায় শোকতাপে কাহিল—!

ললিতা বললে—তা তোমরা সবাই সেখানে গিয়ে কি করবে গো?

কালো মেয়েটি হাতের মুঠো পাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বললে—দাবী জানাবো। জানো, হাসপাতালের দেড়শ' নার্সকে ওরা যা মাইনে দেয় তাতে একটা মানুষের একবেলা খেতে কুলোয় না। তারপরও জানোয়ারের মত নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেয়। নাইট ডিউটি করতে হবে সারারাত জেগে, তারপরও ছুটি দেওয়া হয় না। কেন, সেবা করতে হবে ব'লে কি নার্সদের

বাঁচবার অধিকার নেই! কেন, নার্স কি মানুষ নয়? আমরা সেই জন্যে যাচ্ছি, দাবী জানাতে! তেল—কাপড়—রোটি!

—ওরা দেবে? ললিতা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

—দেয় কোন মিঞা, আদায় করে নিতে হবে। তুমিও চলো না!

ললিতা বললে—ওঁকে যে বলা হয় নি ভাই! অবিশ্যি অনিলাদির সঙ্গে গেলে উনি কিছু বলবেন না। আচ্ছা দিদি কারখানার ভোঁ বাজবার আগে ফিরতে পারব তো?

অনিলা বলল মৃদুস্বরে—থাক, ললিতা তুমি না-ই গেলে। বরং কলে জল এলে আমার জলটা তুলে রেখো, কখন ফিরি ঠিক নেই ত।

ললিতা কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল—কিন্তু দিদি আমার যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। চলো যাই—।

শেষ পর্যন্ত ললিতা যেন নিজের গরজেই ওদের সঙ্গে রওনা হ'ল।

এতগুলি মেয়ের এই অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে ওর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তার প্রয়োজনই বা কি! সকলের হাবভাবে ও বুঝেছে যে এক্ষেত্রে দলের বাইরে থাকলে অনিলাদির কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে। অনিলাকে ও ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। সেই অনিলাদির বিপদে দূরদূরান্তরের মেয়েরা এসে জুটেছে আর ললিতা তার পাশের ঘরের মেয়ে, চুপ করে ঘরে বসে থাকবে! হয়ত সেইজন্যই পথে চলবার সময় ললিতা সকলের আগে আগে চলছিল।

এদের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য কি ললিতা ঠিক জানে না, তাই মাঝে মাঝে অনিলাদির দিকে চেয়ে দেখছে—আশপাশের মেয়েদেরও লক্ষ্য করছে ও অনবরত।

হাসপাতালের সামনের দরজা খোলা। লোকজন বিশেষ নেই। বড় বড় বাড়িগুলোর কার্নিশে পায়রারা বসে বসে আরামের গুঞ্জন করছে। লম্বা দেবদারু গাছের স্বল্পপত্র ডালে কাকেদের মজলিস।

এপাশ ওপাশ থেকে কৌতূহলী পথিকের জনতা আর পুলিসের গাড়ি জমে উঠেছে। মেয়েদের তীক্ষ্ণ মিলিত কণ্ঠস্বর প্রবল থেকে প্রবলতর ধ্বনিতে

প্রতিবাদ ঘোষণা করছে। ললিতার বুকের মধ্যে কেমন একটা দাপাদাপি শুরু হয়েছে।

হঠাৎ লোকজন ছুটে পালাতে শুরু করল। বড় রাস্তার মুখে যে গলিগুলো ছিল সেগুলো সহসা বড় নদীর জোয়ারে উপছে পড়া জলে ভরা নালার মত আকণ্ঠ হয়ে উঠল। 'গুম্-গুম্-গুম্ম্, গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষে বাতাস ভারী হ'ল— ভিড় হাল্কা হ'ল এক পলকে।

ললিতা অসহায় ভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখল ওর আশপাশে কেউ নেই। নানাদিকে মেয়েরা সব ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন দমকা ঝড়ো হাওয়া হঠাৎ এসে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে সব কিছু। তার পাশে যে কালো রোগা মেয়েটি হাত ছুঁড়ছিল সে নেই। এমন কি অনিলাদিকেও দেখা যাচ্ছে না। কি করবে ললিতা! ওই যে, ওইখানে অনিলাদি গলির মুখে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে ডাকছে হাত নেড়ে নেড়ে কাদের! ললিতা ছুটে গেল অনিলার কাছে।—কি বলছ অনিলাদি!

ওকে দেখে অনিলা যেন খুব জরুরী কিছু বলবে মনে হ'ল—এই যে ললিতা! শোনো, তুমি এই গলির মধ্যে পালাও—আমি কয়েকজনকে নিয়ে হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে পড়ব! শোনো, মাকে খুঁজে নিয়ে তুমি বাড়ি যেয়ো। মাকে দেখো, আমি যাচ্ছি! যদি না ফিরি তাহলে ভেবো না।

পরক্ষণে অনিলা রাস্তার মাঝখানে চলে গেল। ললিতাও ওর পিছু পিছু চলেছে—অনিলাদি, হাঙ্গামা শুরু হবে বুঝি!

ললিতার মনে হ'ল, এইবারে ওর মত অযোগ্য মেয়ের কাজ করবার সুযোগ বুঝি মিলবে।

অনিলা মুখ ফিরিয়ে হুকুমের সুরে বলল—ললিতা পালাও! ছেলেমানুষী ক'র না। পালাও—

ললিতার মনের মধ্যে কি যেন একটা উত্তেজনা লাফিয়ে উঠেছে—অনিলার কথার কোনো জবাব দিল না ও, কিন্তু পালিয়েও গেল না। অনিলাদি ললিতাকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে চলেছে।

আবার আওয়াজ হ'ল। কয়েকটি মেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। গুলী!

গুলী চলছে! কে যেন বললে; কাঁদুনে গ্যাস! ললিতা বুঝতে পারছে না, এত শব্দ কিসের।...সে তাকিয়ে দেখল কালো রঙের একখানা মস্তবড় গাড়ি। পরমুহূর্তে ওর মনে হ'ল মাথার ওপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লেগেছে। চোখের সামনে পৃথিবী দুলে উঠল। কেমন একটা ঘোলাটে অন্ধকার। ওর হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি নেই। অনিলাদির কথা মনে পড়ছে। কোথায় অনিলাদি! সামনে অন্ধকার। আর কিছু নেই। অস্পষ্ট একটা কোলাহলের ধ্বনি কানে এসে বাজছে! সেটুকুও স্তিমিত হয়ে আসে। শুধু নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে যেন ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকছে! মা—মাগো!

অস্ফুটস্বরে ললিতা বলে উঠল—পাঁচটার ভোঁ বেজে গেল?

পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে বিছানার উপর উঠে বসল ললিতা। উঃ সর্বাঙ্গে কী দুঃসহ যন্ত্রণা!

শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে কে বলল—অমন চমকে উঠলে কেন ভাই—শুয়ে থাকো।

ললিতা বিস্মিত ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল—সুন্দর সাজানো একটি ঘর, ফর্সা দেওয়াল, আর আশ্চর্য নরম বিছানা। ওর বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টির সামনে ছবিতে আঁকা নিখুঁত সুন্দরীর মত একটি মেয়ে। কোথা থেকে এল! ললিতার দুর্বল মস্তিষ্ক এতখানি বিস্ময়ের ধাক্কা সইতে পারল না।

কিছুক্ষণ পরে আবার যখন ও চোখ মেলে তাকাল তখনও সেই অপরিচিতা রমণীটিকে দেখে আস্তে আস্তে বলল—আপনি কে?

—এখন একটু ভালো মনে হচ্ছে ভাই!

পুনরায় প্রশ্ন করল ললিতা—এটা কি, হাসপাতাল বুঝি!

ললিতার স্মরণ পথে একটু একটু ক'রে ছায়ার মত জেগে উঠেছে—অনিলাদি...সেই অনাবশ্যক হাতে ঘুসি পাকিয়ে চীৎকার করছিল যে মেয়েটা তার চেহারা...অনিলাদি'র মা, কালো গাড়ি...! আবার সব ঝাপসা হয়ে গেল।

এক একটা চেতনার ঢেউ আসে আবার কয়েক সেকেণ্ড পরে ঝিমিয়ে পড়ে ললিতা।

আহত ললিতাকে গাড়ি থেকে নামিয়েই পরমেশকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল রমিতা।

পরমেশ দেখে শুনে বললে—তা তুমিই বা এত হাঙ্গামা পোয়াতে গেলে কেন? পুলিসের গাড়ি, এ্যাম্বুলেন্স, কেউ না কেউ উঠিয়ে নিয়ে যেতোই। আজ বাদে কাল আমার পরীক্ষা, এখন কি না এই উড়ো ইয়ে—।

রমিতা ব্যস্তভাবে জবাব দিল—না পারো বলে দাও, কলকাতায় ডাক্তারের অভাব নেই।

—চটে গেলে ত! আরে ডাক্তারের যে অভাব নেই তার প্রমাণ ত স্বয়ং আমিই—অভাব থাকলে ত দায়ে পড়ে আমায় পাশ করিয়ে ওরা দল বাড়াবার চেষ্টাই করত। তা নয়, আমি ভাবছি একে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা।

—দরকার নেই।

—তা ছাড়া হাসপাতালের নার্সেরা সব স্ট্রাইক করেছে, এখন ত ভর্তি করাও শক্ত। এটিকে জোটালে কোত্থেকে?

—বাড়িতে বসে বসে ভালো লাগছিলো না। তাই বেরিয়েছিলাম। তা বেশি দূর যেতে হ'ল না, ওই তোমাদের হাসপাতালের কাছাকাছি গিয়েই কাঁদুনে গ্যাসের গন্ধ পেলাম। তা করতে করতে একটি মজবুত গোছের মেয়ে আমার গাড়ির ফুটবোর্ডে চড়াও হয়ে বললে,—একটি মেয়েকে উঠিয়ে নিন আপনার গাড়িতে। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। এই মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরেই, তোমার কথা মনে পড়ল।

—প্রয়োজন ছাড়া যে তুমি আমায় ডাকতে নারাজ তা বেশ বুঝি। যাই হোক, তুমি কিন্তু একটি বিপ্লবী মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছো। হাসপাতালের সামনে আজ খুব হাঙ্গামা হয়েছে—এ মেয়েটি সেই দলেই ছিল, নইলে জখম হ'ল কি করে?

—বিপ্লবী মেয়ে? চেহারা দেখে ত মনে হচ্ছে না। খুব শান্ত।

—ওই রকমই মনে হয় বটে!

—তর্কের জন্যে তোমায় ডাকা হয় নি—কাজ করো।

পরমেশ অসহায়ভাবে একবার রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাণ্ডেজের

কাজে লেগে গেল। ড্রেস করতে করতে বললে সে—দেখে মনে হচ্ছে বোমার টুকরো ছিট্‌কে লেগেছে। আঘাতটা শারীরিকের চেয়ে মানসিক বেশি—আওয়াজে ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল। তেমন কিছু নয়।

রমিতা পাশে দাঁড়িয়ে পরমেশের কাজ দেখছিল। দরকারের সময় ললিতার অচেতন দেহ উঁচু ক'রে তুলে ধরছিল রমিতা। অভ্যাস না থাকলেও রমিতা বেশ পটুত্ব সহকারেই পরমেশকে সাহায্য করতে লাগল। কথা বলবার মতো মনের অবস্থা ওর নয়। ব্যাণ্ডেজ সারা হয়ে গেলে পরমেশ বলল—জ্ঞান হ'লে অ্যাইনামপ্যালিসিয়া আর দুধ দিও। উঠতে দেবে না, বুঝলে?

ঘাড় নেড়ে রমিতা নীরবে সায় দিল।

কিছুক্ষণ পরে চা খেতে খেতে পরমেশ প্রশ্ন করল—ডাক্তারের কোনো চিঠিপত্র পেয়েছো?

ইদানীং সে 'ডাক্তার' বলতে প্রভঞ্জনকেই বোঝায়।

রমিতা পিরিচের চা-টুকুতে বাঁ-হাতের অনামিকাটি ডুবিয়ে আঁক কাটছিল, বললে—না, তিনি চিঠিপত্র দেবার সময় কখন পাবেন? তা ছাড়া তুমি তো জানো—!

পরমেশ নিশ্চিন্ত মনে হাণ্ট্‌লি পামারের 'গোল্ডেন পাফ'-বিস্কুটে খানিকটা মাখন মাখিয়ে নিতে নিতে বললে—না, আমি ত কিছু জানি নে।

রমিতা বলল—আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উনি একটা ছক কেটে দিয়ে গেছেন!

পরমেশ পরিহাসসুলভ কণ্ঠে প্রশ্ন করে—কি, জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী নাকি?

রমিতার গাম্ভীর্য অবিচলিত। ও বললে—যা খুশি তাই বলতে পারো, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা হাল্কা নয়। যে মানুষকে আমি জীবনের সব কিছুর উর্ধ্বে বসিয়েছি তাকে নিয়ে তামাসা করতে পারি না। আর কেউ করলে তাও সহ্য করা শক্ত।

—কিন্তু সান্ত্বনা, মানুষকে তুমি মানুষ বলে স্বীকার করো তো?

—অবশ্যই করি।

—তাহ'লে ডাক্তারকে বিলেত থেকে ফিরতে দাও। তারপর তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে—।

—পরমেশ তুমি বড্ড ছেলেমানুষ রয়ে গেছো! তাঁর দেশে ফেরা-না-ফেরা নিয়ে আমার বর্তমান-ভবিষ্যৎ কি চুপ ক'রে থাকতে পারে? জীবনটা সময়ের চাবুক খেয়ে চলছে সব সময়ের জন্য।

—তবে যা ভালো বোঝো করো। তোমার ওই ছকের মধ্যে আমার স্থান নেই, সে আলোচনায় আমাকে জড়াও কেন?

—প্রয়োজন আছে।

—অর্থাৎ?

—বলি, বলি ক'রে এতদিন সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

—সঙ্কোচ? কার কাছে—

পরমেশ রীতিমত বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল।

রমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির মৃদু স্ফুরণ, ওর জাফ্‌রান ফুলের পাপড়ির মত পাতলা ঠোঁটকে কাঁপিয়ে দিল। রমিতা বললে—সে কথাটা জানতে চেয়ো না।

পরমেশ রমিতার চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল—কই তুমি চা খেলে না?

—না, ঠাণ্ডা কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পরমুহূর্তে রমিতা জিজ্ঞাসা করল—পরমেশ, আমাকে বিয়ে করবে তুমি?

চম্‌কে উঠল পরমেশ, কিন্তু রমিতার কথার জবাব দেবার সময় অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—তুমি কি সে রকম কোনো প্রয়োজন বোধ করছ?

—না, উনি সেই রকম ছকই—

—ও, তাহ'লে ওঁর অভিপ্রায়ে তোমার এই দাক্ষিণ্য!

—না, আমিও অনেক ভেবে দেখেছি! এ ছাড়া বোধহয় অন্য পথ নেই।

পরমেশ রমিতার চায়ের পেয়ালাটা করতলগত ক'রে জবাব দিল—আগে তাঁকে দেশে ফিরতে দাও। যদি উনি ডরোথীকে শাড়ি পরিয়ে এনে হাজির করেন, তখন বিয়ের কথা তোমাকে—।

রমিতার মাথার মধ্যেটা বিদ্যুতের ধাক্কায় অবশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে

নিজেকে সামলে নিয়ে ও বললে—কিন্তু পরমেশ, ডাক্তারের সম্বন্ধে তোমার এই রকম কঠিন কথা আমি বরদাস্ত করতে রাজি নই। তিনি জীবনকে কর্মের পথে চালিত করেছেন। তাঁর মনে আমারও স্থান আছে, ডরোথীরও আশ্রয় আছে—কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে কর্মের আবেদন।

—আমার মন অন্য কথা বলছে। বড় সন্দেহবাদী! আমি ভাবছি,—রমিতা, না ডরোথী, কাকে ও বেশী আপনার ক'রে পেতে চায়? একদিকে প্রথম-প্রেমের মর্যাদা, আর একদিকে তার নূতন ক'রে ফিরে পাওয়া বাসন্তী হাওয়ার সান্ত্বনা!···দোটানায় প'ড়ে ডাক্তারের মত আদর্শবাদী মানুষ কি করে, দেখবার বাসনা আমাকে পেয়ে বসেছে।

রমিতা বললে—তুমি কি বলতে চাও?

—আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওখানে গিয়ে ডরোথীর সঙ্গে যখন দেখা হবে,—কিম্বা এতদিনে নিশ্চয় হয়েছে, তখন ওর মন নরম হয়ে উঠবে বা এত দিনে উঠেছে।

—খুব ভালো কথা!

—না, অতটা সহজ ভালো নয়। কোনো মানুষই একজনের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে বিসর্জন দিতে রাজী থাকে না। অর্থাৎ কি না, ওখানে গিয়ে ডরোথীর কাছে বসে তোমার কথা মনে পড়বে।···তারপর ডিগ্রি পকেটে ক'রে হয়ত সে একলাই দেশে যদি ফিরে, যদি ছাখে তুমি তারই ছকক্যাটা পথে বিয়ে-থা ক'রে বসে আছো তখন সে একটুও খুশি হবে না। তুমিও তখন নিজের ভুল বুঝতে পারবে। এবারে একটু কল্পনা করো, আমি বেচারী তখন কি বেকায়দায় পড়ে যাবো।·· তোমার আর কি, দুনম্বর বিয়ে নাকচ ক'রে তিন নম্বর করবে। আর আমি?

রমিতা বসে থাকতে পারল না। উঠে যাবার সময় বললে অস্ফুট স্বরে —জীবনে সিরিয়াস হ'তে পারলে না পরমেশ!

পরমেশ সে কথার জবাব দিল না। সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং তৈরী করতে সে ব্যস্ত।

রমিতা নিজের ঘরেই ললিতাকে রেখেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে যে চেয়ারে

পরমেশ বসে ললিতার মাথায় ব্যাণ্ডেজ ক'রেছিল সেই চেয়ারে বসেই রমিতা দেখছিল অচেতন মেয়েটিকে। মেয়েটির সীমন্তের সিঁদুর অম্লান—সেই দিকেই রমিতার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এক সময়ে পরমেশ ঘরে এসে বলল—আমি যাবো ?

—যদি বোঝো আর দরকার হবে না, তাহলে যাও।

—দরকার বুঝলেই ফোন ক'রো! মনে ত হচ্ছে তেমন জরুরী কোনো প্রয়োজন হবে না।

রমিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—চলো ওঘরে।

এ ঘরে এসে পরমেশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রমিতা বললে—পরমেশ, অনেক ক'রে ভেবে যে কথাটা বললাম সেটা মোটেই হাল্কা নয়। একটু চিন্তা করে দেখো।

—কিন্তু সান্ত্বনা খেলার দিন তোমার আর নেই, আমারও তথৈবচ!

—তার মানে ?

—জীবনটাকে ভাড়াটে ট্যাক্সির মত অপরের নির্দেশে যেদিক-সেদিক চালাতে যেয়ো না। তোমার নিজস্ব চিন্তাকে স্বীকার করে নাও।

—একবার নিজস্ব চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে অনেক দিন বাজে-খরচ করেছি। জীবন-ত আর সাগরের মত অতল, অসীম নয়—আয়ুর পরিমিতি আছে, যৌবনের আয়ু আরও ছোট, তাই জীবনকে একটু গুছিয়ে পাওয়ার কামনা যদি করি ত ভুল কি থাকতে পারে তাতে ?

—কে বললে বাজে খরচ! ওটারও দরকার ছিল। নিজেকে আবিষ্কার করার সাধনাই ত জীবনের একমাত্র সার্থকতা! আমি গুরুবাদী নই—

—জীবন ত-একটা গবেষণার তত্ত্ব নয় পরমেশ। এতদিন যা করেছি তা চুকে গেছে, আজ আর ওসবে রস পাই নে। ওর মধ্যে ত মুখোশটাই সব—মুখও নেই, শ্রী-ত নেই-ই!—খ্যাতির নেশা আছে, যশের মাদকতায় মন দুলে ওঠে, রূপোর ঝনাৎ শব্দও কানে খারাপ লাগে না—কিন্তু এসব কিছুই যেন আমার নয়। চিত্রাঙ্গদার বেদনা অর্জুনের প্রেমসুধার আস্বাদে গুমরে উঠত—

আমারি মধ্যেও সেই ব্যথা কেঁদে ফেরে। এ বেদনা ব্যক্তিত্বের বেদনা, মন দিতে চাওয়ার আকুলতা, পরমেশ। অথচ আমাকে ত কেউ দেখতে পায় না, চায়ও না—এরা রূপের কাঙাল! এখানে রূপাতীত 'আমি'র আশ্রয় নেই। একদিন যে যৌবনের অস্ত্র নিয়ে গর্বিতা ছিলাম আজ সেই অস্ত্রের আঘাত যেন আমাকেই সবচেয়ে বেশি বাজছে।

—খুব ধারালো তলোয়ারও বহু ব্যবহারে একদিন ভোঁতা হয়ে যায়, সেই ভয় না কি?

—না, সে সময় এখনও আসে নি।

এ কথায় পরমেশ স-রবে হেসে উঠল।

রমিতা উৎকর্ণ হয়ে ফিরে তাকাল—মেয়েটি যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছে।

ওরা দু'জনে পুনরায় রোগিণীর কাছে ফিরে গেল।

ললিতা তিন-চার দিনেই অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠল। ইতিমধ্যে নফরকে খবর দিয়েছিল পরমেশ। নফরও রোজ দেখে যাচ্ছে ললিতাকে।

আজ ললিতা ঝোঁক ধরে বসল—দিদিমণির কষ্ট হচ্ছে, আর আমিও বেশ ভালোই আছি ত—

রমিতা কমলালেবুর রস করতে করতে বললে—সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না। আগে ভালো হয়ে ওঠো, তারপর না হয় আমাকে যত্ন-আত্তি ক'রে শোধ দিয়ে বাড়ী ফিরো।

হাসির রেখায় ললিতার পাংশু মুখখানা সজীব দেখাচ্ছে, ও বললে—আমি কি আপনার মত লেখাপড়া জানি যে, ভালোভাবে সেবা করতে পারব? আমি যে অজ মুখ্যু! আপনার হাতের সেবা নিতে কেমন লজ্জা করে।

—তাই চলে যেতে চাচ্ছ?

—না, তা নয়, কাল রবিবার ওর কারখানা ছুটি, যদি কাল আমার না-যাওয়া হয় আবার সাত দিন পরে!

বলতে বলতে রমিতার মুখের পানে তাকিয়ে ললিতার কি মনে হ'ল, ও বললে—না, আপনার কষ্ট যা হবে তা ত হবেই! কিন্তু ওকে সেই সাত-

সকালে হাত পুড়িয়ে খেয়ে যেতে হচ্ছে। অনিলাদি থাকলেও অতটা ভাবনা ছিল না, অনিলাদিকে ত ওরা হাজতে রেখেছে,—আবার বিপদের উপর বিপদ, সেদিনের সেই হাঙ্গামার পর থেকেই অনিলাদির মায়ের জ্বর হ'য়েছে। এই সব ভেবেই আরও আমার এখানে থাকতে মন সরছে না।

রমিতা সব খবরই নফরের মারফতে শুনেছে। দুদিন আগেও এদের কাউকেই ও চিনত না, আজ হঠাৎ সেই নফর, ললিতা, অনিলাদি, তার মা, এদের প্রত্যেককেই যেন অনেক কালের পরিচিত বলে মনে হচ্ছে ওর। এদের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার সঙ্গে রমিতার আবেষ্টনীর বিশেষ কোনোই যোগাযোগ থাকবার কথা নয়, তবু এই মুহূর্তে এই অসম্ভবটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রমিতাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে ললিতার মনে একটু ভরসা হ'ল, ও বলল—তা হ'লে আজ বিকেলে ওকে বলাইবনত নিয়ে যাওয়ার কথা!

হঠাৎ রমিতা ঘাড় নেড়ে ঘোরতর অসম্মতি জানাল—না, তোমার ওই কোমর আর তলপেটের যন্ত্রণা যতদিন না কমছে ততদিন আমি যেতে বলতে পারি না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ললিতা পাশ ফিরল।

নফরচন্দ্র এই ক'দিনেই রমিতার কথা বেদবাক্যের মত মেনে চলেছে। ললিতা তা বুঝতে পেরেছে। অবশ্য ওর বিশ্বাস রমিতার কথার অবাধ্য হওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—কী যেন একটা যাদু জানে এই অপরূপ রূপসী মেয়েটি।

রমিতা বললে—রাগ ক'র না ললিতা! তোমার মাথার ঘা শুকিয়ে যাবে চট ক'রে, কিন্তু এই কোমরের সাংঘাতিক যন্ত্রণা, তার ফল কি হবে বলা খুবই কঠিন। মেয়েদের এই অবস্থায় আঘাত লাগলে জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। তুমি ছেলেমানুষ এ সবের কি বুঝবে!

মনে মনে হাসলো ললিতা, নিজের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা মুখে কিছু বলল না।…একটি দিনের কয়েক মুহূর্তের হঠকারিতায় আবার ওর মাতৃত্বের

স্বপ্ন বুঝি বা স্বপ্নেই অবসিত হয়ে যাবে। প্রথমবারের ধাক্কা ভালো ক'রে সামলে উঠতে না উঠতে, নূতন ক'রে দ্বিতীয়বার মাতৃত্বের পথে আবার আকস্মিক এই দুর্ঘটনা যেন ওর জীবনকে বিস্বাদ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, সেবারও এইরকম যন্ত্রণাই হ'ত! তীব্র তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত একটা কিছু তলপেটের মধ্যে প্রচণ্ড তাণ্ডবে ছুটে বেড়াচ্ছে—উঃ—উঃ!

রমিতা চেয়ারে বসে ভাবছে। কত ছোট জীবনের আবেষ্টনী এই ললিতার কিন্তু তবু কেমন ভরপুর ওর মন। যেন কোনো অভাবের উৎপীড়ন ললিতাকে স্পর্শই করে নি—ললিতার এই অসহায় পরম নির্ভরশীল ভাবটুকু ভারী ভালো লাগে।

অনেকক্ষণ পরে রমিতা নিজের মনেই মাথা নেড়ে বললে—আর হয় না।

সেদিন এয়ার-মেলে প্রভঞ্জনের চিঠি এলো। অল্প কথায় গুছিয়ে অনেক কিছুই লিখেছে প্রভঞ্জন। প্রথমেই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ। —এখানে এসেই এতরকম কাজের মধ্যে পড়ে গেলাম যে অবশ্যপালনীয় অনেক কটি কাজের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাই নি। ডরোথীর কাছটিতেও মাত্র এই পরশুদিন গিয়েছিলাম। এখানে খুব ভালো লাগছে। এদেশের চিকিৎসা থেকে সত্যিই শিখবার অনেক কিছু আছে। প্রত্যেকটি রোগীকে যত্নসহকারে পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়। মানুষকে যথার্থ মানুষের মর্যাদা যারা দিতে পারে চিকিৎসার অধিকার তাদেরই আছে, সেকথাটা নতুন করে বুঝতে শিখলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, ইচ্ছে করছে এই স্টেথিস্টিক ক্লিনিকের কাজের ছাঁচটা নিয়ে গিয়ে আমাদের দেশে বসিয়ে দিই। শুধু চিকিৎসাই নয়—সেবা-শুশ্রূষার দিক দিয়েও এখানকার রোগীরা ভাগ্যবান। এ দেশের লোকেরা হাসপাতালে ভর্তি হতে পারলে খুশি হয় কেন তা এখন ভালোভাবেই বুঝতে পারছি।

ডরোথীর ছোট চিকিৎসাকেন্দ্রটি চিত্তাকর্ষক। ওকে অনেকদিন পরে দেখলাম, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যেন পুরনো সেই ছাত্রীটি। এখনও তেমনি

ভীরু এবং নিষ্ঠাপরায়ণা। তবে, কোথায় যেন সুরের সায়া পেলাম না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওর কৌতূহলের শেষ নেই, তবু সেটা যেন বৈদেশিকতাপূর্ণ। মহাত্মাজীর কথা অনেকবার বলল ও। বলতে বলতে চোখ জলে ভরে গেল— 'The only man after Tagore'. ও বললে, 'ভারতবর্ষে এখন আর কে রইলেন?' জহরলাল, That dreamer! শেষে বললে 'অবিশ্যি গান্ধীজী আর বেশিদিন বেঁচে থাকলেই বা কি হ'ত! ওঁর কথা কে-ই বা মেনে চলছিল বরং অসুখে ভুগে মরার চেয়ে অনেক বেশি Dramatic end!' আমাকে ও খুবই আদরযত্ন করেছে। তবু মনে হচ্ছে যে-সমুদ্রটা পেরিয়ে এসেছি সেটা মানসিক দিক দিয়ে পার হওয়া যায় না—দুটি মনের মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান যে এত দুস্তর সেকথাটা সমুদ্রপারের বিশেষ জনকে না জানিয়ে পারছি না···দোষটা হয়ত আমারই মনের। ভারতবর্ষকে এখান থেকে বড়বেশি অনুভব করছি।

সে যাক, নিতান্ত আমার মনের ঢেউ-ওঠাপড়ার খবর ছাড়া ত পৃথিবীতে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ আছে।···এবার ফিরে গিয়ে মনের মত একটি হাসপাতাল গড়ব। আজ যতটা জোর ক'রে বলছি, বাস্তবে অতটা জোরালো কিছু না-ও ঘটতে পারে। তবু চেষ্টা করব। একটা কিছু দিয়ে জীবনের বাঁচাটা সার্থক না করলেই চলবে না। পরমেশের এবার পাশ করা চাই। বলো, তাকেও দরকার আমার।

পরমেশ আসতেই রমিতা প্রভঞ্জনের চিঠির কথা জানাল। একা একা চিঠিখানা নিয়ে নিজের মনেই তোলপাড় করেছে সারাটা দিন। পরমেশকে হাতের কাছে পেয়ে রমিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনের কথা সব সময় মনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকার জন্য নয়। মুক্তির আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায় এমন মনের কথাই কি কম!

পরমেশ সব শুনে বললে—কি ললিতা বোনটি, তোমার কি মত!

যদিচ ললিতা পাশের ঘরে শুয়েছিল, অকস্মাৎ পরমেশের এই দিলখোলা কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হয়ে উঠে এল।

ললিতাকে উঠে আসতে দেখে রমিতা ব্যস্তভাবে বলল—এ কী, তুমি উঠে

এলে ? না কাজটা ভালো করো নি ললিতা। চলো শোবে চলো। তোমার না ওঠা-হাঁটা একদম বারণ !

পরমেশ বাধা দিয়ে বলল—আহা ওকে আর বিছানার সঙ্গে অমন সেঁটে রেখো না, বেচারী ! এস ললিতা।

রমিতা ধমক দিল—ছেলেমানুষী রাখো ! ওই জন্তেই বুঝি তোমায় পাশ করায় না। চলো ললিতা শোবে চলো।

পরমেশ স্খলিতকণ্ঠে বললে—অন্ধ নাচার বাবা ! আচ্ছা, দেখে নিয়ো, এবারে আমি আর ধপাস করে পড়ে থাকব না, নির্ঘাৎ পাশ করবই। প্রভঞ্জন সরকারের সাকরেদীর লোভ সোজা নয়।

অগত্যা রমিতার কাঁধে ভর দিয়ে ললিতাকে বিছানায় গিয়ে শুতে হ'ল।

পরমেশও ঘরে এসে বসল।

রমিতার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা এতই স্পষ্ট যে পরমেশ তা নিয়ে তামাসা করতে ভরসা পেল না। সে চুপ ক'রে চেয়ারে বসে দেওয়ালের এক কোণে আশ্রিত একটি টিকটিকির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাববার চেষ্টা করছিল বোধ হয়।

রমিতা বিছানার একপাশে বসে বলল—পরমেশ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। সেটা শুনলে তুমি হেসে উড়িয়েই দেবে জানি।

দেওয়ালের দিকে আগের মতই তাকিয়ে রইল পরমেশ, তবে তার জবাব এল—আমার হাসিতে তোমার কথার উড়তে ভারী গরজ ! এতটুকু নড়চড়ই হবে না, তোমার কথা যে ভারী দামী !

—দয়া ক'রে ত্ব'মিনিটের জন্তে সিরিয়াস হও।

সামনে ঘুরে বসে বলল পরমেশ—বেশ, বলো।

—না, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হও না। তবু আজ একথা একমাত্র তোমাকেই বলতে পারি।

—বেশ ত বলো। তবে আর বেশী বলো না, দেখছ ত বক্তৃতার আগেই আত্মরক্ষা করলে। অনেক দুঃখেই মেয়েদের নাম অবলা রেখেছিল।

—আবার ?

—না, স্রেফ কিছু না ব'লে চোখ রাঙিয়েই অবলারা অমিত বলের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

—আচ্ছা তাহ'লে তুমি এইসবই করো, আমার কাজ আছে, চলি!

—পাগল হয়েছো। আজও তুমি আমার মুখের কথা শুনে মনের হিসেব কষতে চাও। জানো তো চিরকাল এই সদর-অন্দর অভ্যেসের জন্যে আমার নাকালের শেষ নেই!

রমিতা বল্‌লে—আমি ভাবছিলাম, ডাক্তার সরকারের হাসপাতালে একটা নার্স হতে গেলে তার আগে কি কি করতে হবে!

পরমেশ বিস্মিত হ'ল—আগে ডাক্তারের হাসপাতালই হোক!

—হাসপাতাল হবেই। ততদিনে যদি খানিকটা শিখে নিতে পারি তাহ'লে কাজের অনেক সুবিধে হবে।

—অবিশ্যি ডাক্তার এমন একটা মানুষ যার পক্ষে মন্ত্রের সাধন সত্যিই সম্ভব। সেদিক দিয়ে তুমি ঠিকই বলেছো। তবে আমার মনে হয় তোমার ওসব দিকে না যাওয়াই ভালো!

—কেন ?

—কোনো দিন অভ্যেস নেই। তা ছাড়া—

—অভিনয়ের অভ্যেস ছিল কি।

—দুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা রাজ্য।

—হোক না, একটা পৃথিবীরই মধ্যে ত দুটো রাজ্য—পৃথিবীর বাইরে ত নয়।

—দ্যাখো, খামখেয়ালেরও একটা হিসেব-হদিস আছে।

—একে তুমি খামখেয়াল বললে!

—কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে আমি বাধ্য নার্স হওয়ার সখ তোমার দু'দিনে ঘুচে যাবে।

—আমার পক্ষেও তোমার এই সত্যের খাতিরটা উল্টে দেওয়া আরও ঢের বেশি সোজা। আমারও জীবনে কিছুটা সত্য আছে!

—তা না হয় মেনে নিচ্ছি। নার্সিং শেখাটা হয়ত তোমার পক্ষে কঠিন কিছু নয়, কিন্তু ব্রত ব'লে সারা জীবন বয়ে বেড়ানো কি সম্ভব!

—কেন নয়?

—আত্মবিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবে। ভাবালুতা আর সেবাশুশ্রূষা এক নয়।

—আমি যদি বলি যে, সব ভেবেই এ সংকল্প করছি।

—আরও গভীরে ডুব দিয়ে ছাখো। একদিনের চিন্তা দিয়ে নিজেকে ওলট পালট করা যায় না।

রমিতা এগিয়ে এসে পরমেশের একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে বলল—কেন! কেন এই অবিশ্বাস বলতে পারো! পরমেশ, তোমার সঙ্গে ত কোনো দিন ছলনা করি নি!

রমিতার চোখের কোলে শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ মেঘের প্রতিপাত হয়েছে যেন। রমিতা বলল—একদিনের জন্তও বলি নি ত, তোমায় আমি ভালোবাসি তবে কেন এত ঘা মারছ?

পরমেশ বললে—এতদিন ত সেই ভরসাতে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু সেদিন যখন ভয় দেখালে, বিয়ে করবে আমায়, সেই থেকেই কেমন যেন এলোমেলো ঠেকছে ছুনিয়ার চেহারাটা।

রমিতা যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়েই বললে—যদি বিয়ে করি তবে ক্ষতি কি! যদি এমন হয়, তুমি আর আমি ছু'জনেই ডাক্তার সরকারের হাসপাতালে থাকি।

—সে ত এমনিতেও থাকতে পারি! তার জন্তে বিয়েটা বাহুল্য!

—না, বাহুল্য নয়। তার পাশে পাশে চলতে পেলেই আমি খুশি, পায়ে পায়ে জড়িয়ে গিয়ে বাধা হতে চাই নে।

—বুঝেছি। কিন্তু এভাবে তুমি প্রত্যেককে ঠকাতে চাও কেন, লাভ কি?

—লাভ, সত্যকার কাজের লোকের পথে বাধা না হয়ে প্রেরণার উৎস হবার স্পর্ধা করা।

—অর্থাৎ অঙ্কের হিসেবের মত ছকে ফেলে জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া।

—সে তুমি যাই বলো না কেন আমার আপত্তি নেই—

—কিন্তু বিপত্তির পথ অঙ্ক কষে বন্ধ করা যায় না, সান্ত্বনা।

—তা ব'লে চেষ্টা করব না? আর, এখানে আমি ত দেখতে পাচ্ছি ওঁর মত মানুষের কাছে এসব পৌঁছায় না।

—তাই যদি বলো, তবে 'তুমি আছো—আমি আছি' যেমন, তেমনি থাকাই ভালো।

—কিন্তু আমাকে নিয়েই ত ভয়। যদি দুর্বল মুহূর্তে তাঁকে নামিয়ে আনি, এই আশঙ্কা!

—ওসব বাদ দাও। মানুষের মনটাই যদি বড় বলে স্বীকার করো তবে বাইরের বেড়া দিয়ে নিজেকে ঠকানোর অর্থ হয় না। তুমি এত বোকো আর, এটুকু কাটিয়ে উঠতে পারছ না? আমি বলি কি, যেমন আছো তেমনি থাকো।

রমিতা শূন্য দৃষ্টিতে পরমেশের মুখের পানে চেয়ে রইল। পরমেশ বলল —চলো অনেকদিন ঘরে আটকা পড়ে আছো—একটু বেড়িয়ে আসবে চলো।

সে কথারও কোনো উত্তর দিল না রমিতা।

ললিতা যে ওদের খুব কাছাকাছিই রয়েছে এটা কারুরই খেয়াল ছিল না। ওদের চুপ করতে দেখে ললিতা যখন ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল 'ক'টা বাজল' তখন ওরা উভয়েই যেন একটু অপ্রতিভ হ'ল। পরমেশ বলল—সাড়ে পাঁচটা।

রমিতা বলল—আজ ত শনিবার, নফরের এতক্ষণে আসার কথা।

ললিতা যেন এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিল। রমিতার মুখে কথাটা বলতে শুনে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রমিতার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—কি জানি হয়ত ওভারটাইম খাটতে হচ্ছে। ওর জন্যে ভেবো না। ছুটি পেলেই গুটিগুটি হাজির হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ললিতা কয়েকবারই নিজে থেকে রমিতাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—এক একদিন অমন রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত ওপরটাইম খাটতে হয়। প্রথম প্রথম আমারও ভাবনা হ'ত, কলকাতা শহরে কখন কি হয় কে বলতে পারে,—তারপর, বুঝলে দিদিমণি আস্তে আস্তে সয়ে গেল। আগে হ'লে এরমধ্যে তিনবার বড় রাস্তার মোড় অবধি দেখে আসা হয়ে যেত।

অবশেষে রমিতা বললে—অত উতলা হয়ো না ললিতা। আমার মনে হচ্ছে তোমার সেই অনিলাদির মায়ের অসুখ বেড়েছে, তাই নফর তাঁকে ফেলে আসতে পারছে না।

নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল ললিতা—হবেও বা!

প্রায় পৌনে ন'টার সময় নফর শুকনো মুখে এসে হাজির। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পেল যে, যেহেতু নফর অনিলার পাশের ঘরের ভাড়াটে সেহেতু তাকে বিপ্লবী সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাকে বিশেষ কোনো একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে নানাবিধ জেরায় যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন দেশের শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষকেরা দাবি করলেন—'অনিলা সেন সম্পর্কে যা যা জানো বলো—'সেক্ষেত্রেও নফর আশানুরূপ কিছু খবর দিতে পারল না। তখন কর্তারা বললেন—'একেবারে পাকা ঘুঁটি। সোজা পথে হবে না—র'স তোমার যাতে ভাত না জোটে এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিছু জানো না যদি, তবে ওই অনিলা সেনের মায়ের অসুখে তোমার অত মাথাব্যথা কেন?' নফর সরলভাবেই জবাব দিয়েছিল—'উনি না হয়ে যদি আপনি আমার পাশের ঘরে থাকতেন তাহলে আপনার বিপদেও দেখতে হ'ত বই কি!'

রমিতাকে দেখতে না পেয়ে সে রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ল।

ললিতা বলল—এতক্ষণ বসে থেকে থেকে উনি একটু বেরুলেন। ওনার আর কাজ থাকতে নেই! তোমার পরিবার আগলেই ত বসে রয়েছেন ক'দিন।

নফর বললে—তা ত জানি, তোমার সুভাগ্য বলতে হবে। মানুষ ত নন দেবী! আমার সাধ্যি ছিল না এমন করে চিকিচ্ছে করানো। তা তিনি কখন ফিরবেন জানো?

—বেশি দেরি করবেন না নিশ্চয়, তাঁর কর্তব্যের হুঁশ আছে।

নফরের আর বেশি কথা বলতে ভালো লাগছে না। না সে গলা খাটো করে বললে—একটা বিড়ি ধরাবো? বুড়ো কর্তা আবার এসে না পড়ে!

দ্বাদশীর দিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান করে এসে পূজার্চনার পর নাতিনাতনীদের হাতে প্রসাদ দিয়ে তারপর চমৎকারিণী জলগ্রহণ করেন। আজ দ্বাদশী। সকালে নীলাম্বর এবং শচীন মাষ্টার মশাই-এর কাছে পড়তে পড়তে ইতিমধ্যে দু'একবার দিদিভাই-এর ঠাকুর ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে খোঁজ খবর নিয়ে গেছে। লিলি তিনটি পুতুলের সংসার নিয়ে খুব ব্যস্ত—নিজের মনেই সে ছোট মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার জন্ম ন্যাকড়া পেতে বিছানা করে রেখেছে। এখন দুধ খাওয়াচ্ছে—দুধ না খাইয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো চলে না। লিলির কল্পিত মেয়ের দুষ্টুমীর আর অন্ত নেই। মাঝে মাঝে মেয়েকে খুব ভারিক্কি গলায় ধমক দিচ্ছে লিলি—'আ রে মেয়ে!' যেমন করে লিলির মা লিলিকে শাসন করে থাকে, কতকটা সেই ধরনের গলার আওয়াজ করছে লিলি। ওদিকে পার্বতী রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। পার্বতীর মন যেন অনেকটা সুস্থ রয়েছে। জয়ন্তকে বলে কয়ে পার্বতী কলকাতায় কিছুদিন থাকবার মেয়াদ আদায় করে নিয়েছে। দেশে ফিরে যাবার সময় জয়ন্ত শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলে গেছে—'যতদিন ইচ্ছে রাখুন না মা—আপনারই ত মেয়ে!'

চমৎকারিণী প্রায়ই বলেন—ভাগ্যিস তোরা আছিস পারু, নইলে একা এ বাড়িতে আমি দম ফেটে মরে যেতাম।

পারু গদগদ কণ্ঠে উত্তর দেয়—ওসব কথা বলো না মা! তোমার মেয়ে গরীব, কতটুকুই-বা করতে পারছি।

এমনি করে একটা নিবিড় শান্তির মধ্যে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। যদিও এর মধ্যে প্রভঞ্জনের অনুপস্থিতিটা কেউ ভুলতে পারে না—তবু এই অভাব বেদনা পরস্পরের মনে থাকার ফলে অন্তরঙ্গতা যেন নিকটতর হয়েছে!

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে চমৎকারিণী ডাকলেন—লিলি!

উত্তর এল—কি বলছ দিদিভাই—আমি কাজ করছি যে!

—এস আমাকে উদ্ধার ক'রে দিয়ে যাও দিদি! দাদাদের ডেকে আনো!

দুমিনিটের মধ্যে কোলাহল কলরবে নিশ্চুপ বাড়ীটা যেন জেগে উঠল।

সেদিন দুপুরে দু'খানি চিঠি এলো—একখানি পোস্টকার্ড জয়ন্তর, আর একখানি বিলেতের মেল প্রভঞ্জনের।

জয়ন্তর পোস্টকার্ডখানাই চমৎকারিণী আগে পড়লেন। জয়ন্ত খুব দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছে যে সে বেশ বুঝতে পারছে নীলাম্বর, শচীন এবং লিলিকে কাছে রাখতে না পেলে চমৎকারিণীর খুবই কষ্ট হবে, তবু নিরুপায় হয়েই সে তাদের পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছে। পার্বতী দীর্ঘদিন মায়াকোলে না থাকার ফলে সেখানকার সংসারের সব কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া এই অনিত্য সংসারে যখন কেউই চিরকাল বেঁচে থাকে না, তখন চমৎকারিণীই বা মেয়েকে নিজের কাছে আটকে রাখতে চেষ্টা করছেন কেন! অতএব এই পত্র টেলিগ্রাম মনে ক'রে চমৎকারিণী যেন নীলাম্বরদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। জয়ন্তর ছুটি নেই, কাজেই কম্পাউণ্ডার বাবুকে দিয়েই যেন নীলুদের পাঠান হয়।

প্রভঞ্জনের চিঠি খুব ছোট—কুশল সংবাদ ছাড়া বড় বেশি কিছু নেই। ডরোথীর কথা একটু আছে,—ডরোথীর হাসপাতালটি সুন্দর। চিকিৎসার ব্যবস্থাও চমৎকার। ডরোথী চমৎকারিণীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেছে। আর একটা কথা—ডরোথী নাকি প্রভঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—প্রভঞ্জনের বৌ নিশ্চয় দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। কটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাও জিজ্ঞাসা করতে ডরোথীর ভুল হয় নি!

চমৎকারিণী পার্বতীকে ডেকে বললেন—তা হলে গোছগাছ করে নাও!

পার্বতী বলল—কেন মা? এর মধ্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন! লিখেছে বলেই

সঙ্গে সঙ্গে 'হুজুর—হুজুর' করে দৌড়ে যেতে হবে? আগে দাদা আসুক!

—না মা, মিথ্যে অশান্তি করো না! সব জেনেশুনেই সে পাঠানোর কথা লিখেছে।

—হুঁ, একবার সে গোয়ালে ঢুকলে—ত' চার বছরের মধ্যে বেরুনো যাবে না মা! তার চেয়ে তুমি লিখে দাও, তোমার শরীর খারাপ। আর এই সেদিন ছেলেদের জন্যে মাষ্টার রাখা হ'ল, এখানে থাকার মত সব উজ্জুগ আয়োজন হ'ল—এরই মধ্যে যাওয়া হবে কি করে।

চমৎকারিণী একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—না, তোকে আর ফাঁপরে ফেলব না মা! আমার জন্যে ললিতার মা আছে, নিধু আছে। সত্যিই ত শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়ে দিয়ে চিরকাল মায়ের পায়ে তেলমালিশ করলে ত তোমার চলবে না মা!

পার্বতী মায়ের সংকল্প টলাতে পারল না। তিনি পঞ্জিকা দেখে দিন স্থির করে পার্বতীকে বললেন—আমার জবানী দিয়ে লিখে দাও জয়ন্তকে, সে যেন দুর্ভাবনা না করে। লেখো, আমরা সবাই ভালো আছি। আজ দিকশূল, কাল মঘা—কাজেই পরশুর আগে পাঠানো যাচ্ছে না। আশীর্বাদ দিও!··· আর দেখ, আজ রাত্রে প্রভুকে চিঠি লিখতে হবে, একটু সকাল সকাল হেঁসেলপাট চুকিয়ে রেখ!

পার্বতী বলল—তাহ'লে দুখানা চিঠিই রাতে লিখব মা!

—বাঃ তা কি হয়! জয়ন্তর চিঠি আজকের ডাকেই যাবে যে।

রাত্রে যখন পার্বতী মায়ের কাছে এসে বসল তখন চমৎকারিণী বললেন—আজ যেন শরীরটা তেমন জুৎ নেই পারু!

পার্বতী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল—কি হ'ল মা! শরীর আনচান করছে? মাথা ধরেছে?

—না রে, তেমন কিছু নয়। উপোস লেগেছে—তাই বলছিলাম আজ আর প্রভুর চিঠি লিখে কাজ নেই। তুই ত ওর চিঠি পড়িস নি, না!

—বাঃ, তোমার সামনেই ত পড়লাম।

—ও তা'ই নাকি! কি লিখেছে একবার শোনা ত!

পার্বতীর চিঠি পড়া শেষ হ'লে চমৎকারিণী বললেন—খাঁটি সোনা, ডরোথী হচ্ছে খাঁটি সোনা! একটা কথা ভাবছিলাম, বুঝলি পারু!

পার্বতী উৎসুকভাবে মায়ের মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল।

চোখ বুজে কথা বলছেন চমৎকারিণী—ভাবছি ক'দিনই বা বাঁচব আর। মিথ্যে ওদের কষ্ট দিয়ে গেলাম সারাটা জীবন। ডরোথী আর প্রভঞ্জনের বিয়েতে মত দিলেই হ'ত। আচ্ছা, এখন যদি লিখে দিই যে, তোমাদের দু'জনকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে তোমাদের বিয়েতে অনুমতি জানাচ্ছি—তাহলে কেমন হয় বল ত?

পার্বতী বুঝতে পারে যে, তার মা নিজের মনের সঙ্গে কথা কইছেন। অতএব পার্বতীর মতামত দেওয়ার দরকার নেই। চুপ ক'রে রইল পার্বতী।

চমৎকারিণী বললেন—আচ্ছা সেসব কাল ভেবে দেখা যাবে।

পরদিন প্রভঞ্জনকে যে চিঠি দেওয়া হ'ল তাতে পার্বতীর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার খবরটা উল্লেখ করা হ'ল না, পাছে বিদেশে বসে প্রভঞ্জন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। আর বিশেষ ক'রে ডরোথীর কথায় লেখা হ'ল—ডরোথী যে চমৎকারিণীর কুশল জিজ্ঞাসা করেছে এতে চমৎকারিণী বিস্মিত হন নি, কারণ তিনি জানেন ডরোথী তাঁর কত আপন। তিনি ডরোথীকে দেখতে পেলে খুবই খুশি হবেন—কিন্তু তেমন সৌভাগ্য কি আর হবে?

প্রসঙ্গতঃ পার্বতীকে বললেন—আমি জানি যে প্রভঞ্জন আমার মত পেলেও ডরোথীকে বিয়ে করবে না, মনে করবে যে, এটা মায়ের মনের কথা নয়, মন-রাখা কথা, তাই ওসব লিখলাম না।

বিকেলের দিকে ললিতার মা নিজের বিছানাপত্র নিয়ে এসে হাজির হ'ল। আজ থেকেই রাত্রে ললিতার মা এখানে থাকবে—শ্রীপতি অবশ্য এখানেই খাওয়াদাওয়া করবে।

অনেক ভেবেচিন্তে রমিতা নূতন দু'খানি ছবির চুক্তিপত্রে সম্মতি দিল।

ই দু'টি ছবিই সিনেমার পর্দায় শেষ ছবি হবে ওর। এরপর আর নয়। খন ওর মনে সবচেয়ে দুশ্চিন্তা—হাসপাতালের জন্য প্রচুর টাকার দরকার, সে াকা কি ক'রে সংগ্রহ করা যায়! ও মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছে—অন্ততঃ াঁচ লক্ষ টাকা নিজে সংগ্রহ ক'রে দেবে। পারলে আরও বেশি দেবে রমিতা। াই, নূতন ছবির কনট্রাক্ট নিল—এদিকে নার্সিং সম্বন্ধে বাড়িতে ব'সে পড়াশুনাও শুরু করল। পরমেশ ভরসা দিয়েছে, ওর পরীক্ষাটা শেষ হ'লেই াসপাতালে রমিতাকে একটা চাকরী জুটিয়ে দেবে। আপাততঃ সেও পড়াশুনা নিয়ে মহাব্যস্ত। প্রভঞ্জনের চিঠি আসার পর থেকে পরমেশ সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করছে। ললিতাকে সে আর দেখতে আসে না, অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পরমেশ বলেছে—'এবার আমাকে পাশ করতেই হবে।'

—দেখতে দেখতে ললিতার এবাড়িতে থাকা প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল। ও এখন এ সংসারের অনেক কাজ দেখাশুনা করে, পরিবর্তনকে সেবাযত্নে মুগ্ধ করেছে। বুড়ো বয়সে এই অযাচিত স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেয়ে পরিবর্তন ললিতাকে আর কাছ ছাড়া করতে চান না।

সেদিন নফর আসতেই রমিতা বলল—তোমার বৌকে এবার নিয়ে যেতে পারো।

নফর একটু মাথা চুলকে বললে—এই ত দেখুন না, নিয়ে যাই-যাই ক'রে অনেক দেরি হ'য়ে গেল। পাড়াতে ভারী গোলমাল, ধরপাকড়-খানাতল্লাসী আর শেষ হচ্ছে না। অনিলাদির মাকে নজরবন্দী করেছে।

পরিবর্তন বারান্দায় বসে বোধহয় সব কথাই শুনেছিলেন, নইলে হঠাৎ বলবেন কেন—তাহলে এত ব্যস্তই বা হচ্ছ কেন—এখানে ত ভালোই আছে ললিতা।

—আজ্ঞে সে আর বলতে? বলতে লজ্জা হচ্ছে কিন্তু ওর চেহারাটা ফিরে গিয়েছে, সোন্দর লাগছে দেখতে ওকে।

রমিতা বলল—আমার মনে হয় এখানে এভাবে বসে না থেকে ও আমার কাছে নার্সিং শিখুক।

পরিবর্তন ঘুরে উঠে এল—তা নার্সিং শেখাটা খুব ভালো কাজ সন্দেহ নেই। তবে তুইই বা নার্সিং-এর কি জানিস ?

—জানি না, কিন্তু শিখতে ত পারি। এইটুকু মেয়ে, ওর যখন মাথার ওপর বোঝা চাপানো নেই তখন এসব শিখতে আপত্তি কি ?

কতকটা অসহায়ভাবেই নফর বললে—তা বেশ ত !

পরিবর্তন বুঝে উঠতে পারলেন না মেয়ের হঠাৎ এই সেবাবিদ্যার উপর এত ঝোঁক পড়ল কেন। কিন্তু অহেতুক কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ তাই কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। শুধু বললেন—দেখিস মা, ও মেয়েটাকে ঘর গেরস্থালী থেকে একেবারে টেনে নিস নে। ও বড় ঠাণ্ডা মেয়ে।

রমিতা শান্তকণ্ঠে জবাব দিল—শান্ত মেয়ে ব'লেই কি তার ওপর যা নয় তাই অত্যাচার করতে হবে ? তুমি সংসারের কোনো খবরই রাখো না, অথচ মাঝে পড়ে কথা বলতে যাও কেন বাবা! জানো, ললিতার এই বয়েসের মধ্যে ত্ব'বার সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে! তুমি কি জানো যে, নফরের মত ছাপোষা লোকের ওই সামান্য আয়ে ছেলেপুলে মানুষ করা সম্ভব নয়। ঘর গেরস্থালি কথাটা শুনতে ত খুব মিষ্টি। যে দিনকাল এসেছে এখন প্রত্যেকেরই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করা ভালো।

পরিবর্তন বলল—হ্যাঁ তা ত বটেই। ওরা ত লেখাপড়া শেখে নি! ওদের কাছেও সে প্রয়োজনটা ধরা পড়েছে—তবে কি জানিস, ওরা ঠিক পথটি এখনও দেখতে পায় নি।

—না বাবা, পথ আমরা সবাই সমান দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সময় লাগবে একটু। যে পথটা এতদিন চলে চলে মুখস্থ হয়ে গেছে, সেটা ভুলতে ভুলতেও কিছুদিন কেটে যাবে।

নফর যে কখন পিতা কন্যাকে তর্ক-বিতর্কের সুযোগ দিয়ে ললিতার খোঁজে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল তা কেউই লক্ষ্য করে নি।

ললিতাকে নার্সিং শেখাবার কথাটা আগে কখনও মনে হয় নি রমিতার—হঠাৎ কথাটা মাথায় যেমন এসে গেল তেমনি সেটা বেশ শক্ত ক'রে ধরে রাখল

রমিতা। সেদিন রাত্রে শোবার আগে রমিতা ললিতাকে নিজের ঘরে ডাকল
—তোমার এতে মত আছে ত?

—আমার মতামতের কি দরকার দিদিমণি, আপনি যা করবেন আমার তাতে.ভালোই হবে।

—না, না, তাই বা হতে যাবে কেন? তোমার নিজের মনের সাধ-ইচ্ছে ব'লে একটা কথা থাকতে পারে ত!

ললিতা চুপ করে রইল।

রমিতা বলল—দ্যাখো ললিতা, সংসারের সুখ সকলেই চায়। সুখ না পেলে ভাগ্যের দোষ দিয়ে হা-হুতাশ করা সোজা কিন্তু সব সময় ভাগ্যকে দায়ী করাটা ভুল। একটু হিসেব করে পা ফেললে অনেক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে বাঁচা যায়।

কেমন করে?

—সেটাই ত শিখতে হবে।

—আমি যে একেবারে লেখাপড়া জানি না দিদিমণি, শিখব কি ক'রে?

—লেখাপড়া না জানলেও শেখা যায়।

—কই অনিলাদি ত সেকথা বলেন নি। আমায় বলেছিলেন, ম্যাট্রিক পাশ না করলে নার্স হওয়া যায় না।

—সে কথা ঠিক নয়। আমি তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো।

—আপনি কখন কি করবেন? নতুন ছবিতে নামবেন, নিজে শিখবেন, আবার আমাকে শেখাবেন!

বিস্ময়ে ললিতার সরল চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল।

রমিতা বলল—প্রথম প্রথম একটু বেশি খাটতে হবে। তারপর সব অভ্যেস হয়ে যাবে ভাই। তোমরা শুধু পাশে থেকো।

—কী যে বলেন দিদিমণি!

—আচ্ছা, নফর তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছে ত!

—ইস্, তা কেন হবে? তবে—

ব'লে ললিতা অদ্ভুত মমতামাখা দৃষ্টিতে রমিতার মুখের পানে চাইল।

রমিতা বলল—জানো ললিতা, আজ থেকে দশ বছর পরে তুমি একজন নামকরা মেট্রন হবে।

—সে আবার কী!

—মেট্রন হচ্ছে নার্সদের ওপরওয়ালা। আমাদের একটা মস্ত বড় হাসপাতাল হবে যে! সেই হাসপাতালের জন্যেই ত আমাদের তৈরী হ'তে হ'চ্ছে। বিলেত থেকে ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকার ফিরে এলেই আমরা হাসপাতালের কাজে লাগতে পারব!

প্রভঞ্জনের নাম শুনে ললিতা অবাক হয়ে রমিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—তিনি খুব বড় ডাক্তার, না দিদিমণি?

—নিশ্চয়। এমন একদিন আসছে যখন তাঁকে ভারতবর্ষের সবাই এক ডাকে চিনবে।

ললিতা আবেগরুদ্ধ স্বরে বললে—আমাদের মামাবাবু এতবড় ডাক্তার!

বিস্মিত হয়ে রমিতা প্রশ্ন করল—মামাবাবু মানে?

—হ্যাঁ, আমার মা যে তাঁদের বাড়ি কাজ করে! আমাদের মামাবাবুই উনি!

—ও, তাই নাকি? এত দিন ত সেকথা বলো নি কিছু!

—আপনি তাঁকে চেনেন তা কি ক'রে জানব বলুন! মামাবাবুর নিজের হাসপাতাল হবে?

—হাঁ! তিনি বিলেত থেকে চিঠি লিখেছেন যে, ওখানকার মত একটা আদর্শ হাসপাতাল নিজে হাতে গড়ে তুলবেন দেশে ফিরে।

—আর আমরা সেই হাসপাতালে কাজ করব? তা খুব রাজি আছি। তবে নার্সিং শেখা আমার কম্ম নয়, মামাবাবুর হাসপাতালে ঝি-মেথরাণীর কাজই আমাকে দেবেন।

—ঝি-মেথরাণীর কাজ ব'লে ত আলাদা কিছু থাকবে না ভাই! দরকার হ'লে সবাই সব কাজ করবে। তোমায় কাজের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে একথা সব সময় মনে রাখলে দেখবে আর কোন হাঙ্গামাই থাকবে না।

তারপর কখন কিভাবে যে হাসপাতালের প্রসঙ্গ পার হয়ে তারা

প্রভঞ্জনের মহিমাকীর্তন শুরু করে[illegible]তা রমিতা বা ললিতা কেউই টের পায় নি।

পরিবর্তন এসে ললিতাকে ডাকলেন—মা ললিতা, তোমার শরীর ত খুব সুস্থ নয়,—যাও শুয়ে পড়ো গিয়ে।

—ক'টা বেজেছে বাবা!

রমিতা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল। হঠাৎ যেন এভাবে নিজের পরিচয়টা ললিতার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়াতে রমিতার কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। এতক্ষণ যেন ললিতাকে জোর ক'রেই ধরে রেখেছিল। ললিতা চলে গেল।

একা ঘরে শুয়ে শুয়ে রমিতার মনে ললিতার প্রতিটি বাক্য জীবন্ত হয়ে ছবির মত চলাফেরা শুরু করেছে। ললিতাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রভঞ্জনের পারিবারিক অনেক কথাই রমিতা জানতে পেরেছে আজ। এতদিন পরে যেন প্রভঞ্জনের সত্যকার পরিচয় পেল রমিতা। রমিতা জানত যে ডরোথিকে প্রভঞ্জন গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে নি, কারণ পুরুষ মানুষের মনে সত্যকার প্রেম বলে কিছু বস্তু নেই—মেয়েদের ভালোবাসার প্রভাব কিছুকাল পুরুষের অস্থির মনকে সম্মোহিত করে, তখনই পুরুষ বলে—'আমি তোমায় ভালোবাসি।' রমিতার বিশ্বাস ছিল পুরুষের প্রেম বস্তুতঃ রমণীর প্রেমের প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু আজ ললিতার নানা কথার মধ্যে থেকে বুঝল যে, প্রভঞ্জনের মন ডরোথিকে গ্রহণ করবার জন্য আকুলিবিকুলি করেছে। প্রভঞ্জন যে শুধুই কাজের মানুষ নয়, তার মনটা কেবল কষ্টিপাথরই নয় এ খবরটা অর্ধ পরিচিতা অশিক্ষিতা একটি মেয়ের মুখ থেকে শুনে রমিতা মনে মনে স্বস্তি অনুভব করল। কিন্তু কেবলই স্বস্তি অনুভব করে ক্ষান্ত হওয়া রমিতার পক্ষে সম্ভব নয়। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই পরমেশকে ডেকে একটা পরামর্শ করে প্রভঞ্জনকে 'কেব্‌ল্' করে দেয়। প্রভঞ্জন যেন ডরোথিকে সঙ্গে নিয়েই দেশে ফেরে—ডরোথি এলে এখানকার হাসপাতালে কাজের পক্ষে মস্ত বড় সুবিধা হবে। ডরোথী নিশ্চয় আসতে রাজী আছে—প্রভঞ্জনের তরফ থেকে এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। রমিতার মানসনেত্রে ভেসে উঠল, কলকাতার উপকণ্ঠের একটি

হাসপাতালের ছবি—তার সঙ্গে [illegible] হাসপাতালের বিরাট পরিধির অনেকক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। ভাবা[illegible]তে কিছুক্ষণ পরে রমিতা সোজা হয়ে উঠে বসল, বসে বসে দেখতে দে[illegible] সারি সারি বাড়ি, অনেক লোকজন, অথচ একটা শান্ত পরিবেশ ঘিরে [illegible]বে, বাগান সাজানো পুকুর বাঁধানো কিছুরই অভাব থাকবে না! প্রভঞ্জন, ডরোথি, রমিতা, পরমেশ, ললিতা আরও অগণিত কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে এই স্বপ্ন যে বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করিবে এতে কোনো সংশয় থাকে না রমিতার।

আপন মনে রমিতা অন্ধকার ঘরে বসে বসে কত বার বলল—হ্যাঁ, হবে! নিশ্চয়ই হবে বই কি। এ হ'তেই হবে।

এতদিনের পিছনে ফেলে আসা অজস্র ঘটনাপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে রমিতা দেখল ঝাপসা ছায়ার পিছনে মিছিল ছাড়া আর কিছু নেই। শুধুই কালো—ইসারায় যত ছায়ার ভিড়।

মানুষের স্বপ্ন দেখাকে যারা হাজার রকমের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল বলে ছাপ দিয়ে দেয় তারাও জানে যে এই স্বপ্নদর্শী মনই মানুষের বাঁচার মূলে অনেকখানি সহায়তা করে। রমিতা যে ঘাত-প্রতিঘাতের পথ দিয়ে এসেছে সে পথে স্বপ্ন যে কোথায় আত্মগোপন করে ছিল সে খবর কারও গোচর ছিল না। যে মন একদিন সমাজকে পঙ্গু করে দেবার জন্য নিজের সমগ্র শক্তিকে সংহত করে অশনিসংকেত করেছিল সেই মন কোন যাদুস্পর্শে বীণাঝঙ্কার হয়ে উঠল!

একে একে রাত্রির প্রত্যেকটি প্রহর অবসিত হল। যুগ-যুগান্তর কালের অজস্র ছবি রমিতার চোখের সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে উড়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা বিরাট পাহাড়ের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ক্রমশ: রমিতার দৃষ্টিশক্তি স্বচ্ছ হয়ে এল—ও দেখল, পাহাড় নয়, মানুষ।—প্রভঞ্জন।

অনিদ্রার কোন গ্লানি, ক্লান্তির কোনো জড়িমা যেন রমিতাকে স্পর্শ করে নি—রমিতা আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেল। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া লেগে ওর বিস্রস্ত কুন্তলভারে একটা মধুর আমেজ লাগল।

রমিতা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে দূরের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি যেন নদী-সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করে অপরিচিত রাজ্যের দিকে চলমান। ওর কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পরিবর্তনের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠের স্তোত্র পাঠের স্পষ্ট উচ্চারণ।

ও যেন একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা দেখতে পেল নিজের সামনে। সেই আলোকপথে অনাগত কালের আশা এগিয়ে আসছে যেন।

অরুণোদয়ের ওপার থেকে কারা যেন হাতছানি দিচ্ছে—ওরাই ত আগামী-কালের সম্ভাবনার দল। রমিতা চিনতে পেরেছে—ওই ওরা সাড়া দিয়েছে প্রভঞ্জনের কর্মপথের আহ্বানে। সামনের অশথ গাছে কচি পাতাগুলো আন্দোলিত হয়ে অস্পষ্ট ঝির-ঝির ধ্বনি জাগাচ্ছে। বনস্পতির শাখায় শাখায় যে নূতন পত্রালিকার জন্ম হয়েছে তারা সম্ভাবনার বার্তা বহন করে এনেছে।

দ্রুতপদে রমিতা নীচে নেমে এসে টেবললাম্পটা জালিয়ে চিঠি লিখতে বসল প্রভঞ্জনকে। কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে রমিতার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল—ওর মনে ত কোনো দুঃখবোধ নেই, তবু যে এত অশ্রু কেন ঝরছে রমিতা বুঝতে পারল না।

সমাপ্ত